স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে

স্বামী বিবেকানন্দ

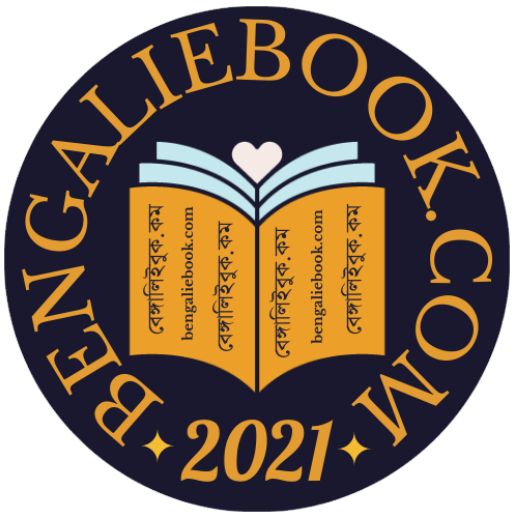

সূচিপত্র

১. আত্মা 2
২. আত্মা : তাহার বন্ধন ও মুক্তি 19
৩. পুনর্জন্ম 28
৪. আত্মা কি অমর ? 48
৫. আত্মা, প্রকৃতি ও ঈশ্বর 53
৬. প্রকৃতি ও মানুষ 62
৭. আত্মা-ইহার স্বরুপ ও লক্ষ্য 66
৮. পরম লক্ষ্য 76
৯. সুবিদিত রহস্য 90
১০. জ্ঞানলাভের সোপানশ্রেণী 100
১১. জ্ঞানযোগ-প্রবেশিকা 114
১২. জ্ঞানযোগ-কথা(১-৯) 120

১. আত্মা

[আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতা]

আপনারা অনেকেই ম্যাক্স মূলারের সুবিখ্যাত পুস্তক 'Three Lectures on the Vedanta Philosophy' (বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা) পাঠ করিয়াছেন; এবং সম্ভবতঃ আপনারা কেহ কেহ অধ্যাপক ডয়সনের জার্মান ভাষায় লিখিত এই একই দার্শনিক মতবাদ-বিষয়ক গ্রন্থটিও পাঠ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা সম্বন্ধে প্রতীচ্যে বর্তমানে যাহা লিখিত হয়, অথবা শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা প্রধানতঃ একটি মাত্র মতবাদ—অদ্বৈতবাদ, অথবা ভারতীয় ধর্মের 'এক-তত্ত্ব'বাদ সম্বন্ধেই এবং কেহ কেহ মনে করেন, বেদের সমগ্র তত্ত্ব এই একটি দার্শনিক মতবাদের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় চিন্তাধারার বিভিন্ন দিক আছে; এবং সম্ভবত অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় অদ্বৈত-মতাবলম্বীরাই সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা কম। প্রাচীনতম যুগ হইতেই ভারতবর্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়; এবং সুস্পষ্টভাবে বিধিবদ্ধ অথবা সর্বজনসম্মত কোন ধর্মকেন্দ্র অথবা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের গ্রহণীয় তত্ত্ব-নির্দেশকারী কোন মণ্ডলী এই দেশে কোনদিনও না থাকায় জনসাধারণ নিজ নিজ পন্থাবলম্বন, নিজ নিজ দর্শন-বিস্তার, এবং নিজ নিজ সম্প্রদায়-স্থাপনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। এই কারণে আমরা দেখি, প্রাচীনতম যুগ হইতেই ভারতবর্ষ বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ে পরিপূর্ণ। আমি জানি না, বর্তমানে ভারতবর্ষে কত শত সম্প্রদায় আছে; প্রত্যেক বৎসরই কয়েকটি নূতন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইতেছে। মনে হয় যেন, এই জাতির আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা সত্যই অফুরন্ত।

এই-সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়কে প্রথমতঃ দুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়; একটি আস্তিক বা বৈদিক, অপরটি নাস্তিক বা অবৈদিক। যাঁহারা হিন্দু-শাস্ত্র বেদকে নিত্য-তত্ত্ব-প্রকাশকরূপে প্রামাণ্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের বলা হয় 'আস্তিক' এবং যাঁহারা বেদ বর্জন করিয়া অন্যান্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখেন, তাঁহারাই হইলেন ভারতীয় 'নাস্তিক'। ভারতের দুইটি প্রধান আধুনিক 'নাস্তিক' সম্প্রদায় হইল জৈন এবং বৌদ্ধ। আস্তিকগণের

মধ্যে কেহ কেহ বলেন, যুক্তি অপেক্ষা শ্রুতি অধিকতর প্রামাণ্য; আবার কেহ কেহ বলেন, শ্রুতির যুক্তিসম্মত অংশই কেবল গ্রহনীয়, অবশিষ্ট অংশ বর্জনীয়।

সাংখ্য, ন্যায় এবং মীমাংসা—এই তিনটি আস্তিক মতবাদের মধ্যে প্রথম দুইটি দার্শনিক মতবাদরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও সম্প্রদায়-গঠনে সমর্থ হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে ভারতবর্ষে যে একটি মাত্র সম্প্রদায় আছে, তাহা হইল উত্তর-মীমাংসার উপর প্রতিষ্ঠিত বৈদান্তিক সম্প্রদায়। তাঁহাদের দার্শনিক মতবাদের নামই 'বেদান্ত' ।

হিন্দু দর্শনের সকল মতবাদেরই উদ্ভব হইল বেদান্ত অথবা উপনিষদ্ হইতে; কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণ বিশেষভাবে এই নামটি নিজেরা গ্রহণ করিয়াছেন, যেহেতু তাঁহারা তাঁহাদের সমগ্র ধর্ম ও দর্শনকে কেবলমাত্র বেদান্তের ভিত্তিতেই স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন। কালক্রমে কেবল বেদান্তই স্থায়ী হয়, এবং ভারতবর্ষের বর্তমান বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলি এই বেদান্তেরই কোন না কোন শাখার অন্তর্গত। তথাপি এই-সকল সম্প্রদায় একমতালম্বী নহে।

আমরা দেখিতে পাই যে, বৈদান্তিকগণের মধ্যে তিনটি প্রধান শ্রেণী-বিভাগ আছে। অবশ্য একটি বিষয়ে তাঁহারা সকলেই একমত, অর্থাৎ তাঁহারা সকলেই ঈশ্বরে বিশ্বাসী। এই-সকল বৈদান্তিক ইহাও বিশ্বাস করেন যে, বেদ অতিপ্রাকৃত উপায়ে ব্যক্তি ঈশ্বরের বাণী। তাঁহাদের এই বিশ্বাস ঠিক ইসলাম ও খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বিগণের বিশ্বাসের মতো নহে—ইহা একটি বিশেষ ধরনের বিশ্বাস। তাঁহাদের ধারণা এই : বেদসমূহ ঈশ্বরের জ্ঞানের প্রকাশ; ঈশ্বর নিত্য বলিয়া তাঁহার জ্ঞানও তাঁহার মধ্যে নিত্য বিরাজমান এবং সেইজন্য বেদও নিত্য। অপর একটি সাধারণ বিশ্বাসও তাঁহাদের আছে—সৃষ্টি-প্রবাহে বিশ্বাস। অর্থাৎ তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, সমুদয় সৃষ্টি ক্রমান্বয়ে আবির্ভূত ও তিরোহিত হইতেছে, জগৎ আবির্ভূত হইয়া ক্রমশঃ স্থূলতর হয়, এবং কল্পকালের শেষে ক্রমাগত সূক্ষ্মতর হইয়া লয়প্রাপ্ত হয়; ইহার পরে আসে বিশ্রামের সময়। তাহার পর পুনরায় জগতের সৃষ্টি বা আবির্ভাব হয়, এবং সেই একই প্রক্রিয়ার পুনরাবর্তন ঘটে। তাঁহারা 'আকাশ' নামক একটি বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন, ইহা বৈজ্ঞানিকগণের 'ইথারের' মতো। অপর একটি শক্তির

অস্তিত্বও তাঁহারা স্বীকার করেন—যাহাকে তাঁহারা বলেন 'প্রাণ'। তাঁহারা বলেন, এই বিশ্বজগৎ প্রাণের স্পন্দন হইতেই উদ্ভূত। একটি কল্পের শেষ হইলে প্রকৃতির সকল প্রকাশই ক্রমান্বয়ে সূক্ষ্মতর হইয়া আকাশে বিলীন হইয়া যায়। এই আকাশকে প্রত্যক্ষ অথবা স্পর্শ করা যয় না, কিন্তু আকাশ হইতেই প্রত্যেক বস্তু সৃষ্ট হয়। প্রকৃতিতে যত কিছু শক্তি দেখি—মাধ্যাকর্ষণ, আকর্ষণ-বিকর্ষণ এবং চিন্তা, অনুভব ও স্নায়বিক ক্রিয়া-গতি—এ-সকল বিভিন্ন প্রকারের শক্তিই এই প্রাণে বিলীন হইয়া যায়, এবং প্রাণের স্পন্দন স্তব্ধ হয়। জগৎ এই অবস্থাতেই বিরাজ করে, যতদিন পর্যন্ত না নূতন কল্পের আরম্ভ হয়। সেই সময়ে পুনরায় প্রাণের স্পন্দন আরম্ভ হয়, এবং এই স্পন্দন আকাশে সঞ্চারিত হয়, যাহার ফলে এই-সকল বস্তু ক্রমান্বয়ে আবির্ভূত হয়।

যে-সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমি আপনাদের প্রথম বলিব, তাহার নাম 'দ্বৈত-সম্প্রদায়'। দ্বৈতবাদিগণের মতে—জগতের স্রষ্টা ও শাসক ঈশ্বর সর্বদাই জীব- জগৎ হইতে স্বতন্ত্র। ঈশ্বর নিত্য, জগৎ নিত্য, জীবগণও নিত্য। জীব-জগৎ কখনও বিকশিত এবং পরিবর্তিত হইতেছে, কিন্তু ঈশ্বর সর্বদাই সেই একই রহিয়াছেন। পুনরায় দ্বৈতবাদিগণের মতে—গুণের জন্যই ঈশ্বর ব্যক্তি-ভাবাপন্ন, দেহের জন্য নয়। তাঁহার মানবীয় গুণ আছে। তিনি করুণাময়, ন্যায়বান্ শক্তিমান্। তিনি সর্বশক্তিমান্, তাঁহার নিকটে যাওয়া যায়, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা যায়, তাঁহাকে ভালবাসা যায়। তিনিও প্রতিদানে ভালোবাসেন, ইত্যাদি। এক কথায় তিনি মানবীয়গুণসম্পন্ন দেবতা, যদিও মানব অপেক্ষা অনন্তগুণ মহৎ। মানবের দোষগুলির কিছুই তাঁহার মধ্যে নাই। 'তিনি অনন্তকল্যাণ-গুণাধার'—ইহাই হইল দ্বৈতবাদীদের মতে ঈশ্বরের সংজ্ঞা। কিন্তু তিনি তো উপাদান ব্যতীত সৃষ্টি করিতে পারেন না, এবং প্রকৃতিই তাঁহার উপাদান—যাহা হইতে তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন।

এরূপ কয়েকজন দ্বৈতবাদীও আছেন যাঁহারা বেদান্ত-সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন। তাঁহাদের বলা হয় 'পরমাণুকারণবাদী'। তাঁহাদের মতে জগৎ অসংখ্য পরমাণুর সমাহার মাত্র, এবং ঈশ্বরেচ্ছায় এই-সকল পরমাণু হইতে সৃষ্টি হয়। বৈদান্তিকগণ এই মাতরবাদ স্বীকার করেন না; তাঁহাদের মতে এই মতবাদ সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক। জ্যামিতিক বিন্দুর ন্যায়,

পরমাণুরও অংশ অথবা আয়তন নাই; কিন্তু যাহার অংশ অথবা আয়তন নাই, তাহাকে অনন্তবার গুণ করিলেও তাহা পূর্ববৎই থাকিয়া যায়। যাহার অংশ নাই, তাহা কোনদিন অংশযুক্ত কোন বস্তু সৃষ্টি করিতে পারে না; এবং বহুসংখ্যক শূন্যকে যোগ দিলে একটি পূর্ণ সংখ্যা হয় না। সেজন্য পরমাণুসমূহের যদি অংশ অথবা আয়তন না থাকে, তাহা হইলে এরূপ পরমাণু হইতে জগতের সৃষ্টি সম্পূর্ণ অসম্ভব।

সেইজন্য বৈদান্তিক দ্বৈতবাদিগণের মতে—অব্যক্ত প্রকৃতি হইতেই ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন। ভারতীয় জনসাধারণ অধিকাংশই দ্বৈতবাদী। সাধারণতঃ মানুষের পক্ষে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর কিছু ধারণা করা সম্ভব নয়। আমরা দেখি, পৃথিবীর ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তিগণের মধ্যে শতকরা নব্বই জনই দ্বৈতবাদী। ইওরোপ এবং পশ্চিম এশিয়ার সকল ধর্মই দ্বৈতমূলক—ইহা ব্যতীত তাহাদের অপর কোন উপায়ই নাই। সাধারণ মানুষের পক্ষে নামরূপ-বিহীন কোন কিছুর ধারণা করাই অসম্ভব। যাহা তাহার বুদ্ধিগম্য, তাহাই সে আঁকড়াইয়া থাকিতে ভালবাসে। অর্থাৎ উচ্চতর আধ্যাত্মিক বিষয়কে সে নিজের স্তরে নামাইয়া আনিয়া সেই ভাবেই কেবল ধারণা করিতে পারে। নামরূপ-বিহীনকে কেবল নামরূপ-বিমণ্ডিতরূপেই সে চিন্তা করিতে পারে। পৃথিবীর সর্বত্র ইহাই হইল জনসাধারণের ধর্ম। দ্বৈতবাদীরা এরূপ একজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, যিনি মানুষ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন; তিনি যেন একজন মহান্ সম্রাট, একজন সর্বশক্তিমান্ রাজা। কিন্তু দ্বৈতবাদীদের মতে—তিনি পার্থিব সম্রাট অপেক্ষা পবিত্রতর; তাঁহারা তাঁহাকে নিখিল-কল্যাণ-গুনবিমণ্ডিত এবং অখিল-দোষ-বিবর্জিতরূপে দর্শন করিতে চান। কিন্তু মন্দ ব্যতীত ভালোর অস্তিত্ব, অন্ধকারের ধারণা ব্যতীত আলোর ধারণা কি কোনদিন সম্ভব?

অনন্ত-কল্যাণ-গুণাধার, ন্যায়বান্ করুণাময় পরমেশ্বরের শাসনাধীন এই জগতে কিরূপে এরূপ অসংখ্য পাপের উদ্ভব হইতে পারে—ইহাই হইল সকল দ্বৈতবাদীর প্রথম সমস্যা। সকল দ্বৈতবাদী ধর্মেই এই প্রশ্নের উদয় হয়; কিন্তু ইহার উত্তরে হিন্দুগণ কোনদিনই একজন ‘শয়তান’ সৃষ্টি করেন নাই। তাঁহারা সমস্বরে মানুষকেই ইহার জন্য দায়ী করেন এবং তাঁহাদের পক্ষে ইহা করাও সহজ। কারণ আমি আপনাদের এইমাত্র বলিয়াছি, ‘শূন্য

হইতে জীবের সৃষ্টি হইতে পারে'—একথা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। এই জীবনে দেখিতেছি, আমরা সর্বদাই আমাদের ভবিষ্যৎ গঠন করিতে পারি; আমাদের প্রত্যেকেই প্রত্যহ আগামী কল্যকে গড়িতে চেষ্টা করি। অদ্য আমরা আগামীকল্যের ভাগ্য নির্ধারণ করি; কল্য আমরা তাহার পরের দিনের ভাগ্য স্থির করি—এইভাবেই আমাদের জীবন চলে। এই যুক্তি-প্রণালী আরও অতীতে প্রয়োগ করা খুবই যুক্তিসঙ্গত। যদি আমাদের নিজেদের কর্মের দ্বারা আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ ভাগ্যকে গঠিত করিতে পারি, তাহা হইলে সেই একই নিয়ম কেন অতীতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে না? যদি একটি অনন্ত শৃঙ্খলের কয়েকটি অংশ কিছু পরে পরে আবর্তিত হইতে থাকে এবং উহার একটি অংশকে আমরা ব্যাখ্যা করিতে পারি, তাহা হইলে সমগ্র পর্যায়টিরও ব্যাখ্যা করা আমাদর পক্ষে সম্ভবপর হইবে। এই ভাবেই যদি অনন্ত কাল-প্রবাহের একটি অংশকে আমরা বিচ্ছিন্ন করিয়া উহার সম্যক্ ব্যাখ্যা করিতে পারি এবং উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই, আর পৃথিবীতে যদি সর্বদাই একই কারণ একই কার্য সৃষ্টি করে, তাহা হইলে সেই সমগ্র কাল-প্রবাহেরও ব্যাখ্যা আমরা অবশ্যই করিতে পারিব। যদি ইহা সত্য হয় যে, এই পৃথিবীতে অল্পকাল থাকিবার সময় আমরা আমাদের নিজ নিজ ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি, এবং যদি ইহাও সত্য হয় যে, প্রত্যেক বস্তুরই একটি কারণ থাকা অতি আবশ্যক; তাহা হইলে আমরা বর্তমানে যাহা আছি, তাহা যে আমাদের সমগ্র অতীতেরই ফল, ইহাও সত্য হইবে। এই কারণে মানুষের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের জন্য অন্য কাহারও প্রয়োজন নাই, মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য-নিয়ন্তা। পৃথিবীতে যে-সকল পাপ বিরাজ করিতেছে, তাহার কারণ একমাত্র আমরা নিজেরাই। আমরাই এই-সকল পাপ সৃষ্টি করিয়াছি; এবং আমরা যেমন সর্বদাই দেখি যে, পাপ হইতেই তাপের সৃষ্টি হয়, তেমনি আমরা দেখি যে, বর্তমান দুঃখ-ক্লেষের অধিকাংশই মানুষের অতীত পাপেরই ফলস্বরূপ। এই মতানুসারে একমাত্র মানুষই এক্ষেত্রে দায়ী। ঈশ্বরকে সেজন্য দোষ দেওয়া চলে না। সেই নিত্য-করুণাময় পিতাকে কোনক্রমেই দোষ দেওয়া চলে না; 'আমরা যেরূপ বীজ বপন করি, সেরূপই ফল পাই।'

দ্বৈতবাদীদের অপর একটি অভিনব মতবাদ এই : প্রত্যেক জীবই পরিশেষে মুক্তিলাভ করিবে। একজনও বাকি থাকিবে না। নানা অবস্থা-বিপর্যয় ও নানা সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়া প্রত্যেকেই অবশেষে বাহির হইয়া আসিবে। কিন্তু কোথা হইতে বাহির হইবে? সকল হিন্দু সম্প্রদায়েরই অভিমত—সকল জীবই এই সংসারচক্র হইতে বাহির হইয়া আসিবে। যে-বিশ্বকে আমরা দেখিতেছি এবং অনুভব করিতেছি, অথবা যে-বিশ্বের বিষয়ে আমরা কল্পনা করিতেছি—তাহাদের কোনটিই প্রকৃত সত্য হইতে পারে না, কারণ উভয়ের মধ্যেই ভালো-মন্দ সংমিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। দ্বৈতবাদীদের মতে এই পৃথিবীর উর্ধ্বে এরূপ একটি স্থান আছে, যেখানে কেবলই সুখ, কেবলই পুণ্য চিরবিরাজমান। সেইস্থান লাভ করিলে জীবের আর জন্ম-মৃত্যু থাকে না, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না; এবং এই ধারণা তাঁহাদের অতি প্রিয়। সেই স্থানে রোগ নাই, মৃত্যু নাই, নিত্য সুখ বিরাজমান; এবং সেই স্থানে তাঁহারা নিত্যই ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করিবেন, নিত্যই তাঁহাকে উপভোগ করিবেন। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, নিম্নতম কীটপতঙ্গ হইতে উচ্চতম দেবদূত এবং দেবতা পর্যন্ত সকলেই, শীঘ্রই হউক অথবা বিলম্বে হউক, সেই স্থান লাভ করিবে, যে-স্থানে আর কোন দুঃখের অস্তিত্ব থাকিবে না। কিন্তু আমাদের এই সংসারের শেষ হইবে না, ইহা অনন্তকাল চলিতেছে; তরঙ্গভঙ্গে চলিলেও, চক্রাকারে চলিলেও ইহার শেষ নাই। অসংখ্য জীবাত্মাকে মুক্তি এবং পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে। কিছু জীবাত্মা আছে বৃক্ষের মধ্যে, কিছু আছে পশুর মধ্যে, কিছু আছে মানুষের মধ্যে, কিছু দেবতার মধ্যে, কিন্তু প্রত্যেকেই এমন কি উচ্চতম দেবতারাও অপূর্ণ, বদ্ধ। এই বদ্ধাবস্থা অথবা ‘বন্ধন’ কিরূপ? বদ্ধাবস্থা জন্মমরণশীল অবস্থা। উচ্চতম দেবতাগণও মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই-সকল দেবতার অর্থ বিশেষ অবস্থা, বিশেষ পদ। যেমন ইন্দ্রত্ব একটি বিশেষপদ মাত্র। একজন অতি উচ্চ জীব বর্তমান কল্পের আরম্ভে এই পৃথিবী হইতেই এই পদ অলঙ্কৃত করিতে গিয়াছেন এবং বর্তমান কল্প শেষ হইলে তিনি পুনরায় এই পৃথিবীতে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন, এই পৃথিবীর অপর এক অতিশয় হিতকারী ব্যক্তি পরবর্তী কল্পে ঐ পদ অধিকার করিবেন। অন্যান্য সকল দেবতার ক্ষেত্রে এই একই নিয়ম প্রযোজ্য। তাঁহারাও বিশেষ বিশেষ পদধারী, যে-পদসমূহ লক্ষ লক্ষ জীব পর্যায়ক্রমে অধিকার করিয়াছে এবং

পরে পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যাঁহারা এই পৃথিবীতে পুণ্যকর্মাদি করেন এবং অন্যদের সাহায্য করেন , কিন্তু কিছুটা সকামভাবে, পুরস্কারের আশায় অথবা অন্যদের প্রশংসার লোভে, তাঁহারা নিশ্চয়ই মৃত্যুর পরে সেই-সকল পুণ্যকর্মের ফল ভোগ করিবেন—তাঁহারাই এই সকল দেবতা হইবেন। কিন্তু ইহা তো মুক্তি নহে, পুরস্কারের আশায় কৃত সকাম কর্ম দ্বারা কখনও মুক্তিলাভ হয় না। মানুষ যাহা কিছু কামনা করে, ঈশ্বর সে-সবই তাহাকে দান করেন। মানুষ শক্তি কামনা করে, সম্মান কামনা করে, দেবতারূপে ভোগসুখ কামনা করে; তাহাদের এই-সকল কামনা পূর্ন হয়; কিন্তু কোন কর্মেরই ফলই নিত্য নহে। কিছুকাল পরে উহা নিঃশেষিত হইয়া যায়; বহুদিন স্থায়ী হইলেও ইহা নিঃশেষিত হইয়া যাইবেই; এবং সেই সকল দেবতা পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন; এই ভাবে তাঁহারা মুক্তিলাভের আর একটি সুযোগ লাভ করিবেন। পশুগণ উচ্চতর স্তরে উঠিয়া হয়তো মনুষ্যরূপে দেহধারণ করিবে, দেবতারূপও ধারণ করিতে পারে, কিন্তু তাহার পর সম্ভবতঃ পুনরায় মনুষ্যরূপ ধারণ করিবে, অথবা পূর্বেরমতো পশুত্ব প্রাপ্ত হইবে—এইরূপে যতদিন পর্যন্ত না তাহাদের সকল ভোগ-বাসনা, পার্থিব জীবনের জন্য সকল তৃষ্ণা, এবং অহং-মমত্ববুদ্ধি লোপ পাইবে, ততদিন পর্যন্ত এইরূপই চলিতে থাকিবে। এই অহং-মম'-ভাবই পার্থিব সকল বন্ধনের কারণ। আপনি যদি একজন দ্বৈতবাদীকে প্রশ্ন করেন, 'আপনার সন্তান কি সত্যই আপনার?'—তিনি উত্তর দিবেন, 'সে ঈশ্বরের। আমার সম্পত্তি আমার নহে, ঈশ্বরের।' সকল বস্তুকে ঈশ্বরেরই বস্তুরূপে গ্রহণ করা কর্তব্য।

ভারতবর্ষের এই-সকল দ্বৈতবাদী সম্প্রদায় নিরামিষভোজী, খুব, খুব অহিংসা প্রচার করে। কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহাদের মতবাদ বৌদ্ধ মতবাদ হইতে ভিন্ন। আপনি যদি একজন বৌদ্ধ-মতাবলম্বীকে প্রশ্ন করেন, 'আপনি কেন পশুহত্যার বিরুদ্ধে প্রচার করিতেছেন?' তাহা হইলে তিনি উত্তর দিবেন, 'প্রাণী হত্যা করিবার আমাদের কোন অধিকার নাই।' কিন্তু আপনি যদি একজন দ্বৈতবাদীকে প্রশ্ন করেন, ' আপনি কেন পশুহত্যা করেন না?'—তাহা হইলে তিনি উত্তর দিবেন, 'কারণ পশু ঈশ্বরের।' সেইজন্য দ্বৈতবাদিগণের মত—এই 'অহং-মমত্ব'-ভাব কেবলমাত্র ঈশ্বর-বিষয়েই প্রযুক্ত হওয়া কর্তব্য। একমাত্র তিনিই

'অহং' এবং সকল বস্তুই তাঁহার। যখন মানুষ 'অহং-মম'-ভাব বিসর্জন দেয়, যখন সে সব কিছুই ঈশ্বর-চরণে অর্পণ করে, যখন সে সকলকেই ভালবাসে, এবং পুরস্কারের কোনরূপ আশা না করিয়া একটি পশুর প্রাণরক্ষার জন্যও প্রাণত্যাগে প্রস্তুত হয়, তখন তাহার হৃদয় বিশুদ্ধ হয়, এবং বিশুদ্ধ চিত্তেই ঈশ্বর-প্রীতির উদয় হয়। ঈশ্বরই প্রত্যেক জীবের আকর্ষণ-কেন্দ্র; এবং দ্বৈতবাদী বলেন : মৃত্তিকায় আবৃত সূচ চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় না; কিন্তু মৃত্তিকা ধৌত হইয়া গেলেই তাহা আকৃষ্ট হইবে। ঈশ্বর চুম্বক, জীব সূচ, তাহার পাপকর্মই ধূলি এবং ময়লা, যাহা তাহাকে আবৃত করে। জীব বিশুদ্ধ হইলেই স্বভাবজ আকর্ষণ-বলে ঈশ্বরের নিকট আসিবে, ঈশ্বরের সহিত অনন্তকাল বিরাজ করিবে, কিন্তু চিরকাল সে ঈশ্বর হইতে পৃথক্ হইয়া থাকিবে। পূর্ণতাপ্রাপ্ত জীব ইচ্ছানুসারে যে-কোন রূপ ধারণ করিতে পারে; ইচ্ছা করিলে সে একই সঙ্গে একশত দেহ ধারণ করিতে পারে, অথবা একটিও দেহ ধারণ না করিতে পারে। এরূপ জীব প্রায় সর্বশক্তিমান্ হয়, সে শুধু সৃষ্টি করিতে পারে না—সৃষ্টি করিবার শক্তি কেবল ঈশ্বরেরই আছে। যতই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হউক না কেন, কেহই জগৎ-ব্যাপার পরিচালনা করিতে পারে না। এই কার্য কেবল ঈশ্বরের। কিন্তু পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইলে সকল জীবই অনন্তকাল আনন্দপূর্ণ হয়, এবং অনন্তকাল ঈশ্বরের সহিত বাস করে। ইহাই হইল দ্বৈতবাদীদের মত।

দ্বৈতবাদিগণ আর একটি মতও প্রচার করেন। তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট এ-ধরনের প্রার্থনা করার সম্পূর্ণ বিরোধী : প্রভু! আমাকে ইহা দাও, উহা দাও। তাঁহাদের মতে এরূপ করা কখনই উচিত নহে। যদি কেহ কোন পার্থিব দ্রব্যের জন্য প্রার্থনা করিতে চায়, তাহা হইলে নিম্নতর কাহারও নিকটেই সেই প্রার্থনা নিবেদন করা উচিত—কোন দেবতা, দেবদূত অথবা পূর্ণতাপ্রাপ্ত মুক্ত জীবের নিকটেই কেবল পার্থিব বস্তু চাহিতে হয়। ঈশ্বরকে কেবল ভালবাসা কর্তব্য। 'প্রভু! আমাকে ইহা দাও, উহা দাও' এইভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা ধর্মের দিক হইতে ঘোরতর অন্যায়। অতএব দ্বৈতবাদীদের মতে—দেবতাদের একজনকে আরাধনা করিয়া মানুষ যাহা কামনা করে, তাহা শীঘ্র বা বিলম্বে লাভ করে, কিন্তু যদি সে মুক্তি চায়, তাহা হইলে তাহাকে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে হইবে। ইহাই ভারতবর্ষের জনসাধারণের ধর্ম।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণের মতবাদে প্রকৃত বেদান্ত-দর্শনের আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহাদের মতে—কার্য কখনও কারণ হইতে ভিন্ন নহে, কার্য কারণেরই রূপভেদ মাত্র। যদি জগৎ কার্য হয় এবং ঈশ্বর কারণ হন, তাহা হইলে জগৎ ঈশ্বর স্বয়ং; জগৎ—ঈশ্বর ব্যতীত অপর কিছুই হইতে পারে না। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা বলেন, ঈশ্বর জগতের উপাদান-ও নিমিত্ত-কারণ; তিনিই স্রষ্টা, এবং তিনিই সেই উপাদান—যাহা হইতে সমগ্র জগৎ অভিব্যক্ত হইয়াছে। আপনাদের ভাষায় যাহাকে 'সৃষ্টি ' বলা হয়, তাহার কোন প্রতিশব্দ সংস্কৃতে নাই, যেহেতু ভারত-বর্ষের কোন সম্প্রদায়ই পাশ্চাত্য মতানুযায়ী শূন্য হইতে জগৎসৃষ্টি স্বীকার করেন না। মনে হয়, একসময়ে এই মতবাদের সমর্থক কয়েকজন ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মতবাদ অতি শীঘ্রই নিরাকৃত হইয়া যায়। বর্তমানে আমি এমন কোন সম্প্রদায় জানি না, যাঁহারা এই মতবাদে বিশ্বাসী। 'সৃষ্টি' বলিতে আমরা বুঝি—যাহা পূর্ব হইতেই আছে, তাহারই বহিঃপ্রকাশ। এই সম্প্রদায়ের মতানুসারে সমগ্র জগৎই স্বয়ং ঈশ্বর। তিনিই জগতের উপাদান। আমরা বেদে পাঠ করি : ঊর্ণনাভ যেমন নিজের দেহ হইতে তন্তু বয়ন করে, তেমনি সমগ্র জগৎ সেই পরম সত্তা হইতে বাহির হইয়াছে।

কার্য যদি কারণের রূপান্তর মাত্র হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারে : অ-জড় কিন্তু নিত্য-জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বর হইতে কিরূপে জড় অচেতন জগৎ সৃষ্ট হইতে পারে? যদি কারণ শুদ্ধ ও পূর্ণ হয়, তাহা হইলে কার্য অশুদ্ধ ও অপূর্ণ হয় কি করিয়া? এ-বিষয়ে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী কি বলেন? তাঁহাদের মতবাদ একটু অদ্ভুত। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর জীব ও জগৎ—এই তিনটি ভাব বা সত্তা অভিন্ন। ঈশ্বর যেন আত্মা, জীব-জগৎ তাঁহার দেহ। যেমন আমাদের দেহ আছে, আত্মাও আছে, তেমনি সমগ্র জগৎ এবং সকল জীবই ঈশ্বরের দেহ, এবং ঈশ্বর সকল আত্মার আত্মা। এইরূপে ঈশ্বরই জগতের উপাদান-কারণ। দেহ পরিবর্তিত হইতে পারে, তরুণ বা বৃদ্ধ হইতে পারে, সবল বা দুর্বল হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না। আত্মা সর্বদাই সেই চিরন্তন সত্তা, যাহা দেহের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয়। দেহ আসে যায়; কিন্তু আত্মার কোন পরিবর্তন নাই। তেমনি সমগ্র জগৎ পরমেশ্বরের দেহ, এবং সেই অর্থে জগৎ স্বয়ং ঈশ্বর। কিন্তু জাগতিক পরিবর্তনে ঈশ্বর

পরিবর্তিত হন না। এরূপ উপাদান হইতে তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন, এবং একটি কল্পের শেষে তাঁহার দেহ সূক্ষতর হইয়া যায়, সঙ্কুচিত হয়। আর একটি কল্পের প্রারম্ভে তাহা আবার প্রসারিত হয় এবং তাহা হইতেই এই-সকল বিভিন্ন বিশ্ব প্রকাশিত হয়।

দ্বৈতবাদী এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী—উভয়েই স্বীকার করেন, আত্মা স্বভাবতই শুদ্ধ, কিন্তু স্বকর্মদোষে অশুদ্ধ হইয়া পড়ে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ দ্বৈতবাদিগণ অপেক্ষা আরও সুন্দর ভাবে এই তত্ত্বটি প্রকাশ করেন। তাঁহারা বলেন, জীবের শুদ্ধতা এবং পূর্ণতা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে এবং পুনরায় বিকশিত হয়। আমরা বর্তমানে আত্মার এই স্বভাবগত জ্ঞান, শুদ্ধতা ও শক্তি পুনঃপ্রকাশিত করিবার জন্যই চেষ্টা করিতেছি। আত্মার বহু গুণ আছে, কিন্তু এই জীবাত্মা সর্বশক্তিমান্ ও সর্বজ্ঞ নয়। প্রত্যেক অসৎ কর্ম আত্মার স্বরূপকে সঙ্কুচিত করে, এবং প্রত্যেক সৎ কর্ম তাহাকে প্রসারিত করে, সকল জীবাত্মাই পরমাত্মার অংশ। 'জ্বলন্ত অগ্নি হইতে যেমন লক্ষ লক্ষ স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, অনন্তরূপ ঈশ্বর হইতেও তেমনি এই-সকল আত্মা নির্গত হইয়াছে। প্রত্যেকেরই লক্ষ্য এক। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণের ঈশ্বরও ব্যক্তিভাবাপন্ন, অনন্ত-কল্যাণ-গুণাধার; কেবল তিনি জগতের সর্বত্রই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। তিনি সর্ব বস্তুতে, সকল স্থানে অন্তর্লীন হইয়া আছেন; যখন শাস্ত্র বলেন—ঈশ্বরই সব, ইহার অর্থ এই যে, ঈশ্বর সর্ববস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন; তিনি যে দেওয়াল হইয়াছেন, তাহা নহে; তিনি দেওয়ালের মধ্যে নিহিত হইয়া আছেন। পৃথিবীতে এমন একটি ক্ষুদ্রতম অংশ, এমন একটি অণু-পরমাণু নাই, যাহাতে তিনি নাই। সকল জীবাত্মাই সসীম; তাহারা সর্বব্যাপী নয়। যখন তাহাদের শক্তি বিকশিত হয় এবং তাহারা পূর্ণতা লাভ করে, তখন তাহাদের আর জন্ম-মৃত্যু থাকে না; তাহারা ঈশ্বরের সহিত অনন্তকাল বাস করিতে থাকে।

এইবার আমরা অদ্বৈতবাদ-প্রসঙ্গে আসিলাম। আমাদের মতে ইহাই হইল সকল দেশের, সকল যুগের প্রকৃত দর্শন এবং ধর্মের শেষ ও সুন্দরতম পুষ্প—ইহাতেই মানবীয় চিন্তার উচ্চতম বিকাশ দৃষ্ট হয়; যে-রহস্য অভেদ্য বলিয়াই বোধ হয়, তাহাও অদ্বৈতবাদ ভেদ করিয়াছে। ইহাই হইল অদ্বৈতবাদী বেদান্ত। অদ্বৈতবাদ এরূপ নিগূঢ়—এরূপ উচ্চ যে, ইহা

জনসাধারণের ধর্ম হইতে পারে না। যে-ভারতবর্ষে ইহার জন্ম এবং যেখানে ইহা বিগত তিন সহস্র বৎসর ধরিয়া পূর্ণ গৌরবে রাজত্ব করিতেছে, সেখানেও ইহা জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে নাই। আমরাও ক্রমশঃ দেখিব যে, যে-কোন দেশের অতি চিন্তাশীল নরনারীর পক্ষেও অদ্বৈতবাদ হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। আমরা নিজেদের এরূপ দুর্বল, এরূপ হীন করিয়া ফেলিয়াছি যে, আমরা বড় বড় দাবি করিতে পারি, কিন্তু স্বভাবতঃ আমরা অন্যের উপর নির্ভর করিতে চাই। আমরা যেন ক্ষুদ্র দুর্বল চারাগাছের মতো—সর্বদাই একটা অবলম্বন চাই। কতবার একটি সহজ আরামের ধর্ম সম্বন্ধে বলিবার জন্য আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছি। অতি অল্প লোকই সত্যের কথা শুনিতে চান, অল্পতর লোক সত্য জানিতে সাহসী হন, অল্পতম লোক সেই সত্যকে ব্যাবহারিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সহসী হন, ইহা তাঁহাদের দোষ নয়, ইহা তাঁহাদের মস্তিষ্কের দুর্বলতা। যে-কোন নূতন তত্ত্ব—বিশেষ করিয়া উচ্চ তত্ত্ব—বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, মস্তিষ্কের ভিতর যেন একটি নূতন চিন্তা-প্রণালী উদ্ভাবনের চেষ্টা করে; এবং ইহাতে মানুষের সমগ্র জীবন বিপর্যস্ত হইয়া যায়, এবং মানুষ সমতা হারাইয়া ফেলে। তাহারা পূর্ব হইতেই বিশেষ ধরনের পরিবেশে অভ্যস্ত; এবং সেই জন্য তাহাদের প্রাচীন পরিবারিক, নাগরিক শ্রেনীগত, দেশগত বহু এবং বিবিধ কুসংস্কার, সর্বোপরি প্রত্যেক মানুষের স্বীয় অন্তর্নিহিত বহু কুসংস্কার জয় করিতে হয়। তাহা সত্ত্বেও পৃথিবীতে এরূপ কয়েকজন সাহসী ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা সত্য উপলব্ধি করিতে সাহসী হন, সত্য গ্রহণে সাহসী হন, শেষ পর্যন্ত সত্য অনুসরণ করিতে সাহসী হন।

অদ্বৈতবাদী কি বলেন? তিনি বলেন : যদি ঈশ্বর থাকেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই জগতের নিমিত্ত- এবং উপাদান-কারণ। তিনি যে কেবল স্রষ্টা—কারণ, তাহাই নহে, সৃষ্ট কার্যও। তিনি স্বয়ং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। ইহা কিরূপে সম্ভব? শুদ্ধ আত্মা ঈশ্বরই কি জীবজগতে পরিণত হইয়াছেন? হাঁ, আপাতদৃষ্টিতে ইহাই তো সত্য। অজ্ঞ ব্যক্তিরা যাহাকে বিশ্ব-সংসাররূপে গ্রহণ করে, তাহার কোন বাস্তব সত্তা নাই। তাহা হইলে তুমি, আমি এবং অন্যান্য দৃষ্ট বস্তুসমূহ কি? তাহা কেবল আত্মসম্মোহন—প্রকৃতপক্ষে অনন্ত অসীম নিত্যমঙ্গলময় সত্তাই একমাত্র সত্তা। এই সত্তাতেই আমরা এই-সকল স্বপ্ন দেখি। তিনিই

আত্মা—সকল বস্তুর ঊর্ধ্বে, অনন্ত অসীম, সকল জ্ঞাত-জ্ঞেয়ের ঊর্ধ্বে। তাঁহারই মধ্যে তাঁহারই মাধ্যমে আমারা বিশ্বকে দেখি। তিনিই একমাত্র সত্তা। তিনিই এই 'টেবিল'; তিনিই এই সম্মুখস্থ শ্রোতৃমণ্ডলী, তিনিই এই কক্ষপ্রাচীর, তিনিই সকল বস্তু, কেবল তাহাদের বিশেষ বিশেষ বিভিন্ন নাম ও রূপ তাঁহার নাই। এই 'টেবিলের' নাম বর্জন কর, বিশেষ রূপ অথবা আকারাদি বর্জন কর; যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই তিনি। বৈদান্তিক তাঁহাকে পুরুষও বলেন না, নারীও বলেন না—এই-সকল বর্ণনাই কল্পনা, মনুষ্য-মস্তিষ্কজাত মোহ-ভ্রান্তি মাত্র; প্রকৃতপক্ষে আত্মার মধ্যে নরনারী-ভেদ নাই। যাহারা মোহগ্রস্ত ভ্রান্ত, যাহারা পশুবৎ, তাহারাই কেবল নারীকে নারী,পুরুষকে পুরুষরূপে দর্শন করে। যাঁহারা সবকিছুর ঊর্ধ্বে, তাঁহারা নরনারীর ভিতর ভেদ করিবেন কিরূপে? সকল বস্তু, সকল জীবই আত্মা—লিঙ্গবিহীন, শুদ্ধ, চিরমঙ্গলময় আত্মা। নাম, রূপ—দেহই কেবল জড়; এবং ইহারাই সকল ভেদের স্রষ্টা। নাম ও রূপ, এই উভয় প্রকারের ভেদ যদি বর্জন করা যায়, তাহা হইলে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই এক হইয়া যাইবে। কোন স্থানেই 'দুই' নাই, সর্বত্রই আছে মাত্র সেই 'এক'। তুমি ও আমি এক। প্রকৃতি নাই, ঈশ্বরও নাই, বিশ্বও নাই; আছে কেবল এই এক অনন্ত অসীম সত্তা, যাঁহা হইতে নাম-রূপের মাধ্যমে সকল বস্তু সৃষ্টি হইয়াছে। বিজ্ঞাতাকে কিরূপে জানা যাইবে? ইহা জানা যায় না। তোমার আত্মাকে তুমি দেখিবে কিরূপে? তুমি কেবল নিজেকে প্রতিবিম্বিত করিতে পারো। এই ভাবেই সেই এক নিত্য সত্তা আত্মার প্রতিবিম্বই সমগ্র বিশ্ব; এবং ভাল-মন্দ দর্পণের উপর পড়িলে ভাল-মন্দ প্রতিবিম্বের উদ্ভব হয়। হত্যাকারীর ক্ষেত্রে প্রতিফলক-দর্পণটি মলিন বা মন্দ, আত্মা নহেন। একজন সাধুর ক্ষেত্রে দর্পণটি শুদ্ধ। আত্মা স্বভাবতই শুদ্ধ। জগতে ইনিই সেই এক, সেই একক সত্তা, যিনি নিম্নতম কীট-পতঙ্গ হইতে উচ্চতম প্রাণীতে পর্যন্ত সর্বত্র নিজেকে প্রতিবিম্বিত করিতেছেন। দৈহিক, মানসিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক সব দিক দিয়া সমগ্র বিশ্ব সেই অখণ্ড সত্তারূপে বিরাজমান। আমরা এই এক সত্তাকে বিভিন্ন রূপে দর্শন করি, সেই এক সত্তার উপরেই বিভিন্ন আকৃতি সৃষ্টি করি। যিনি নিজেকে মানব-স্তরে আবদ্ধ রাখিয়াছেন, তাঁহার নিকট এই সত্তা মানুষের জগৎরূপেই প্রতিভাত হয়। যিনি উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট এই সত্তা স্বর্গরূপে প্রতিভাত হয়।

বিশ্বজগতে কেবল একটি সত্তাই রহিয়াছে, দুইটি নাই। তাঁহার আসাও নাই, যাওয়াও নাই। তাঁহার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, পুনরায় দেহধারণও নাই। তাঁহার মৃত্যু হইবে কিরূপে? তিনি কি কোন স্থানে গমন করিতে পারেন? এই-সকল স্বর্গ, এই-সকল ভুবন, এই-সকল স্থান মনের মিথ্যা কল্পনা মাত্র। তাহাদের কোন অস্তিত্বই নাই, অতীতেও ছিল না, ভবিষ্যতেও থাকিবে না।

আমি সর্বব্যাপী, নিত্য। আমি কোথায় গমন করিতে পারি? আমি কোথায় না আছি? আমি প্রকৃতির এই পুস্তকটি পাঠ করিতেছি। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়িয়া শেষ করিতেছি, এবং পাতা উল্টাইয়া যাইতেছি, সঙ্গে সঙ্গে জীবনের এক একটি স্বপ্ন বিলীন হইয়া যাইতেছে। জীবনের আর একটি পৃষ্ঠা উল্টানো হইল, আর একটি স্বপ্নেরও উদয় হইল, ইহাও বিলীন হইয়া যাইতেছে, ক্রমান্বয়ে চলিয়া যাইতেছে, আমি আমার পাঠ শেষ করিতেছি। আমি এগুলিকে চলিয়া যাইতে দিই, একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াই। পুস্তকটি ফেলিয়া দিই, এবং সমস্ত ব্যাপারটি পরিসমাপ্ত হইয়া যায়।

অদ্বৈতবাদী কি প্রচার করেন? অতীতে যে-সকল দেবতা ছিলেন, এবং ভবিষ্যতেও যাঁহারা হইবেন, তাঁহাদের সকলকেই তিনি সিংহাসনচ্যুত করিয়া সেই সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছেন মানবাত্মাকে, যে আত্মা সূর্য-চন্দ্র অপেক্ষা মহত্তর, স্বর্গ অপেক্ষাও উচ্চতর, এই বিশাল জগৎ অপেক্ষাও বিশালতর।

যে আত্মা জীবাত্মা-রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার মহিমা কোন গ্রন্থ, কোন শাস্ত্র, কোন বিজ্ঞান কল্পনাও করিতে পারে না। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমময় দেবতা, যিনি চিরদিন বিরাজমান; তিনি একমাত্র দেবতা, যিনি অতীতেও ছিলেন, বর্তমানেও আছেন, ভবিষ্যতেও থাকিবেন। সুতরাং আমাকে একমাত্র আমার আত্মাকেই উপাসনা করিতে হইবে। অদ্বৈতবাদী বলেন : আমি আমার আত্মাকেই উপাসনা করি। কাহার সম্মুখে আমি প্রণত হইব? আমি আমার আত্মাকেই প্রণাম করি। কাহার নিকট আমি সাহায্যের জন্য যাইব? বিশ্বব্যাপী অসীম সত্তা 'আমাকে সাহায্য করিতে পারে? এগুলি কেবল মূর্খের স্বপ্ন, ভ্রান্তি মাত্র। কে কবে কাহাকে সাহায্য করিয়াছে? কেহই নহে। যখনই দেখিবে যে, একজন

দুর্বল ব্যক্তি—একজন দ্বৈতবাদী স্বর্গ হইতে সাহায্য ভিক্ষা করিয়া রোদন ও আর্তনাদ করিতেছে, তখনই জানিও সে এরূপ করিতেছে, কারণ সে জানেনা—সেই স্বর্গ তাহার নিজেরই মধ্যে বিরাজমান। সে স্বর্গ হইতে সাহায্য চায়, এবং সেই সাহায্য সে পায়। আমরা দেখি সেই সাহায্য আসে; কিন্তু তাহা আসে তাহার নিজের ভিতর হইতে, যদিও সে ইহাকে বাহিরের সাহায্য বলিয়া ভ্রম করে। কোন কোন সময়ে এরূপ ঘটে যে, শয্যাশায়ী অসুস্থ ব্যক্তি দ্বারে করাঘাতের শব্দ শুনিতে পায়। সে উঠিয়া দ্বার খোলে, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পায় না। তখন সে শয্যায় ফিরিয়া আছে; কিন্তু পুনরায় সে দ্বারে করাঘাতের শব্দ শুনিতে পায়। সে আবার উঠিয়া দ্বার খোলে। সেখানে কেহ নাই। অবশেষে সে আবিষ্কার করে, তাহার নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দকেই সে দ্বারে করাঘাতের শব্দ বলিয়া মনে করিতেছিল। একই ভাবে দেবতাকে বাহিরে বৃথা অন্বেষণ করিবার পর মানুষের পরিক্রমা সমাপ্ত হয়, যে-স্থান হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেই স্থানেই সে ফিরিয়া আসে—সেই মানবাত্মায়; তখন সে বুঝিতে পারে, যে-ঈশ্বরকে সে এতকাল ধরিয়া সর্বত্র অন্বেষণ করিতেছে—বনে পর্বতে, প্রত্যেক নদী-নালায়, প্রত্যেক মন্দিরে গির্জায় এবং স্বর্গে, সেই ঈশ্বর—যাঁহাকে সে এতকাল ধরিয়া স্বর্গ হইতে মর্ত্য-শাসনকারী বলিয়া কল্পনা করিয়া আসিতেছে, সেই ঈশ্বর সে নিজেই। আমিই তিনি, এবং তিনিই আমি। আমি ব্যতীত অপর কোন ঈশ্বর ছিলই না এবং এই ক্ষুদ্র আমির অস্তিত্বও কোনদিন ছিল না।

তাহা সত্ত্বেও সেই পূর্ণ নির্দোষ ঈশ্বর কিরূপে মোহগ্রস্ত হইলেন? তিনি কদাপি মোহগ্রস্ত হন নাই। পূর্ণ নির্দোষ ঈশ্বর কিরূপে স্বপ্ন দেখিতে পারেন ?তিনি কখনও স্বপ্ন দেখেন নাই। সত্য কখনও স্বপ্ন দেখে না। ‘কোথা হইতে এই মিথ্যা মোহের উৎপত্তি হইল? এই প্রশ্নটিই অযৌক্তিক। মোহ হইতেই মোহের উৎপত্তি। সত্য-দর্শন হইলেই মিথ্যা মোহের বিলয় ঘটে। মোহের ভিত্তিতেই মোহের স্থিতি-ঈশ্বরের ,সত্যের অথবা আত্মার ভিত্তিতে নহে। তুমি কখনও মোহের স্থিতি—ঈশ্বররে, সত্যরে অথবা আত্মার ভত্তিতিে নহে। তুমি কখনও মোহে বিরাজ কর না, মোহই তোমার মধ্যে থাকে। একটি মেঘ ভাসিতেছে, অপর একটি মেঘ আসিয়া তাহাকে সরাইয়া দিয়া নিজে তাহার স্থান অধিকার করে। তারপর অপর একটি মেঘ আসিয়া তাহাকেও সরাইয়া দিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। যেরূপ

শাশ্বত নীল আকাশে নানা বর্ণের মেঘ আসে, অল্পক্ষণের জন্য থাকে, তার পর চলিয়া যায়, আকাশ পূর্বের মতো নীলই থাকে, সেইরূপ তোমরাও চিরকাল শুদ্ধ, চিরকাল পূর্ণ। তোমরাই পৃথিবীর প্রকৃত দেবতা; না, দ্বিতীয় কোনকালেই নাই—কেবল 'একই' সর্বদা আছেন। 'তুমি এবং আমি'—এরূপ বলাই তো ভুল। বলো, 'আমি'। 'আমিই' লক্ষ লক্ষ মুখে খাইতেছি; আমি কিরূপে ক্ষুধার্ত হইতে পারি? এই 'আমিই' অসংখ্য হস্তে কার্য করিতেছি; আমি কিরূপে নিষ্ক্রিয় হইতে পারি? 'আমিই' সমগ্র বিশ্বে জীবন যাপন করিতেছি; আমার মৃত্যু কোথায়? আমি সমস্ত জীবন-মৃত্যুর ঊর্ধ্বে। আমি কোথায় মুক্তি অন্বেষণ করিব? কারণ আমি স্বরূপতই চিরমুক্ত। কে আমাকে বন্ধন করিতে পারে—বিশ্বের ঈশ্বর কি? পৃথিবীর শাস্ত্রসমূহ কেবল ক্ষুদ্র মানচিত্র—যে-আমি বিশ্বের একমাত্র সত্তা, তাহারই মহিমা ইহারা বর্ণনা করিতে প্রয়াসী। সুতরাং এই-সকল গ্রন্থের মূল্য আমার নিকট আর কতটুকু?—অদ্বৈতবাদী এইরূপই বলেন।

'সত্যকে জানো এবং এক নিমেষেই মুক্ত হইয়া যাও।' তখন সব অন্ধকার বিদূরিত হইযা যাইবে। যখন মানুষ নিজেকে বিশ্বের অনন্ত অসীম সত্তার সহিত এক বলিয়া উপলব্ধি করে, তখন সমস্ত ভেদ দূরীভূত হয়। যখন সকল নর-নারী, সকল দেবতা-দেবদূত, সকল পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই একত্বে দ্রবীভূত হইয়া যায়—তখন সমস্ত ভয়ও দূর হইয়া যায়। আমি কি নিজেকে আঘাত করিতে পারি? আমি কি নিজেকে হত্যা করিতে পারি? আমি কি নিজেকে আহত করিতে পারি? কাহাকে ভয় করিব? তুমি কি কোনদিন নিজেকেই ভয় করিতে পারো? তখন সকল দুঃখ দূর হইয়া যাইবে। কী আমার দুঃখের কারণ হইতে পারে? আমিই তো পৃথিবীর একমাত্র সত্তা। তখন সকল ঈর্ষা দূর হইয়া যাইবে। কাহাকে আমি ঈর্ষা করিব? নিজেকে? তখন সকল মন্দ ভাব দূর হইয়া যাইবে। কাহার বিরুদ্ধে আমার মন্দ ভাব থাকিবে? নিজের বিরুদ্ধে? পৃথিবীতে 'আমি' ছাড়া আর কেহই নাই। অদ্বৈতবাদী বলেন যে, ইহাই হইল জ্ঞানের একটিমাত্র পন্থা। জগতে যে বহু আছে—সেই ভেদ, সেই কুসংস্কার ধ্বংস করিয়া ফেলো। 'এই বহুবস্তুপূর্ণ জগতে সেই এককেই যিনি দর্শন করেন—এই জড় জগতের মধ্যে সেই চেতন সত্তাকেই

যিনি দর্শন করেন, এই ছায়াময় পৃথিবীতে সেই সত্যকেই যিনি ধারণ করেন, তিনিই শাশ্বত শান্তি লাভ করেন, অন্য কেহ নহে, অন্য কেহই নহে।'

ঈশ্বর সম্বন্ধে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার যে তিনটি স্তর আছে, এগুলি তাহারই মূলসুত্র। আমরা দেখিয়াছি, ইহার আরম্ভ হইয়াছে 'জগদ্‌বহির্ভূত ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বরের' মতবাদ লইয়া। তারপর বাহির হইতে ভিতরে গিয়া ইহা 'জগতের অন্তর্যামী ঈশ্বরের' মতবাদে স্থিতি লাভ করে। পরিশেষে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে এক ও অভিন্ন প্রতিপন্ন করিয়া এবং সেই এক আত্মাকে পৃথিবীর বহুরূপ প্রকাশের ভিত্তি নির্দেশ করিয়া এই আধ্যাত্মিক চিন্তা শেষ হইয়াছে। ইহাই বেদের চরম ও পরম কথা। ইহা দ্বৈতবাদ লইয়া আরম্ভ হয়, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়, এবং অদ্বৈতবাদে সমাপ্ত হয়। আমরা জানি, পৃথিবীতে অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই শেষ পর্যন্ত এই অবস্থায় পৌঁছিতে পারেন, এমন কি ইহাতে বিশ্বাস করিতে পারেন এবং তাহা অপেক্ষা অল্প ব্যক্তি এই ভাব অনুসারে কার্য করিতে পারেন। তাহা সত্ত্বেও আমরা ইহাও জানি যে, ইহারই মধ্যে আছে বিশ্বের সকল নীতি-তত্ত্ব, সকল আধ্যাত্মিক তত্ত্বের পূর্ণ ব্যাখ্যা। 'অপরের মঙ্গলসাধন কর'—ইহা সকলেই বলেন; কিন্তু কেন? ইহার ব্যাখ্যা কি? কেন সকল মহৎ ব্যক্তিই সমগ্র মানবজাতির, এবং মহত্তর ব্যক্তিগণও সকল প্রাণিজগতের ভ্রাতৃত্বের বিষয় বলিয়াছেন? কারণ তাঁহারা না জানিলেও এই-সকলের পশ্চাতে, তাঁহাদের সকল অযৌক্তিক এবং ব্যক্তিগত কুসংস্কারের মধ্যেও সকল বহুত্ববিরোধী সেই আত্মার শাশ্বত আলোকই অল্প অল্প দেখা যাইতেছিল এবং দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করিতেছিল—সমগ্র বিশ্বই এক।

জ্ঞানের চরম কথা : এক অখণ্ড বিশ্ব—যাহা ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া জড়রূপে, বুদ্ধির মধ্য দিয়া জীবরূপে, আত্মার মধ্য দিয়া ঈশ্বররূপে প্রতিভাত হয়। পৃথিবীতে যাহাকে পাপ বা অন্যায় বলা হয়, তাহারই আবরণ যে নিজেকে আবৃত করিয়া রাখে,তাহার নিকট এই জগৎ পরিবর্তিত হইয়া যায় এবং কুৎসিত আকার ধারণ করে। একজন ভোগসুখকামীর নিকট এই পৃথিবী পরিবর্তিত হইয়া স্বর্গের আকার ধারণ করে, এবং পূর্ণ মানবের নিকট সবই তিরোহিত হইয়া যায় এবং সব কিছু তাঁহার নিজেরই আত্মা হইয়া দাঁড়ায়।

বস্তুতঃ সমাজের বর্তমান অবস্থায় পূর্বোক্ত স্তরেরই প্রয়োজনীয়তা আছে। একটি স্তর অপর স্তরকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করে না; একটি স্তর অপর স্তরকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করে না; একটি স্তর অপর স্তরের পূর্ণতর রূপ মাত্র। অদ্বৈতবাদী অথবা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীবাদী এই কথা বলেন না যে, দ্বৈতবাদ ভ্রমাত্মক। ইহাও সত্য, কিন্তু নিম্নস্তরের সত্য; ইহাও পূর্ণ সত্যের দিকেই অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং প্রত্যেককেই তাহার নিজের জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে জগৎ সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করিতে দাও; কাহাকেও আঘাত করিও না, কাহাকেও স্থান দিতে অসম্মত হইও না, যে যেখানে দণ্ডায়মান আছে, সেখানেরই তাহাকে গ্রহণ কর এবং যদি পারো, তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়া দাও, তাহাকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত কর, কিন্তু তাহাকে আঘাত করিও না, ধ্বংস করিও না। পরিশেষে সকলেই সত্যে উপনীত হইবে। 'যখন হৃদয়ের সকল কামনা পরাভূত হইবে, তখনই মর্ত্য জীব অমৃতত্বের অধিকারী হইবে'—তখন জীবই স্বয়ং ঈশ্বর হইয়া যাইবে।

২. আত্মা : তাহার বন্ধন ও মুক্তি

[আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতা]

অদ্বৈতবাদীর মতে জগতে সত্য বস্তু একটিই আছে, তাঁহাকে ব্রহ্ম বলা হয়। অন্যান্য সকল বস্তুই মিথ্যা—ব্রহ্ম হইতে মায়া-শক্তি দ্বারা উদ্ভাবিত। আমাদের উদ্দেশ্য হইল পুনরায় সেই ব্রহ্মভাবে ফিরিয়া যাওয়া। আমরা প্রত্যেককেই সেই ব্রহ্ম, সেই সত্য, কিন্তু মায়া-সমন্বিত। যদি এই মায়া বা অজ্ঞান হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা প্রকৃতপক্ষে যাহা, তাহাই হইব। এই দর্শন অনুসারে প্রত্যেক মানুষেরই তিনটি অংশ আছে—দেহ, অন্তঃকরণ বা মন, এবং মনের পশ্চাতে আত্মা। দেহ আত্মার বাহিরের এবং মন আত্মার ভিতরের আবরণ। এই আত্মাই প্রকৃত জ্ঞাতা, প্রকৃত ভোক্তা; এই আত্মাই অন্তঃকরণের সাহায্যে দেহকে পরিচালিত করিতেছে।

জড় দেহের মধ্যে একমাত্র আত্মাই জড় নয়। যেহেতু আত্মা জড় নয়, অতএব আত্মা যৌগিক বস্তু হইতে পারে না; এবং যৌগিক পদার্থ নয় বলিয়া আত্মা প্রকৃতিক কার্য-কারণ-নিয়মের অধীনও নয়, সেজন্য আত্মা অমর। যাহা অমর তাহা অনাদি, কেন না যাহার আদি আছে, তাহারই অন্ত আছে।

ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, আত্মা নিরাকার; জড় ছাড়া আকার থাকিতে পারে না। সকল সাকার বস্তুরই আদি অন্ত আছে। আমরা কেহই এমন সাকার বস্তু দেখি নাই, যাহার আদি ও অন্ত নাই। শক্তি ও জড়ের সমন্বয়ে আকারের উদ্ভব হয়। এই 'চেয়ারটির' একটি বিশেষ আকার আছে; ইহার অর্থ এই যে, কিছু পরিমাণ জড়ের উপর কিছু পরিমাণ শক্তি কার্য করিয়া ঐ জড়কে একটি বিশেষ আকার ধারণ করিতে বাধ্য করিয়াছে। এই আকারটি জড় ও শক্তির সংযোগ। এ সংযোগ শাশ্বত হইতে পারে না, এরূপ সংযোগ কালক্রমে ভাঙিয়া যায়। এই কারণে সকল আকারই আদি-এবং অন্ত-বিশিষ্ট। আমরা জানি আমাদের দেহ বিনষ্ট হইবে; ইহার আরম্ভ বা আদি ছিল, একদিন শেষ হইবে। কিন্তু আকার নাই বলিয়া

আত্মা এই আদি-অন্তের নিয়মাধীন নয়। আত্মা অনাদিকাল হইতেই আছে; কাল যেমন শাশ্বত, মানবের আত্মাও তেমনি শাশ্বত। দ্বিতীয়তঃ আত্মা নিশ্চয়ই সর্বব্যাপী। কেবল সাকার বস্তুই দেশকাল দ্বারা সৃষ্ট এবং সীমাবদ্ধ; যাহা নিরাকার, তাহা দেশকাল দ্বারা সীমাবদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং অদ্বৈত-বেদান্তমতে—আমার, তোমার, সকলের মধ্যে আত্মা সর্বব্যাপী। তুমি যেমন পৃথিবীতে আছ, তেমনি সূর্যেও আছ; যেমন আমেরিকায় আছ, তেমনি ইংলাডেও আছ। কিন্তু আত্মা দেহমনের মাধ্যমেই কার্য করে, এবং যেখানে দেহমন আছে, সেখানে তাহার কার্যও দৃষ্ট হয়।

আমাদের প্রত্যেক কার্য, প্রত্যেক চিন্তা মনে একটি ছাপ রাখিযা যায়, এগুলিকে সংস্কৃত ভাষায় বলা হয় 'সংস্কার'; এবং এই-সকল সংস্কার মিলিত হইয়া একটি প্রচণ্ড শক্তি সৃষ্টি করে, যাহাকে বলা হয় 'চরিত্র'। মানুষের চরিত্র মানুষ নিজেই সৃষ্টি করে; চরিত্র তাহার নিজের মানসিক এবং দৈহিক কার্যাবলীর ফল মাত্র। সংস্কারসমূহের সমন্বয়ই হইল সেই শক্তি, যাহা মৃত্যুর পরে মানুষের নূতন জীবন নির্দিষ্ট করে। একজন মানুষের মৃত্যু হয়, তাহার দেহপাত হয় এবং সেই দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া যায়; কিন্তু সংস্কারসমূহ মনের ভিতর থাকিয়া যায়। এই মন সূক্ষ্মতর জড় বস্তু বলিয়া বিলীন হয় না, কারণ বস্তু যত সূক্ষ্ম হয়, তত স্থায়ী হয়। কিন্তু পরিশেষে মনও লয় পায়, এবং ইহারই জন্য আমরা চেষ্টা করিতেছি। এই প্রসঙ্গে সর্বোৎকৃষ্ট একটি উদাহরণের কথা আমার মনে পড়িতেছে, তাহা হইল ঘূর্ণিবায়ু। বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন বায়ু-প্রবাহ আসিয়া একস্থানে সমবেত হয়, এবং ঘুরিতে আরম্ভ করে। ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা নিকটের কাগজ, খড়কুটা প্রভৃতি টানিয়া লইয়া একস্থানে ধূলিময় আকার ধারণ করে; আবার তাহা ফেলিয়া দিয়া অন্য স্থানে যাইয়া অন্য আকারে ঘুরিতে থাকে, এইরূপ সম্মুখে যাহা আছে, তাহা আকর্ষণ করিয়া পুনরায় বিভিন্ন আকার ধারণ করে। সংস্কৃতে যাহাকে 'প্রাণ-শক্তি' বলে, তাহাও এইভাবে একত্র হইয়া জড় পদার্থ হইতে দেহ ও মন সৃষ্টি করে; যতক্ষণ না ঐ দেহের পতন হয়, ততক্ষণ সে সক্রিয়ভাবে কার্য করিতে থাকে; ঐ দেহনাশের পর নূতন উপাদান হইতে প্রানশক্তি অপর একটি দেহ সৃষ্টি করে, সেই দেহের বিনাশের পর আবার অপর একটি দেহ সৃষ্টি করে—এইভাবেই এই প্রক্রিয়া চলিতে থাকে। শক্তি জড়-পদার্থ ব্যাতীত চলিতে পারে না।

সেজন্য দেহপাতের পরেও মনের উপাদান থাকে, প্রাণ সংস্কাররূপে মনের উপর কার্য করে; এবং মন তখন অন্য স্থানে গিয়া নূতন উপাদান হইতে অপর একটি ঘূর্ণির সৃষ্টি করে এবং নূতন যাত্রা আরম্ভ করে; এইভাবে মন একস্থান হইতে অন্য স্থানে পরিভ্রমণ কের, যতক্ষণ না গতিবেগ শেষ হয়, ততক্ষণ চলিতে থাকে; পরে পড়িয়া যায়, ইহার গতিবেগ সমাপ্ত হয়। এইভাবে যখন মনের নাশ হইবে, কোন সংস্কার না রাখিয়াই মন একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে, তখন আমরা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইব, কিন্তু তাহার পূর্ব পর্যন্ত আমরা বদ্ধই থাকিব। মনের ঘূর্ণিতে সমাচ্ছন্ন আত্মা কল্পনা করিতেই থাকিবে, আমি স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হইতেছি। যখন এই ঘূর্ণি বা আবর্ত চলিয়া যাইবে, তখন আত্মা জানিতে পারিবে, সে সর্বব্যাপী, সে যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারে, সে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত, এবং সে যত ইচ্ছা তত দেহ-মন সৃষ্টি করিতে পারে। কিন্তু তার পূর্ব পর্যন্ত আত্মা কেবল ঘূর্ণির সঙ্গে সঙ্গেই যাইতে পারে। এই মুক্তিই হইল লক্ষ্য—যেখানে পৌঁছিবার জন্য আমরা সকলেই অগ্রসর হইতেছি।

মনে করুন, এই কক্ষে একটি 'বল' আছে এবং আমাদের প্রত্যেকের হাতেই একটি করিয়া লাঠি আছে। আমার সেই লাঠি দিয়া বলটিকে শতবার আঘাত করিতেছি, এক স্থান হইতে অপর স্থানে ঠেলিয়া দিতেছি, যতক্ষণ না বলটি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া যায়। কিরূপ বেগে এবং কোন্ দিকে বলটি যাইবে? কক্ষের ভিতর যে-সকল শক্তি এ যাবৎ বলটির উপর কার্য করিতেছিল, সেগুলির দ্বারাই ইহা নিরূপিত হইবে। বলটির উপর যে-সকল বিভিন্ন আঘাত করা হইয়াছিল, সগুলি স্ব স্ব ফল প্রসব করিবে। আমাদের প্রত্যেক মানসিক ও দৈহিক কর্মই এরূপ এক একটি আঘাত। মানব-মনও একটি 'বল'—মনকেও আঘাত করা হইতেছে। পৃথিবীর এই কক্ষে আমরা সর্বদাই এইভাবে আঘাত প্রাপ্ত হইতেছি, এবং এখান হইতে আমাদের নিষ্ক্রমণ এই-সকল আঘাতের শক্তির উপর নির্ভর করিতেছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 'বলটির' গতিবেগও গতির দিক আঘাতগুলির দ্বারাই নিরূপিত হয়; তেমনি আমাদের এই জন্মের কর্মসমূহ আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন স্থির করিবে।আমাদের বর্তমান জন্ম আমাদের অতীত কর্মের ফল। একটি দৃষ্টান্ত : মনে কর, আমি তোমাকে একটি অনন্ত সীমাহীন শৃঙ্খল দিলাম—তাহার কড়া-গুলি পর পর একটি

শ্বেত, একটি কৃষ্ণ; ইহার আরম্ভ নাই, শেষও নাই। মনে কর, আমি তোমাকে সেই শৃঙ্খলটির স্বরূপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। শৃঙ্খলটি উভয় দিক হইতে অনন্ত অসীম বলিয়া প্রথমে ইহার আরম্ভ এবং শেষ স্থির করা তোমার পক্ষে কষ্টকর হইবে। কিন্তু ধীরে ধীরে জানিতে পারিবে—ইহা একটি শৃঙ্খল। শীঘ্রই তুমি আবিষ্কার করিবে, এই অনন্ত শৃঙ্খলটি শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের দুইপ্রকার অংশের পুনরাবরত্তি মাত্র, এবং এই দুইটি অংশকেই অনন্ত বার গুণ করিলে সমগ্র শৃঙ্খলটি পাওয়া যায়। যদি তুমি এই-সকল অংশের স্বরূপ জানো, তাহা হইলে তুমি সমগ্র শৃঙ্খলটিরও স্বরূপ জানিবে, যেহেতু ইহা সেই অংশসমূহের শুধু পুনরাবৃত্তি মাত্র। একই ভাবে আমাদের সমগ্র জীবন—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—যেন একটি অনন্ত শৃঙ্খল, ইহার আদিও নাই অন্তও নাই; ইহার প্রত্যেকটি অংশ এক একটি জীবন, এবং এই জীবনের দুইটি দিক—জন্ম ও মৃত্যু। আমরা যাহা হই এবং যাহা করি, সে-সবই বারংবার সামান্য পরিবর্তিত আকারে পুনরাবর্তিত হইতেছে। সুতরাং আমরা যদি এই দুইটি অংশকে জানি, তাহা হইলে জগতে যে-সকল পথ আমাদের অতিক্রম করিতে হইবে, সে-সবই আমরা জানিতে পারিব। এরূপে দেখিতেছি যে, বর্তমান জীবনে আমরা যে যে-পথে যাইতেছি, তাহা অতীত জীবনে আমরা যে যে-পথে গিয়াছি, তাহা দ্বারাই স্থিরীকৃত হইতেছে। আমাদের নিজেদের কর্মানুসারেই আমরা এই পৃথিবীতে আসিয়াছি। আমরা যেমন নিজেদের বর্তমান কর্মফলগুলি লইয়া পৃথিবী হইতে চলিয়া যাই, তেমনি নিজেদের প্রাক্তন কর্মফলগুলি লইয়া এই পৃথিবীতে আসি; যাহা আমাদিগকে পৃথিবী হইতে লইয়া যায়, তাহাই আমাদিগকে পৃথিবীতে লইয়া আসে। কোন্ শক্তি আমাদের পৃথিবীতে লইয়া আসে?—আমাদের প্রাক্তন কর্ম। কে লইয়া যায়?—আমাদের নিজেদের ইহলোকের কর্মসকল। যেমন ‘গুটিপোকা’ নিজের মুখ হইতে তন্তু বাহির করিয়া ‘রেশম-গুটি’ নির্মাণ করে এবং পরিশেষে সেই ‘রেশম-গুটির’ ভিতর নিজেই আবদ্ধ হইয়া যায়, সেরূপ আমরাও নিজেদের কর্ম দ্বারা নিজদিগকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি, আমরাও আমাদের চারিদিকে নিজেদের কর্মজাল বুনিয়াছি। আমরাই কার্য-কারণ-নিয়মকে চালু করিয়াছি, এবং এখন তাহা হইতে পরিত্রান পাওয়া কঠিন বলিয়া বোধ করিতেছি। আমরাই সংসার-চক্রকে গতিশীল করিয়াছি, এবং এখন সেই চক্রতলে

পিষ্ট হইতেছি। সুতরাং এই দার্শনিক মতবাদ আমাদের ইহাই শিক্ষা দেয় যে, আমরা সকলে একই প্রকারে আমাদের নিজেদের কর্ম—পাপ-পুণ্য দ্বারা আবদ্ধ হইতেছি।

আত্মা কখন চলিয়াও যায় না, আসেও না, জন্মগ্রহণও করে না, মৃত্যু-মুখেও পতিত হয় না। ইহা আত্মার সম্মুখস্থ প্রকৃতিরই গতি; এই গতির প্রতিবিম্ব আত্মায় পড়ে; তাহাতে আত্মা অজ্ঞানবশতঃ মনে করে, সে-ই গমনাগমন করিতেছে, প্রকৃতি নহে। যখন আত্মা এইরূপ মনে করে, তখন সে বদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু যখন সে জানিতে পারে—তাহার গতি নাই, সে সর্বব্যাপী, তখন সে মুক্তিলাভ করে। বদ্ধ আত্মাকে 'জীব' বলা হয়। এরূপে তোমরা দেখিতেছ, যখন বলা হয়—আত্মা আসিতেছে ও যাইতেছে, তখন তাহা কেবল বুঝিবার সুবিধার জন্যই বলা হয়, যেমন জ্যোতির্বিদ্যা-পাঠের সুবিধার জন্য তোমাদের মনে করিতে বলা হয়, সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে, যদিও তাহা সত্য নহে। এইভাবে জীব উচ্চতর অথবা নিম্নতর অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহাই হইল সেই সুপরিচিত জন্মান্তর বাদ, এবং সমগ্র সৃষ্টি এই নিয়মের অধীন।

মানুষ যে পশু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা এই দেশের জনসাধারণের নিকট অতি বীভৎস বলিয়া বোধ হয়। কেন? এই-সকল লক্ষ লক্ষ পশুর শেষ গতি কি? তাহারা কি কিছুই নহে? আমাদের যদি আত্মা থাকে, তাহা হইলে তাহাদেরও তো আত্মা আছে; তাহাদের যদি আত্মা না থাকে, আমাদেরও আত্মা নাই। কেবল মানুষেরই আত্মা আছে, পশুর নাই—ইহা বলা অতি অযৌক্তিক। পশুর অধম মানুষও আমি দেখিয়াছি।

মানুষের আত্মা সংস্কার অনুসারে নিম্ন হইতে উচ্চতর শরীরে পরিভ্রমণ করিয়াছে। কিন্তু কেবল উচ্চতম মনুষ্যশরীরেই তাহার মুক্তিলাভ হয়। এই মনুষ্য-আকার, এমন কি দেবদূতের আকার অপেক্ষাও উচ্চতর, সকল প্রকার জীব হইতে উচ্চ মানুষই মৃথিবীর মহত্তম জীব, কারণ মানুষই মোক্ষলাভ করে। এই সমগ্র জগৎ ব্রহ্মেই অবস্থিত ছিল, এবং যেন তাঁহা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। এরূপে যে-উৎস হইতে জগৎ বাহির হইয়া আসিয়াছে, সেইখানে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্যই চেষ্টা করিতেছে যেরূপ ডায়নামো (dynamo) হিতে উৎপন্ন হইয়া বিদ্যুৎ একটি বৃত্ত (circuit)সম্পূর্ণ করিয়া ডায়নামোতেই

প্রত্যবর্তন করে। আত্মার ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিতেছে। ব্রহ্ম হইতে বাহির হইয়া আত্মা বিবিধ উদ্ভিদ্ ও পশুর মধ্য দিয়া অবশেষে মনুষ্যশরীরে উপস্থিত হয়; এবং মানবই ব্রহ্মের নিকটতম। যে ব্রহ্ম হইতে আমরা হইয়া আসিয়াছি, তাঁহাতে ফিরিয়া যাওয়াই মহান জীবন-সংগ্রাম। মানুষ ইহা জানুক বা নাই জানুক, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। পৃথিবীতে আমরা যাহা কিছু গতিময় দেখি, খনিজ পদার্থে, বৃক্ষ-লতায় অথবা পজশুপক্ষীতে যাহা কিছু সংগ্রাম দেখি, সবই সেই এক কেন্দ্রস্থলে প্রত্যাবর্তন করিয়া বিশ্রামলাভের প্রচেষ্টা মাত্র। পূর্বে সাম্যাবস্থা ছিল, পরে তাহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে; এবং সকল অংশ—অণু-পরমাণু সেই বিনষ্ট সাম্যাবস্থা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিতেছে। এই সংগ্রামে তাহারা সকল অত্যাশ্চর্য বস্তুর উদ্ভব হইতেছে। প্রাণিজগতে, উদ্ভিদ্‌জগতে এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই সকল সংগ্রাম ও প্রতিযোগিতা, সকল সামাজিক সংঘর্ষ ও যুদ্ধ, সেই সাম্যাবস্থা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য শাশ্বত সংগ্রাম ভিন্ন অপর কিছুই নহে।

জন্ম হইতে মৃত্যুর দিকে এই গতি—এরূপ বিচরণকেই সংস্কৃতে বলা হয় 'সংসার'; আক্ষরিক অর্থে বলা হয়—জন্ম-মরণ-চক্র। সকল সৃষ্ট বস্তুই এই চক্র পরিক্রমণ করিয়া শীঘ্র বা বিলম্বে মোক্ষলাভ করিবে। প্রশ্ন হইতে পারে, যদি আমরা সকলেই ভবিষ্যতে মুক্তিলাভে অধিকারী হই, তাহা হইলে তাহার জন্য আবার সংগ্রামের প্রয়োজন কি? যদি প্রত্যেকেই মুক্ত হইবে, তাহা হইলে আমরা বসিয়া থাকিব এবং অপেক্ষা করিব। ইহা সত্য যে, শীঘ্র হউক বা বিলম্বেই হউক, প্রত্যেক জীবই মুক্তিলাভ করিবে। কেহই পিছনে পড়িয়া থাকিবে না; কাহারও ধ্বংস হইবে না; প্রত্যেক বস্তু নিশ্চয়ই উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থায় উন্নীত হইবে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমাদের সংগ্রামের প্রয়োজন কি? প্রথমতঃ সংগ্রামই হইল একমাত্র উপায়, যাহা আমাদিগকে কেন্দ্রস্থলে আনিতে পারে; দ্বিতীয়তঃ আমরা জানি না, কেন সংগ্রাম করিতেছি। সংগ্রাম আমাদের করিতেই হইবে। 'সহস্র লোকের মধ্যে, কয়েকজনই মাত্র জানেন যে, তাঁহারা মুক্তিলাভ করিবেন।' অধিকাংশ মানুষ জড় দ্রব্য লইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন; কিন্তু কয়েকজন আছেন, যাঁহারা জাগ্রত হন—ব্রহ্মে প্রত্যাবর্তন করিতে চান, যাঁহারা মনে করেন—পৃথিবীর লীলাখেলা যথেষ্ট হইয়াছে। ইঁহারাই সজ্ঞানে সংগ্রাম করেন; অন্যান্য সকলে সংগ্রাম করে অজ্ঞানে।

বেদান্তদর্শনের আরম্ভ ও শেষ হইল—অসত্যকে ত্যাগ এবং সত্যকে গ্রহণ করিয়া 'সংসার ত্যাগ করা'। যাঁহারা পার্থিব মোহে মুগ্ধ হইয়া আছেন, তাঁহারা হয়তো বলিতে পারেন : কেন আমরা পৃথিবী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব, এবং কেন্দ্রস্থলে প্রত্যাবর্তন করিতে চেষ্টা করিব? মনে করুন, আমরা সকলেই ঈশ্বর হইতে আসিয়াছি; কিন্তু দেখিতেছি, এই জগৎ সুন্দর ও সুখদায়ক; অতএব কেন আমরা জগৎকেই আরও বেশী সম্ভোগ করিতে চেষ্টা করিব না? কেন আমরা সংসারের বাহিরে যাইতে চেষ্টা করিব? তাঁহারা বলেন—পৃথিবীতে প্রত্যহই যে উন্নতি সাধিত হইতেছে, সেইদিকে দৃষ্টিপাত কর; জগতে কতই না বিলাসদ্রব্য সৃষ্ট হইতেছে! জগৎ অতিশয় সুখজনক। কেন আমরা তাহা ছাড়িয়া যাইব, এবং যাহা উপভোগ্য নয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিব? ইহার উত্তর এই যে, পৃথিবীর ধ্বংস সুনিশ্চিত; পৃথিবী নিশ্চয়ই খণ্ডবিখণ্ড হইয়া যাইবে। পূর্বে বহুবার আমরা একই প্রকার সুখ উপভোগ করিয়াছি। আমরা বর্তমানে যে-সকল আকার দেখিতেছি, সে-সকলই পূর্বে বহুবার প্রকটিত হইয়াছে; এবং বর্তমানে আমরা যে-পৃথিবীতে বাস করিতেছি, সে-পৃথিবীও পূর্বে বহুবার এইভাবে সৃষ্ট হইয়াছে। আমিও পূর্বে বহুবার এখানে আসিয়াছি, তোমাদের সহিত বহুবার কথা বলিয়াছি। তোমরাও জানিতে পারিবে—ইহা সত্য; এবং যে-সকল কথা তোমরা বর্তমানে শুনিতেছ, সেগুলি তোমারা পূর্বেও বহুবার শুনিয়াছ, এবং ভবিষ্যতেও বহুবার এরূপ ঘটিবে। আত্মা সর্বদাই এক ও অভিন্ন; দেহই কেবল অবিরত বিনষ্ট ও পুনরাবির্ভূত হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ এই-সকল ঘটনা পর্যায়ক্রমে ঘটে। মনে কর, তিন-চারটি পাশা আছে; তুমি সেইগুলি ফেলিলে—একটিতে পাঁচ, একটিতে চার, একটিতে তিন, একটিতে দুই দেখা গেল। তুমি যদি এইভাবে ক্রমাগত পাশা ফেলিয়া যাও, তাহা হইলে নিশ্চয় আবার এরূপ হইবে এই সংখ্যাগুলি পুনঃ পুনঃ দেখা যাইবে। ক্রমাগত পাশা ফেলিয়া যাও, এবং বিলম্ব যতই হউক না কেন, এই সংখ্যাগুলি নিশ্চয়ই আবার দেখা যাইবে। অবশ্য কতবার পরে তাহাদের পুনরাবৃত্তি হইবে, তাহা সঠিক বলা যায় না—ইহা দৈবাধীন। জীবাত্মাদের একত্র হওয়ার ব্যাপারেও এই একই নিয়ম প্রযোজ্য। যতই বিলম্ব হউক না কেন, একই সংযোগ এবং বিয়োগ বারংবার ঘটিবে। সেই একই জন্ম, সেই পানাহার, তারপর মৃত্যু বারংবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসে। কেহ কেহ সাংসারিক ভোগসুখ

অপেক্ষা উচ্চতম আর কিছুই কোনদিন পায় না; কিন্তু যাঁহারা উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিতে চান, তাঁহারা দেখেন—এই-সকল ভোগসুখ চরম লক্ষ্য নয়, আনুষঙ্গিক মাত্র।

ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষ পর্যন্ত প্রত্যেক জীবশরীরই চিকগোর 'ফেরিস্ হুইল্'-এর এক একটি গাড়ির মতো—চক্রটি সর্বদাই চলিতেছে, কিন্তু প্রতি গাড়ির আরোহী পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে। মানুষ একইভাবে একটি গাড়িতে উঠিতেছে, চক্রের ঘূর্ণনের সহিত ঘুরিতেছে, তার পর নামিয়া যাইতেছে। চক্রটি ক্রমাগত ঘুরিয়া চলিয়াছে। এক একটি জীবাত্মা ঐভাবে এই একটি জীবাত্মা ঐভাবে এক একটি শরীর ধারণ করিতেছে, তাহার মধ্যে কিছুকাল বাস করিতেছে, তারপর উহা ত্যাগ করিয়া অন্য একটি শরীর ধারণ করিতেছে, তাহাও ত্যাগ করিয়া তৃতীয় একটি ধারণ করিতেছে। এইভাবে জন্মমৃত্যুর চক্র ঘুরিয়া চলিতেছে, যতদিন না জীব সেই চক্র হইতে বাহির হইয়া মুক্তিলাভ করে।

প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক যুগে মানুষের জীবনের অতীত এবং ভবিষ্যৎ জানিবার অতি আশ্চর্য শক্তির কথা সকলে শুনিয়াছ। ইহার ব্যাখ্যা : যতদিন পর্যন্ত আত্মা কার্য-কারণ-নিয়মের অধীন থাকে—অবশ্য তাহার স্বভাবগত স্বাধীনতা কখনও সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যায় না—তাহার অস্তিত্ব তখনও থাকে; এমন কি সে জন্য আত্মা নিজ শক্তি প্রয়োগ করিয়া কার্য-কারণ-শৃঙ্খল অতিক্রম করিতে পারে, যেরূপ মুক্তাত্মার ক্ষেত্রে ঘটিয়া থাকে; ততদিন তাহার কর্ম কার্য-কারণ-নিয়মের দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হয় এবং এরূপে কর্মফল-পরম্পরা সম্বন্ধে যাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি আছে, তাঁহাদের পক্ষে অতীত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোকপাত করা সম্ভব।

যতদিন কোন বাসনা কামনা অথবা অভাবের অস্তিত্ব থাকে, ততদিন অপূর্ণতাও থাকে। পূর্ণ মুক্তাত্মার কোন বাসনা-কামনা থাকিতে পারে না। ঈশ্বরের কোন অভাব থাকিতে পারে না। তাঁহার যদি কোন বাসনা-কামনা থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে 'ঈশ্বর' বলা চলে না, কারণ সেক্ষেত্রে তিনি অপূর্ণ হইয়া পড়েন। এই কারণে—'ঈশ্বর ইহা কামনা করেন, উহা কামনা করেন; তিনি কখন রুষ্ট, কখন তুষ্ট'—এরূপ বলা শিশুর মুখের আধ-আধ

বুলি, অর্থহীন কথা। সেইজন্য সকল আচার্য ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন : কোন কিছু কামনা করিও না; সকল বাসনা ত্যাগ কর, পূর্ণভাবে তৃপ্ত হও।

দন্তহীন শিশু 'হামাগুড়ি' দিতে দিতে পৃথিবীতে আসে; এবং বৃদ্ধও 'হামাগুড়ি' দিতে দিতে দন্তবিহীন অবস্থায় পৃথিবী হইতে চলিয়া যায়। এরূপে জীবনের আরম্ভ ও শেষ—চরম দুটি প্রান্ত একই প্রকার; কেবল একজনের এই জীবন সম্বন্ধে কোনরূপ অভিজ্ঞতা নাই, অপরের জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে। যখন আলোক-তরঙ্গের স্পন্দন অতি মৃদু হয়, তখন আমরা আলোক দেখিতে পাই না; যখন তাহা অতি দ্রুত হয়, তখনও তাহার ফল হয় অন্ধকার। এইভাবে চরম সীমা-দুটি একই প্রকার হয়, যদিও তাহাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। দেয়ালের বাসনা-কামনা নাই, পূর্ণ মুক্ত মানবেরও নাই। কিন্তু দেয়ালটির কোন চেতনা নাই যে, উহা কামনা করিবে; আর পূর্ণ মুক্ত মানবের কামনা করিবার কিছুই থাকে না। জড়বুদ্ধি লোকদের এই জগতে কোন কামনা থাকে না, যেহেতু তাহাদের মস্তিষ্ক অপূর্ণ। একই সঙ্গে, উচ্চতম অবস্থাতেও আমাদের কোন কামনা থাকে না। কিন্তু এই দুই অবস্থার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। একজন পশুর নিকটবর্তী, অন্যজন ঈশ্বরের।

৩. পুনর্জন্ম

পুনর্জন্ম

[নিউ ইয়র্ক হইতে প্রকাশিত দার্শনিক পত্রিকা ‘Metaphysical magazine’ এর জন্য লিখিত, মার্চ, ১৮৯৫]

অতীতে তোমার ও আমার বহু জন্ম হইঠয়া গিয়াছে, হে শত্রুনাশকারী (অর্জুন), আমি সে-সবই অবগত আছি, কিন্তু তুমি অবগত নও।’—গীতা১

সকল দেশে ও সকল কালে যে-সকল কূট সমস্যা মনুষের বুদ্ধিকে বিমূঢ় করিয়াছে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা জটিল মানুষ নিজে। যে অগণিত রহস্য ইতিহাসের আদি যুগ হইতে মানুষের শক্তিকে সমাধানের জন্য আহ্বান জানাইয়া ঐ কার্যে ব্রতী করিয়াছে, তন্মধ্যে গভীরতম রহস্য হইল মানুষের নিজ স্বরূপ। ইহা সমাধানের অসাধ্য একটি প্রহেলিকামাত্র নয়, ইহা সকল সমস্যার অন্তর্নিহিত মূল সমস্যাও বটে। মানুষের এই স্বরূপটিই আমাদের সর্বপ্রকার জ্ঞান, সর্বপ্রকার অনুভূতি ও সর্বপ্রকার কার্যকলাপের মূল উৎস ও শেষ আধার। এমন কোন সময় ছিল না, এমন কোন সময় আসিবেও না—যখন মানুষের নিজের স্বরূপ তাহার সর্বাধিক মনোযোগ আকর্ষণ করিবে না।

মানুষের সকল প্রকার ক্ষুধার মধ্যে সত্যানুসন্ধিৎসারূপ যে-ক্ষুধা মানুষের নিজ সত্তার সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত আছে, বহির্বিশ্বের মূল্যায়নকল্পে অন্তঃরাজ্য হইতে কোন মানদণ্ড আবিষ্কারের জন্য যে সর্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান, এবং এই পরিবর্তনশীল বিশ্বে একটি অপরিবর্তনীয় স্থির বিন্দু আবিষ্কার করিবার জন্য যে অনিবার্য ও স্বভাবসিদ্ধ প্রয়োজন অনুভূত হয়, সেগুলির দ্বারা পরিচালিত হইয়া মানুষ যদিও মধ্যে মধ্যে স্বর্ণকণিকা-ভ্রমে ধূলি-মুষ্টিকে ধরিতে সচেষ্ট হইয়াছে, এমন কি যুক্তি ও বুদ্ধি অপেক্ষাও উচ্চতর রাজ্যের কোন বাণীর প্রেরণা পাইয়াও সে অনেক সময়ই অন্তর্নিহিত দেবত্বের মর্ম অনুধাবন করিতে সক্ষম হয় নাই, তথাপি যতদিন হইতে এই অনুসন্ধান আরম্ভ

হইয়াছে, তাহার মধ্যে এমন কোন সময় দেখিতে পাওয়া যায় না, যখন কোন না কোন জাতি বা কতিপয় ব্যক্তি সত্যের বর্তিকা ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরেন নাই।

---

১ বহূনি মে ব্যাতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।।
--শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪/ ৫

অতীতে অথবা আধুনিক কালে–বিশেষতঃ প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এমন লোকের কখনও অভাব ঘটে নাই, যাঁহারা পারিপার্শ্বিক ও অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি বিষয়ে একদেশদর্শী, বিবেচনাহীন এবং কুসংস্কারপূর্ণ অভিমত স্বীকার করিবার ফলে, কখন বা বিবিধ দর্শনমত ও সম্প্রদায়ের বক্তব্যের অস্পষ্টতার দরুন বিরক্তির ফলে, এবং দুঃখের সহিত বলিতে হয়, অনেক সময় সঙ্ঘবদ্ধ পৌরোহিত্যের ভয়াবহ কুসংস্কারাদির প্রভাবে চরম বিপরীত মতে উপস্থিত হইয়াছেন; এবং এই-সকল কারণ হতাশ হইয়া শুধু যে এ-সম্পর্কে অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহাই নহে, তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন এই কার্য নিষ্ফল এবং অনাবশ্যক। দার্শনিকেরা ক্ষোভ বা বিদ্রূপ প্রকাশ করিতে পারেন এবং পুরোহিতগণ তরবারির সাহায্য পর্যন্ত স্বীকার করিয়া স্বীয় ব্যবসায় পরিচালনা করিতে পারেন, কিন্তু সত্য একমাত্র তাঁহাদেরই নিকটা আবির্ভূত হয়, যাহারা সত্যের জন্যই লাভালাভের চিন্তা ছাড়িয়া নির্ভীক হৃদয়ের সত্যেরই পীঠস্থানে উপাসনা করিয়া থাকেন।

মানুষের বুদ্ধি যখন জ্ঞানপূর্বক কোন বিষয়ে প্রযুক্ত হয় তখনই তাঁহাদের নিকট আলোক উদ্ভাসিত হয়; এবং ধীরে ধীরে হইলেও ক্রমশঃ তাহা অজ্ঞাতভাবে অনুস্রুত হইয়া সমগ্র জাতির মধ্যে প্রসারিত হয়। দার্শনিকগণ দেখাইয়া দেন, কিরূপে মহাপুরুষেরা জ্ঞানের সঙ্গে সাধনা করিয়া থাকেন; এবং ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, কিরূপে নীরবে ধীরে ধীরে সাধারণ জনসমাজে তাঁহাদের সাধনালব্ধ সত্য অনুপ্রবেশ করে।

মানুষ তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে যতগুলি মত আজ পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছে, তন্মধ্যে এই মতটিই সর্বাধিক প্রসার লাভ করিয়াছে যে, আত্মা নামক একটি সত্যবস্তু আছে এবং উহা দেহ হইতে ভিন্ন ও অমর। যাঁহারা এইরূপ আত্মার অস্তিত্বে আস্থাবান্, তাঁহাদের মধ্যে আবার চিন্তাশীল অধিকাংশ ব্যক্তিই বিশ্বাস করেন যে, আত্মা বর্তমান জন্মের পূর্ব হইতেই আছে।

আধুনিক মানবসমাজে যাঁহাদের ধর্ম সুসংবদ্ধ ও সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদের অধিকাংশই ইহা বিশ্বাস করেন, এবং যে-সব দেশ ভগবানের আশীর্বাদে সর্বাধিক উন্নত, সে-সব দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষীরা যদিও আত্মার অনাদিত্বে বিশ্বাস করার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই প্রতিপালিত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহারা আত্মার পূর্বাস্তিত্বের সমর্থন করিয়াছেন। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের ইহা ভিত্তিস্বরূপ। প্রাচীন মিশরীয়গণের মধ্যে শিক্ষিতশ্রেণী ইহাতে বিশ্বাস করিতেন, প্রাচীন পারসীকগণ এই সত্যে উপনীত হইয়াছিলেন; গ্রীক দার্শনিকগণ এই ধারণাকে তাহাদের দর্শন-চিন্তার ভিত্তি-প্রস্তররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন; হিব্রুগণের মধ্যে ফ্যারিসিগণ (আচারনিষ্ঠ প্রাচীন ইহুদী ধর্মসম্প্রদায়) ইহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সুসলমান ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে সুফীরা প্রায় সকলেই এই সত্য স্বীকার করেন।

বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন বিশ্বাসের উদ্ভব ও পরিপুষ্টির নিমিত্ত মনে হয়, বিশেষ ধরনের পরিবেশের প্রয়োজন আছে। মৃত্যুর পরে শরীরের এতটুকু মাত্র অংশও জীবিত থাকে– এই ধারণায় উপস্থিত হইতেই প্রাচীন জাতিসমূহের কত যুগ কাটিয়া গিয়াছে। আবার দেহ হইতে বিমুক্ত হইয়া মৃত্যুর পরও জীবিত থাকে, এইরূপ কোন বস্তু সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ ধারণায় উপনীত হইতে আরও কত যুগ-যুগান্তের প্রয়োজন হইয়াছে। এমন একটি সত্তা আছে, যাহার দেহের সহিত সম্পর্ক সাময়িক, এইরূপ ধারণায় উপনীত হওয়া যখন সম্ভব হইল, কেবল তখনই এবং যে-সকল জাতির মধ্যে এইরূপ সিদ্ধান্তের উদয় হইতে পারিল, একমাত্র তাহাদের মধ্যে এই অনিবার্য প্রশ্নটি উত্থিত হইয়াছিল : কোথায়? কখন?

প্রাচীন হিব্রুগণ আত্মা সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা জাগাইয়া মনের স্থৈর্য নষ্ট করেন নাই। তাঁহাদের মতে মৃত্যুতেই সবকিছুর অবসান হয়। কার্ল হেকেল যথার্থই

বলিয়াছেন : 'ইহা যদিও সত্য যে, (ইহুদীদের) নির্বাসনের পূর্ববর্তী বাইবেলের প্রাচীন অংশে হিব্রুগণ প্রাণ-তত্ত্বটির পৃথক্ পরিচয় পাইয়াছিলেন এবং তাহাকে তাঁহারা কখনও 'নেফেস' অথবা 'রুয়াখ' অথবা 'নেশামা' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তথাপি এই-সকল শব্দ চৈতন্য বা আত্মার ধারণার দ্যোতক না হইয়া বরং প্রাণবায়ুরই দ্যোতক। আবার প্যালেষ্টাইনের অধিবাসী ইহুদীগণের নির্বাসনের পরবর্তী কালের রচনায় কোথাও কোন পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট অমর আত্মার উল্লেখ পাওয়া যায় না; কিন্তু সর্বত্র ঈশ্বর হইতে নিঃসৃত শুধু এমন একটি প্রাণবায়ুর উল্লেখ পাওয়া যায়, যাহা শরীর ধ্বংস হইলে দিব্য-সত্তা 'রুয়াখে' অন্তর্হিত হয়।'

প্রাচীন মিশর ও ক্যাল্ডিয়ার অধিবাসিগণের আত্মা সম্বন্ধে নিজস্ব বহু অদ্ভুত ধারণা ছিল। কিন্তু মৃত্যুর পরেও মানবের কোন একটি অংশ জীবিত থাকে বলিয়া তাহারা যে ধারণা পোষণ করিত, তাহার সহিত প্রাচীন হিন্দু, পারসীক, গ্রীক বা অন্য কোন আর্যজাতির এ-সম্বন্ধীয় ধারণাগুলিকে যেন মিশাইয়া ফেলা না হয়। অতি প্রাচীনকাল হইতেই আত্মার ধারণা সম্পর্কে আর্য ও অ-সংস্কৃত ভাষাভাষী ম্লেচ্ছদিগের সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বাহ্যতঃ মৃতদেহের শেষকৃত্য-অনুষ্ঠানের রীতি যেন ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ম্লেচ্ছগণ শবকে সযত্নে প্রোথিত করিয়া অথবা তদপেক্ষা জটিলতর বিরাট প্রক্রিয়া অবলম্বনে শবকে মমি-তে পরিণত করিয়া মৃতদেহ সংরক্ষনের জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পাইত, আর আর্যগণ সাধারণতঃ মৃতদেহকে অগ্নিকে ভস্মীভূত করিতেন।

ইহারই মধ্যে আমরা এই একটি প্রকাণ্ড গোপন রহস্যের সন্ধান পাই যে, আর্যজাতির– বিশেষতঃ হিন্দুদের সহায়তা ব্যতীত মিশরীয় হউক, এসীরীয় হউক বা ব্যাবিলনবাসীই হউক, কোন ম্লেচ্ছজাতিই এই ধারণায় উপনীত হইতে পারে নাই যে, আত্মা-নামক এমন এক পৃথক্ বস্তু আছে, যাহা শরীর-নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করিতে পারে।

যদিও হেরোডোটাস বলেন, মিশরীয়গণই সর্বাগ্রে আত্মার অমরত্বের ধারণা করিতে পারিয়াছিল, এবং তিনি মিশরীয়গণের মতবাদ-প্রসঙ্গে এইরূপ বলেন, 'আত্মা দেহ-নাশের পরেও বারংবার এক একটি জীবদেহে প্রবেশ করে এবং তাহার ফলে ঐ জীব

বাঁচিয়া উঠে; অতঃপর জলচর স্থলচর ও খেচর—যত প্রাণী আছে, তাহাদের সকলের মধ্যে সে যাতায়াত করে, এবং তিনসহস্র বৎসরকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে পুনর্বার মানবদেহে ফিরিয়া আসে', তথাপি মিশরতত্ত্ব সম্পর্কে বর্তমান কালে যে গবেষণা হইয়াছে, তাহার ফলে অদ্যাবধি আত্মার দেহান্তর-গ্রহণ-বিষয়ে মিশরীয় জনসাধরণের ধর্মের মধ্যে কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় নাই। বরং ম্যাসপেরো১, আর্মান২ এবং অপরাপর খ্যাতনামা মিশরতত্ত্ববিদের আধুনিকতম এই অনুমানই অনুমোদিত হয় যে, পুনর্জন্মবাদের সহিত মিশরীয়গণ সুপরিচিত ছিল না।

———-

১ Maspero
2 A. Erman

প্রাচীন মিশরীয়গণের মতে আত্মা একটি অন্যসাপেক্ষ বিকল্প সত্তা মাত্র, ইহার নিজস্ব কোন পৃথক্ অস্তিত্ব নাই এবং কোনদিনই দেহের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। যতদিন দেহ থাকে, কেবল ততদিনই ইহা জীবিত থাকে, যদি কোন আকস্মিক কারণবশতঃ মৃত দেহটি বিনষ্ট হয়, তবে বিদেহ আত্মাকে দ্বিতীয়বার মৃত্যু ও ধ্বংস বরণ করিতে হয়। মৃত্যুর পর আত্মা সমগ্র পৃথিবীময় যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতে পারে বটে, কিন্তু প্রতি রাত্রে মৃতদেহটি যেখানে আছে সেখানে তাহাকে ফিরিতে হয়; সে সর্বদা দুঃখমগ্ন, সর্বদা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর এবং আর একবার জীবনকে উপভোগ করিবার জন্য তীব্র বাসনাযুক্ত, অথচ কোনমতেই তাহা পূরণ করিতে পারে না। উহার পুরাতন শরীরের কোন অংশ কোনরকমে আহত হইলে আত্মার অনুরূপ অংশও অনিবার্যভাবে আহত হয়। এই ধারণার দিক হইতেই প্রাচীন মিশরীয়গণের মৃতদেহ সংরক্ষণ করিবার জন্য অতিরিক্ত ব্যাকুলতার কারণ বুঝিতে পারা যায়। প্রথমে মরুভূমিকে শবক্ষেত্র হিসাবে নির্বাচন করা হইয়াছিল, কারণ তথায় বায়ুর শুষ্কতা হেতু মৃতদেহ সহজে বিনষ্ট হইত না, এবং এইরূপে বিদেহ প্রেতাত্মা দীর্ঘজীবন লাভের সুযোগ পাইত।

কালক্রমে জনৈক দেবতা শবদেহ সংরক্ষণের এমন এক উপায় আবিষ্কার করিলেন, যাহার সাহায্যে পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিরা তাহাদের স্বজনগণের মৃতদেহ প্রায় অনন্তকালের জন্য সংরক্ষণ করিবার আশা পোষণ করিত; এবং নিদারুন দুঃখের হইলেও আত্মার জন্য এইরূপ অমরত্বের ব্যবস্থা তাহারা করিত।

পৃথিবীর সহিত আর কোন নিবিড় সম্বন্ধ-স্থাপন অসম্ভব হইলেও এক শাশ্বত খেদ সেই মৃত আত্মা কে সর্বদাই পীড়া দিত; বিদেহী আত্মা সখেদে বলিত : "হে ভ্রাতঃ, তুমি কখনও পানাহার হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিও না, মাদকতা, ভালবাসা, সর্বপ্রকার সম্ভোগ এবং দিবারাত্র বাসনার অনুসরণ হইতে বিরত হইও না। দুঃখকে হৃদয়ে স্থান দিও না, কারণ পৃথিবীতে মানুষের জীবনকাল কতটুকু? পশ্চিমে যে (প্রেত-)লোক আছে, উহা সুপ্তিময় ও ঘন ছায়ায় আবৃত; ইহা এমন একটি স্থান যেখানে একবার অধিষ্ঠিত হইলে সেখানকার অধিবাসীরা তাহাদের 'মমি'রূপে চিরনিদ্রায় মগ্ন হয়, পুনর্বার আর কোনদিনই স্বজনবর্গকে দেখিবার জন্য জাগ্রত হয় না, আর তাহারা তাহাদের পিতা- মাতাকে চিনিতে পারে না, এবং তাহাদের হৃদয়ে স্ত্রী ও সন্তানবর্গের কোন স্মৃতি থাকে না। পৃথিবী তাহার অধিবাসীদিগকে যে প্রাণবন্ত জলধারা দান করে, তাহা আমার নিকট পঙ্কিল ও প্রাণহীন; পৃথিবীতে যাহারা বাস করে, তাহারা সকলেই জলধারার অধিকারী; অথচ আমার নিকট ঐ জলধারাই এখন এক পূতিগন্ধময় গলিত ধারায় পরিণত হইয়াছে। মৃত্যুর এই উপত্যকায় আসিয়া অবধি আমি বুঝিতেই পারিতেছি না, আমি কে এবং কোথায় আছি। আমাকে স্রোতস্বিনীর জল পান করিতে দাও...উত্তরাভিমুখে মুখ করিয়া আমাকে জলাশয়ের ধারে রাখো, যাহাতে মৃদুবায়ু আমাকে স্নেহস্পর্শ দান করিতে পারে এবং আমার হৃদয় দুঃখের কবল হইতে মুক্তি পাইয়া সজীব হইতে পারে।"১

ক্যাল্ডিয়াবাসীরা মৃত্যুর পরে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে মিশরীয়দের মতো অত গবেষণা না করিলেও তাহাদের মতে আত্মাকে দেহের উপর নির্ভরশীল দ্বিতীয় বস্তু হিসাবেই গ্রহণ করা হয়, এবং ঐ আত্মা কবরস্থানেরই সহিত জড়িত। তাহারাও এই দেহ-নিরপেক্ষ কোন অবস্থার কথা চিন্তা করিতে পারে নাই এবং আশা পোষণ করিত যে, মৃতদেহ পুনরুজ্জীবিত

হইবে। যদিও দেবী ইষ্টার নানা বিপদ আপদ ও রোমঞ্চকর অভিযানের অন্তে ইয়া ও দমকিনার পুত্র–তাঁহার মেষপালক স্বামী দমুজিকে পুনর্জীবিত করিতে পারিয়াছিলেন, তথাপি 'অতি ধর্মপ্রাণ এবং ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিরাও তাহাদের প্রিয়জনদের পুনরুজ্জীবনের নিমিত্ত দেবালয় হইতে দেবালয়ে বৃথাই কাতর আবেদন জানাইয়াছিল।'

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, প্রাচীন মিশরীয় বা ক্যাল্ডিয়াবাসীরা মৃত ব্যক্তির শবদেহ হইতে কিংবা কবরস্থান হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া আত্মা সম্পর্কে কখনও ধারণা করিতে সক্ষম হয় নাই। সব দিক বিবেচনা করিলে এই পার্থিব জীবনই সর্বোত্তম, এবং মৃত ব্যক্তি সকল সময়ই আর একবার ইহা পাইবার সুযোগের জন্য লালায়িত এবং যাহারা জীবিত তাহারাও দুঃখ-পীড়িত, দেহের উপর নির্ভরশীল এই দ্বিতীয় আত্মার অবস্থিতিকাল বৃদ্ধি করিবার গভীর আশা পোষণ করিত এবং তাহাদিগকে সাহায্যের জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিত।

———-

১ প্রাচীন লেখা হইতে ম্যাসপেরো কর্তৃক ফরাসীতে, ব্রুগ্‌শ্‌ কর্তৃক জার্মান ভাষায় অনূদিত।

এইরূপ পরিবেশে আত্মা সম্পর্কে উচ্চতর জ্ঞান হওয়া সম্ভব নয়। প্রথমতঃ ইহা অত্যন্ত স্থূল জড়বাদ তদুপরি ভয় ও যন্ত্রনাপূর্ণ। অসংখ্য অশুভ শক্তির দ্বারা ত্রস্ত হইয়া, ঐগুলিকে এড়াইবার নৈরাশ্যজনক ও উদ্বিগ্ন চেষ্টায় জীবিতদের আত্মাও তাহাদের ধারণানুযায়ী মৃতের আত্মার মতো সারা পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়াইয়াও কিছুতেই গলিত শব ও শবাধারের গণ্ডির বাহিরে যাইতে পারিতেছে না।

এখন আমাদিগকে আত্মা সম্বন্ধে উচ্চতর ধারণার মূল আবিষ্কারের জন্য অপর একটি জাতির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে, যাহাদের নিকট ঈশ্বর সর্বকরুণানিলয় সর্বব্যাপী পুরুষ, যাহাদের নিকট তিনি জ্যাতির্ময় দয়ালু ও সহায়ক বিভিন্ন দেবতার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেন; মানবজাতির মধ্যে যাহারা সর্বাগ্রে ঈশ্বরকে পিতৃ-সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল, 'পিতা যেমন তাহার প্রিয় পুত্রের হস্ত ধারণ করেন, আপনিও তেমনি আমার

হস্ত ধারণ করুন'; যাহাদের নিকট জীবন ছিল আশার বস্তু, নৈরাশ্যের নয়; ধর্ম যাহাদের নিকট জীবনের প্রমত্ত উত্তেজনার অবসরে বেদনার্ত ব্যক্তির মুখ হইতে অকস্মাৎ নিঃসৃত কতগুলি সবিরাম আর্তনাদ মাত্র নয়, পরন্তু যাহাদের ধারণাসমূহ আমাদের নিকট শস্যক্ষেত্রের সুগন্ধ ও বনানীর সৌরভে আমোদিত হইয়া আসে; যাহাদের স্বতঃস্ফূর্ত বাধাহীন আনন্দপূর্ণ বন্দনাগীতি দিনমণির প্রথম কিরণে উদ্ভাসিত এই শোভাময়ী ধরণীকে অভিনন্দন করিবার কালে পক্ষিকণ্ঠ হইতে যেরূপ কাকলী নিঃসৃত হয়, তাহারই সদৃশ– আজও তাহা অষ্ট সহস্র বৎসরের সরণী ধরিয়া আমাদের নিকট দিব্যধামের নবীন আহ্বানের ন্যায় আসিয়া উপস্থিত হয়; আমরা এবার প্রাচীন আর্যজাতির কথাই বলিতেছি।

আর্যজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে তাহাদের প্রার্থনা-মন্ত্র এইরূপে লিপিবদ্ধ আছেঃ 'আমাকে সেই মৃত্যুহীন অক্ষয় ধামে স্থান দাও, যেখানে দিব্যলোকের জ্যোতি বিদ্যমান এবং যেখানে চিরন্তন দীপ্তি জাজ্বল্যমান '। 'আমাকে সেই ধামে অমর করিয়া রাখো , যেখানে রাজা বিবস্বানের পুত্র বাস করেন, যেখানে দিব্যধামের রহস্যাবৃত অর্চনালয় বর্তমান'। 'আমাকে সেই লোকে অমর করিয়া রাখো যেখানে তাঁহারা সানন্দে যদৃচ্ছ বিহার করেন' । ' পৃথিবী ও অন্তরিক্ষের ঊর্ধ্বে সর্বাপেক্ষা অন্তরতম যে তৃতীয় দ্যুলোকে নিখিল বিশ্ব জ্যেতির্ময়রূপে অবস্থিত, সেই আনন্দ-লোকে আমাকে অমর করিয়া রাখো।'

এইবারে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, আর্যজাতি ও ম্লেচ্ছগণের ধারণার মধ্যে কিরূপ আকাশ-পাতাল প্রভেদ বিদ্যমান। একের দৃষ্টিতে এই দেহ এবং এই পার্থিব জগৎই একমাত্র সত্য ও কাম্য বস্তু। তাহারা এই বৃথা আশা পোষণ করে যে, মৃত্যুকালে যে জীবনী-শক্তি দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায় এবং ইন্দ্রিয়সুখে বঞ্চিত হইয়া নির্যাতন ও দুঃখ অনুভব করে, মৃত দেহকে সযত্নে রক্ষা করিলে ঐ জীবনী-শক্তিকে পুনর্বার পৃথিবীতে ফিরাইয়া আনিতে পারা যায়। এইরূপে তাহাদের নিকট জীবন্ত ব্যক্তি অপেক্ষা মৃতদেহই অধিকতর যত্নের অধিকারী হইয়া পড়িল। অপরেরা দেখিল যে, শরীর ত্যাগ করিয়া যাহা প্রস্থান করে, তাহাই মানবের প্রকৃত সত্তা এবং শরীর হইতে বিযুক্ত হইয়া তাহা এমন

উচ্চতর সুখানুভবের স্তরে উপস্থিত হয়, শরীরে অবস্থানকালে সে-সুখ কখনও পায় নাই। তাই তাহারা ধ্বংসোন্মুখ শবদেহকে শীঘ্র দগ্ধ করিয়া নষ্ট করিবার ব্যবস্থা করিল।

এখানেই আমরা এমন একটি ভাবের অঙ্কুর দেখিতে পাইতেছি, যাহা হইতে আত্মা সম্পর্কে সঠিক ধারণার উদ্ভব হইতে পারে। যেখানে প্রকৃত মানবকে কেবল শরীর না ভাবিয়া আত্মা-রূপে ভাবা হইয়াছে, যেখানে প্রকৃত মানব ও তাহার শরীরের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য কোন সম্বন্ধ একেবারে নাই—সেখানেই আত্মার মুক্তি-সম্বন্ধীয় মহান্ ভাবের উদ্ভব হওয়া সম্ভব হইয়াছে। এই স্তরে উঠিয়া আর্যগণের দৃষ্টি যখন মৃত ব্যক্তির আবরণভূত বস্ত্রসদৃশ জ্যোতির্ময় দেহকে ভেদ করিয়া তদতীত স্তরে উপনীত হইল এবং আত্মার নিরাকার, পৃথক্, স্বতন্ত্র সত্তার প্রকৃত তত্ত্ব তাহারা বুঝিল, তখনই প্রশ্ন উঠিল—'কোথা হইতে?'

এই ভারতবর্ষে এবং আর্যদিগের মধ্যেই আত্মার পূর্বাস্তিত্বের, অমরত্বের এবং স্বাতন্ত্র্যের ধারণা প্রথম উদ্ভূত হয়। প্রাচীন মিশর সম্পর্কে সম্প্রতি যত গবেষণা হইয়াছে, তাহা হইতে এরূপ কোন প্রমান পাওয়া যায় না যে, সেখানে কখনও স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পার্থিব জীবন লাভের পূর্বে বিদ্যমান আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাহাদের কোন ধারণা ছিল। কোন কোন রহস্য-বিদ্যাবিদ্ অবশ্য এই তত্ত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের ক্ষেত্রে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ঐ ভাব ভারতবর্ষ হইতেই আসিয়াছিল।

কার্ল হেকেল বলেন, 'আমি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করি যে, যতই গভীরভাবে মিশরীয় ধর্ম অনুধাবন করা যাইবে, ততই ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে যে, মিশরীয় জনসাধারণ যে-ধর্মের অনুসরণ করিত, উহার সহিত পুনর্জন্মবাদের বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ নাই। এমন কি রহস্যবিদ্যাবিদ্ কেহ কেহ এই বিদ্যার অধিকারী হইয়া থাকিলেও ইহা ওসিরিস-শিক্ষার নিজস্ব বস্তু নহে, প্রত্যুত উহা হিন্দুগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত।'

পরবর্তী কালে দেখা যায়, আলেকজান্দ্রিয়াবাসী ইহুদীগণ এই মতবাদে বিশ্বাসী হইয়াছেন যে, প্রত্যেক আত্মার পৃথক্ সত্তা আছে; এবং পূর্বেই আমরা বলিয়া আসিয়াছি, যীশুর

সমসাময়িক ফ্যারিসীরা(প্রাচীন আচারনিষ্ঠ ইহুদী ধর্মসম্প্রদায়) শুধু যে আত্মার স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ছিলেন তাহাই নয়, তাঁহারা ইহাও বিশ্বাস করিতেন যে, আত্মা বিভিন্ন শরীরে যাতায়াত করে। এইরূপে অতি সহজেই ইহা বুঝিতে পারা যায়, তাহারা কেমন করিয়া যীশুকে প্রাচীন এক মহাপুরুষের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল এবং যীশু স্বয়ং ঘোষণা করিয়াছিলেন, ব্যাপ্টিস্ট জন-এর মধ্যে মহাত্মা ইলিয়াস পুনরাবির্ভূত হইয়াছেন– 'যদি আপনাদের বুঝিবার মতো ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে জানিবেন, যে ইলিয়সের পুনরাগমনের কথা ছিল, ইনিই তিনি।' ১

হিব্রুগণের মধ্যে আত্মা ও তাহার স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে যে-ধারণাগুলি দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি নিশ্চয়ই উচ্চতর রহস্যবিদ্যাবিদ্ মিশরীয়গণের নিকট হইতে আসিয়াছিল; মিশরীয়গণ আবার সেগুলি হিন্দুদের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। এগুলি যে আলেকজান্দ্রিয়ার মাধ্যমে আসিয়াছে, তাহা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ বৌদ্ধদের লিপি ও পুস্তকাদি হইতে আলেকজান্দ্রিয়া ও এসিয়া-মাইনরে তাহাদের প্রচারকার্যের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

এইরূপ কথিত আছে যে, গ্রীকদের মধ্যে পিথাগোরাসই সর্বপ্রথম হেলেনীয়দের নিকট আত্মার পুনর্জন্মবাদ প্রচার করেন। গ্রীকরা আর্য জাতিরই অন্তর্গত বলিয়া ইতিপূর্বেই মৃতদেহের অগ্নিসৎকার করিত এবং প্রত্যেক আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত। অতএব পিথাগোরাসের শিক্ষার ফলে পুনর্জন্মবাদ মানিয়া লওয়া তাহাদের পক্ষে সহজ ছিল। এপুলিয়াসের মতে পিথাগোরাস ভারতে আসিয়া ব্রাহ্মণদিগের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

---

১ ম্যাথু. ৯/ ১৪/

এ পর্যন্ত আমরা এইটুকু জানিয়াছি যে, যেখানেই আত্মাকে কেবল শরীরের চৈতন্যপ্রদ অংশবিশেষ না বলিয়া তাহার স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হইতেছে এবং উহাকেই মানুষের প্রকৃত

স্বরূপ বলা হইতেছে, সেখানেই ইহার পূর্বাস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস অপরিহার্যরূপেই আসিয়া পড়িয়াছে; এবং আমরা ইহাও জানিয়াছি যে, যে-সকল জাতি আত্মার স্বাধীন পৃথক্ সত্তায় বিশ্বাস করিতেন, তাঁহারা প্রায়ই তাঁহাদের মৃতদেহ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ঐ বিশ্বাসের বাহ্য প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন। যদিও আর্য জাতিদের মধ্যে প্রাচীন পারসীকগণ সেমিটিক প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিয়াও মৃতদেহ-সৎকারের একটি অদ্ভুত প্রথা আবিষ্কার করিয়াছিল, তথাপি যে-নামে তাহারা তাহাদের 'টাওয়ার অব সাইলেন্স'১-কে অভিহিত করে, তাহা হইতেই জানা যায় যে, উহা দহনার্থ দহ্-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, যে-সকল জাতি মানুষের স্বরূপ-নির্ধারণে অধিক মনোযোগ দেয় নাই, তাহারা এই জড়দেহকে সর্বস্ব বলিয়া মনে করার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই; এবং যদি বা কখনও অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের আলোকে তাহারা ইন্দ্রিয়াতীত জগতের কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছে, তবু তাহারা শুধু এই সিদ্ধান্তেই সন্তুষ্ট হইয়াছে যে, সুদূর ভবিষ্যতে কোন প্রকারে এই দেহই অবিনশ্বর হইবে।

অপরদিকে আর একটি জাতি ছিল, যাহারা মানবকে মননশীল জীবরূপে গণ্য করিয়া তাহার স্বরূপ-অনুসন্ধানে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিল; সেই আর্য হিন্দু জাতি শীঘ্রই দেখিতে পাইল যে, এই দেহকে অতিক্রম করিয়া এমন কি পিতৃপুরুষদের আকাঙ্ক্ষিত তেজোময় দেহকে অতিক্রম করিয়া প্রকৃত মানব-সত্তা বিরাজ করিতেছে; সেই মূলতত্ত্ব, সেই অবিভাজ্য স্বতন্ত্র সত্তাই নিজেকে এই দেহদ্বারা আবৃত করে, এবং জীর্ণ হইলে উহা ত্যাগ করে। এই মূলতত্ত্বটি কি কোন সৃষ্ট পদার্থ? যদি সৃষ্ঠি বলিতে 'অভাব' হইতে 'ভাবে'র সৃষ্টি বুঝায়, তাহা হইলে তাহাদের নিশ্চিত উত্তর 'না'; এই আত্মা জন্ম ও মৃত্যুহীন, ইহা যৌগিক বা মিশ্রিত পদার্থ নয়, কিন্তু স্বাধীন পৃথক্ সত্তাবান্; সেই হেতু তাহাকে উৎপন্নও করা যায় না , ধ্বংসও করা যায় না, ইহা কেবল বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পরিভ্রমণ করে।

---

১ পার্শীদের মৃতদেহ যে বেদীতে স্থাপন করিয়া পক্ষীদের আহারের জন্য উর্ধ্বে উত্তোলিত হয়, তাহাকে Tower of Silence(দখ্‌ম)বলে।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে : ইতিপূর্বে(দেহগ্রহণের পূর্বে) আত্মা কোথায় অবস্থান করিতেছিল? হিন্দু দার্শনিকগণ বলেন, স্থূল দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ইহা নানা দেহ অবলম্বন করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছিল; অথবা প্রকৃত বা দার্শনিক অর্থে ইহা বিভিন্ন মানসিক স্তর অতিক্রম করিতে ছিল।

বেদ ভিন্ন এমন অপর কোন যুক্তিসিদ্ধ ভিত্তি আছে কি, যাহার উপর হিন্দু দার্শনিকগণ তাঁহাদের পুনর্জন্মবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন? আছে। আশা করি, আমরা পরে দেখাইতে পারিব যে, সর্বজনগৃহীত যে-কোন মতবাদেরই মতো ইহারও স্বপক্ষে যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ আছে; কিন্তু সর্বাগ্রে আমারা দেখিতে চাই, আধুনিক কালের কতিপয় শ্রেষ্ঠ ইওরোপীয় চিন্তাশীল ব্যক্তি পুনর্জন্ম সম্বন্ধে কিরূপ চিন্তা করিয়াছেন।

ফিকটে১ আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলেন :
‘ইহা সত্য যে, আত্মার স্থায়িত্বের ধারণা খণ্ডনের নিমিত্ত প্রকৃতি হইতে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা সেই সর্বজনবিদিত যুক্তি—কালে যাহার আরম্ভ হইয়াছে, কোন না কোন কালে তাহার অবসানও হইবে; অতএব অতীতে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিলে সঙ্গে সঙ্গে আত্মার-পূর্বাস্তিত্বও স্বীকার করা হইয়া যায়। ইহা অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত। কিন্তু ইহা আত্মার স্থায়িত্বের বিপক্ষে প্রযোজ্য যুক্তি না হইয়া বরং তাহার নিত্যত্বের স্বপক্ষেই একটি অতিরিক্ত যুক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। বস্তুতঃ কেহ যদি এই অধ্যাত্ম-ও শারীর-বিদ্যার অন্তর্গত স্বতঃসিদ্ধ সত্যটি বুঝিতে পারেন যে, প্রকৃতপক্ষে কোন-কিছুরই সৃষ্টি হইতে পারে না, তাহা হইলে এই সত্যও ধরিতে পারিবেন যে, এই স্থূল শরীর অবলম্বনে দৃশ্যমাণ হইবার পূর্ব হইতেই আত্মা বিদ্যমান ছিল।’

শোপেনহাওয়ার২ তাঁহার ‘ Die Welt als Wille Und Vorstellung’ নামক গ্রন্থে পুনর্জন্মবাদ সম্পর্কে বলিতেছেন : “ব্যক্তির পক্ষে নিদ্রা বলিতে যাহা বুঝায়, ‘ইচ্ছাশক্তি’ র পক্ষে মৃত্যু

বলিতেও তাহাই বুঝায়। কারণ স্মৃতিশক্তি ও নিজ স্বাতন্ত্র্য যদি সর্বদা ইহার সহিত লাগিয়া থাকিত, তবে প্রকৃত লাভের সম্ভাবনা না থাকিলে ইচ্ছাশক্তি কিছুতেই অনন্তকাল ধরিয়া একই কর্মানুষ্ঠান ও যন্ত্রণাভোগ করার জন্য টিকিয়া থাকিত না। কিন্তু ইচ্ছাশক্তি উহাদিগকে দূরে সরাইয়া দেয়, এবং ইহাই লিথি-নামক বিস্মরণের নদী; এই মৃত্যুরূপ নিদ্রার ভিতর দিয়া ইচ্ছাশক্তি পুনর্বার অপর একটি নূতন বুদ্ধির দ্বারা সজ্জিত হইয়া সম্পূর্ণ এক নূতন জীবরূপে আবির্ভূত হয়; এক নূতন দিন তখন তাহাকে এক নূতন তটভূমির দিকে প্রলুব্ধ করে।

———-

১ I. H. Fichte
২ Schopenhauer.

“এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, এই নিরন্তর জন্মপ্রবাহই পর পর সেই অবিনাশী ইচ্ছাশক্তির জীবন-স্বপ্নগুলি রচনা করিতে থাকে; এবং যতক্ষণ না নির্দিষ্ট পরিমাণ ও নির্দিষ্ট প্রকারের বিচিত্র ও নিত্যনূতন উপদেশ ও অভিজ্ঞতা লাভের ফলে ইচ্ছাশক্তি নিজেই নিজের বিলোপ ও বিনাশ সাধন করিতেছে, ততদিন এইরূপই চলিতে থাকে। ...ইহাও উপেক্ষা করা যায় না যে, ব্যাবহারিক অভিজ্ঞতা-প্রসূত যুক্তিও এইরূপ পুনর্জন্ম সমর্থন করে। বস্তুতঃ যাঁহারা জীর্ণ হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মৃত্যুর সহিত যাহারা নবাবির্ভূত, তাহাদের জন্মের একটি সম্পর্ক আছে। ব্যাপক মহামারীর পরে মানবজাতির মধ্যে শিশুজন্মের যে আধিক্য দেখা যায়, তাহা হইতেই ইহা প্রমাণিত হয়। চতুর্দশ শতকে প্লেগ মহামারীর(Black Death)ফলে যখন পূর্ব গোলার্ধের অধিকাংশ মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন মানবজাতির মধ্যে অস্বাভাবিকভাবে সন্তানোৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এবং প্রায়ই যমজ-শিশুর জন্ম হইত। ইহাও লক্ষণীয় যে, এই সময়ে যে-সকল শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের কেহই পূর্ণসংখ্যক দন্ত লাভ করে নাই; এইরূপে প্রকৃতি আপন শক্তি যথাসাধ্য প্রয়োগ করিয়াও খুঁটিনাটি ব্যাপারে কৃপণতা প্রকাশ করিয়াছিল। ১৮২৫ খৃঃ লিখিত Chronik der Seuchen নামক গ্রন্থে স্নুরার১ ইহার বর্ণনা

উল্লেখ করিয়াছেন। ক্যাসপারও২ তাঁহার ১৮৩৫ খৃঃ লিখিত 'Ueber die Wahrscheinliche Lebensdauer des Menschen' গ্রন্থে এই প্রাকৃতিক নিয়ম সমর্থন করিয়াছেন যে, যে-কোন একটি নির্দিষ্ট জনসমষ্টির মধ্যে দেখা যায়, তাহাদের জন্মসংখ্যার হার তাহাদের মৃত্যুসংখ্যা ও আয়ুষ্কালের হারের উপর অতি সুনিশ্চিত প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, কারণ জন্মের সংখ্যা সর্বদা মৃত্যুর হারের সহিত সমতা রক্ষা করে; ইহার ফলে সর্বদা সর্বত্র মৃত্যু ও জন্ম সমান হারে বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়। বিভিন্ন দেশ এবং উহাদের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া তিনি সন্দেহাতীতরূপে ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। তথাপি ইহা অসম্ভব যে, আমার অকাল-মৃত্যুর সহিত এইরূপ একটি বিবাহের ফলপ্রসূতার কোন প্রত্যক্ষ বা কার্যকারণাত্মক সম্পর্ক থাকিবে, যে-বিবাহের সহিত আমার কোন সম্পর্কই নাই; ইহাও অসম্ভব যে, ঐ বিবাহের সহিত আমার মৃত্যুর কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে। এইরূপে এক্ষেত্রে অধ্যাত্ম-তত্ত্বই অনস্বীকার্যরূপে এবং অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে জাগতিক বিষয়ের ব্যাখ্যার প্রত্যক্ষ ভিত্তিরূপে প্রতীয়মান হয়। প্রত্যেক নবজাত ব্যক্তি সজীবতা ও প্রফুল্লতা লইয়া নবজীবনে আবির্ভূত হয় এবং ঐগুলি উপঢৌকনের মতো উপভোগ করে; কিন্তু জগতে বিনামূল্যে কিছুই পাওয়া যায় না, পাওয়া যাইতে পারে না। এই নবীন জীবনের জন্য অপর একটি নিঃশেষিত জীবনকে বার্ধক্য ও জরারূপ মূল্য দিতে হয়। কিন্তু তাহার মধ্যেই এমন এক অবিনশ্বর বীজ নিহিত থাকে, যাহা হইতে নূতন জীবনের উৎপত্তি হয়—উভয়ে একই সত্তা।"

———-

১ F. Schnurrer

২ Casper.

শূণ্যবাদে বিশ্বাসী হইলেও সুবিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক হিউম১ অমৃতত্ব বিষয়ে সংশয়াত্মক এক প্রবন্ধে বলেনঃ 'অতএব এই জাতীয় মতবাদ-সমূহের মধ্যে একমাত্র পুনর্জন্মবাদই দার্শনিকদের প্রণিধানযোগ্য।' দার্শনিক লেসীং২ কবিজনোচিত গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহায়ে প্রশ্ন করিতেছেন : 'একমাত্র প্রাচীনতমত্বের দাবিতে স্বীকৃত বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের

কুতর্কের প্রভাবে মানুষের বোধশক্তি যে অতীতকালে ক্ষীণ ও দুর্বল হইয়া যায় নাই, সেই অতীতকালে এই মতবাদটি মানুষের অনুভূতির ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিল বলিয়া কি ইহা এতই পরিহাসের বিষয়?...আমি যতক্ষণ নূতন জ্ঞান, নূতন অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা রাখি, ততক্ষণ কেন আমি বারংবার ফিরিয়া আসিব না? একবার জন্মগ্রহন করিয়াই কি আমি এত বেশী পাইয়াছি যে, দ্বিতীয়বার আগমনজনিত ক্লেশের পরিবর্তে আমার আর কিছুই পাইবার থাকিবে না?'

---

১ Hume
২Lessing

পূর্ব হইতে বিদ্যমান একই আত্মা বহুজীবনে বহুবার পুনর্জন্ম গ্রহণ করে–এইরূপ মতবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে বহু যুক্তি রহিয়াছে, এবং সর্বকালেই চিন্তানায়কদের মধ্যে বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ইহার সমর্থনে অগ্রসর হইযাছেন; আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে মনে হয়, আত্মা বলিয়া কোন স্বতন্ত্র বস্তু থাকিলে ইহাও অনিবার্য যে, উহা পূর্ব হইতেই বিদ্যমাণ। আত্মার স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার না করিয়া উহাকে স্কন্ধ(ধারণা) সমূহের সমষ্টি বলিয়া মানিলেও বৌদ্ধদের মধ্যে মাধ্যমিকদিগকে নিজেদের মতবাদ ব্যাখ্যা করিবার জন্য বাধ্য হইযা আত্মার পূর্বাস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়।

যে যুক্তিবলে প্রমাণ করা হয়, কোন অসীম বস্তুর আদি থাকা অসম্ভব, তাহা অকাট্য। যদিও ইহার খণ্ডনকল্পে এই যুক্তিবিরুদ্ধ মতের আশ্রয় গ্রহণ করা হয় যে, অনন্তশক্তি ভগবানের পক্ষে অসম্ভবও সম্ভব হয়। দুঃখের বিষয় এই ভ্রমাত্মক যুক্তি বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির মুখেও শুনিতে পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ যেহেতু ঈশ্বর প্রাকৃতিক সকল ব্যাপারের সর্বজনীন এবং সাধারণ কারণ, অতএব মানবাত্মার নিজের মধ্যে যে-সব বিশেষ রকমের ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, সেগুলির প্রাকৃতিক(অসাধারণ) কারণ অনুসন্ধানের প্রশ্ন উঠিতেছে; কাজেই এক্ষেত্রে ভগবান এই

জগদ্রূপ যন্ত্রের নির্মাতা১ এইরূপ মতবাদ সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। ইহা অজ্ঞতার স্বীকৃতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণ মানবীয় জ্ঞানের প্রত্যেক শাখার প্রত্যেক প্রশ্ন সম্পর্কেই আমরা ঐ এক উত্তর দিতে পারি এবং এইরূপে সকল প্রকার অনুসন্ধিৎসা বন্ধ করিয়া ফলতঃ জ্ঞানের পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ করিতে পারি।

দ্বিতীয়তঃ এইরূপ সর্বদা ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তার দোহাই দেওয়ার অর্থ কতগুলি শব্দের প্রহেলিকা সৃষ্টি করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণকে কারণরূপে ঠিক তখনই জানা হয় এবং জানিতে পারা যায়, যখন ঐ কারণটি তাহার কার্য-উৎপাদনের পক্ষে পর্যাপ্ত, এতদতিরিক্ত আর কিছুই নয়। ইহার ফলে আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হইতেছি যে, আমার একদিকে যেমন অনন্ত ফলের চিন্তা করিতে পারি না, অপরদিকে তেমনি সর্বশক্তিমান্ কারণেরও ধারণা করিতে পারি না। আরও দ্রষ্টব্য এই যে, ভগবান সম্বন্ধে আমাদের সকল ধারণাই সসীম; তাঁহাকে কারণ বলিয়া মানিলেও এই কারণত্বের দ্বারা ভগবানের ধারণা সীমিত হইয়া পড়ে। তৃতীয়তঃ ঐরূপ মতবাদ তর্কের খাতিরে মানিয়া লইলেও যতক্ষণ আমরা ইহা অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিসহ ব্যাখ্যা দিতে না পারিব, ততক্ষণ এমন কোন অসম্ভব কথা মানিতে বাধ্য নই যে, ‘অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়’ অথবা ‘অসীম বস্তু কোন কালের মধ্যে আরম্ভ হয়’ ।

———-

১ Deus ex machina

পূর্বাস্তিত্বের বিরুদ্ধে এই একটি তথাকথিত দৃঢ় যুক্তি খাড়া করা হয় যে, অধিকাংশ মানুষ এ সম্পর্কে সচেতন নয়। এই যুক্তির উপস্থাপয়িতাকে ইহার সারবত্তা প্রদর্শনের জন্য প্রমাণ করিতে হইবে যে, সমগ্র মানবাত্মাটি শুধু স্মরণকার্যেই ব্যাপৃত থাকে। কোন জিনিসের স্মৃতি যদি তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ হয়, তাহা হইলে জীবনের যে যে অংশ এখন স্মৃতির অন্তর্ভুক্ত নহে, তাহার অস্তিত্ব নিশ্চয়ই লোপ পাইয়াছে, এবং যে-কোন ব্যক্তি

গভীর মূর্ছাকালে বা বিকারের অন্য কোন অবস্থায় স্মৃতিশক্তি হারাইয়া ফেলে, সে তখন নিশ্চয়ই নিজের অস্তিত্বও হারাইয়া ফেলে।

আত্মার পূর্বাস্তিত্ব অনুমানের জন্য, বিশেষতঃ সচেতন কার্যাকলাপের স্তরে তাহার প্রমাণার্থে হিন্দু দার্শনিকগণ যে-সকল মৌলিক সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করেন, তাহা প্রধানতঃ এইরূপ :

প্রথমতঃ ইহা ব্যাতীত এই বৈষম্যময় জগতের ব্যাখ্যা কিরূপে সম্ভব হইবে? একজন দয়ালু ও ন্যায়বান্ ঈশ্বর কর্তৃক অধিষ্ঠিত রাজ্যে সদ্‌ভাবে ও মানব-সমাজের সম্পদ্‌রূপে গড়িয়া উঠিবার পক্ষে প্রয়োজনীয় সকল সুযোগের মধ্যে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করিল, এবং হয়তো সেই একই মুহূর্তে একই মহানগরে অপর একটি শিশু এমন অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিল, যাহা তাহার ভাল হইয়া উঠিবার পক্ষে প্রতিকূল। দেখিতে পাই—এমন শিশুও জন্মায় যে শিশু কষ্ট ভোগ করে, হয়তো সারা জীবনই কষ্ট পায়, অথচ এজন্য তাহার কোন দোষ নাই। এইরূপ কেন হইবে? ইহার কারণ কি? ইহা কাহার অজ্ঞতা-প্রসূত? যদি শিশুটির দোষ নাই থাকে, তাহা হইলে সে কেন তাহার পিতামাতার কর্মের ফলে এই কষ্ট ভোগ করিবে? বর্তমান দুঃখের অনুপাতে ভবিষ্যতে সুখ লাভ হইবে—এই প্রলোভন দেখাইয়া বা রহস্যের অবতারণা করিয়া প্রশ্নটিকে এড়াইয়া যাওয়া অপেক্ষা অজ্ঞতা স্বীকার করা অনেক ভাল। কাহারও পক্ষে আমাদের উপর অসঙ্গত ক্লেশভার বলপূর্বক চাপাইয়া দেওযা নীতিবিগর্হিত তো বটেই, উহাকে অবিচারও বলা চলে। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে ক্ষতিপূরণ হইবে—এইরূপ মতবাদটিও সম্পূর্ণ যুক্তিহীন।

যাহারা দুঃখের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের কয়জন উচ্চতর জীবনের অভিমুখে অগ্রসর হইবার জন্য সংগ্রাম করে? কতজনই বা যে-অবস্থার মধ্যে জন্মলাভ কারিয়াছে, তাহারই মধ্যে আত্মসমর্পণ করে? যাহারা বাধ্য হইয়া মন্দ অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করার জন্য অধিকতর মন্দস্বভাব এবং নীতিহীন হইয়া উঠে, তাহারা কি তাহাদের আজীবন নীতিহীনতার দরুন ভবিষ্যতে পুরস্কৃত হইবে? সে-ক্ষেত্রে যে এখানে যত দুর্বৃত্ত হইবে, ভবিষ্যতে তাহার পুরস্কার ততই অধিক হইবে।

সুখদুঃখভোগের সকল দায়িত্ব উহার ন্যায়সঙ্গত কারণের উপর, অর্থাৎ আমাদের স্বাধীন কর্মফলের উপর আরোপ না করিলে মানবাত্মার মহিমা ও মুক্তভাব প্রমাণ করার এবং সংসারের এই অসাম্য ও ভয়াবহ-তার সামঞ্জস্য স্থাপন করার আর কোন উপায় নাই। শুধু তাই নয়, শূন্য হইতে আত্মার সৃষ্টি-বিষয়ে যত মতবাদই প্রচার করা হউক না কেন, উহাদের প্রত্যেকটি আমাদিগকে অনিবার্যরূপে অদৃষ্টবাদে বা সমস্তই পূর্ব হইতে সুনির্দিষ্ট–এইরূপ মতবাদে লইয়া যাইবে, এবং এক করুণাময় পিতার পরিবর্তে এক বিকটদর্শন, নিষ্ঠুর এবং সদাক্রুদ্ধ ঈশ্বরকে আমাদর উপাস্যরূপে উপস্থিত করিবে। অধিকন্তু শুভাশুভ-সাধনে ধর্মের যতটুকু শক্তি আছে, তাহার অনুধাবন করিলে দেখিতে পাই যে, 'আত্মা সৃষ্ট বস্তু'–এই মতবাদের সহিত তাহারই অনুসিদ্ধান্ত–অদৃষ্টবাদ ও ঈশ্বর কর্তৃক ভাগ্যনির্ধারণ–খ্রীষ্টীয় ও মুসলমান ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্য এই এক ভয়াবাহ ধারণার জন্য দায়ী যে, অধার্মিক ও পৌত্তলিকগণকে বিধিসঙ্গতরূপে তাহাদের তরবারি দ্বারা হত্যা করা চলে, আরও এই মতবাদের ফলে যতপ্রকার নিষ্ঠুর অত্যাচার হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে সেগুলির জন্যও এই মতবাদই দায়ী।

কিন্তু ন্যায়দর্শন-প্রণেতারা পুনর্জন্মতত্ত্বের সমর্থনে যে-যুক্তিটি বহু বার উপস্থিত করিয়াছেন এবং যাহা আমাদের দৃষ্টিতে এই প্রসঙ্গের সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে হয়, তাহা হইল এই যে, আমাদের অভিজ্ঞতা কখনও সম্পূর্ণ বিলীন হয় না। আমাদের কার্যকলাপ(কর্ম) যদিও বাহ্যতঃ বিলুপ্ত হয়, তথাপি অদৃষ্টরূপে বর্তমান থাকে, এবং পুনর্বার কার্যের মধ্যে প্রবৃত্তির আকারে আবির্ভূত হয়, এমন কি ছোট শিশুরাও কতকগুলি প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, যথা মৃত্যু ভয়।

এখন যদি প্রবৃত্তিকে বারংবার অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপের ফল বলা হয়, তাহা হইলে যে-সকল প্রবৃত্তি লইয়া আমরা জন্মগ্রহণ করি, তাহার অর্থ সেই দিক হইতে ব্যাখ্যা করিতে হয়। স্পষ্টতঃ আমর ঐগুলি এইজন্মে পাই নাই, সুতরাং অতীতেই সেগুলির মূল অনুসন্ধান করিতে হইবে। এখন ইহাও স্পষ্ট যে, আমাদের কতকগুলি প্রবৃত্তি মনুষ্যোচিত সচেতন প্রয়াসের ফল। ইহা যদি সত্য হয় যে, আমরা এই-সকল প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি,

তবে ইহা অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত হয় অতীতের সচেতন সকল প্রযত্নই ইহার কারণ, অর্থাৎ আমরা যাহাকে মানবীয় স্তর বলি, বর্তমান জন্মের পূর্বেও আমরা সেই মানবোচিত মানস স্তরেই ছিলাম।

অন্ততঃ বর্তমান জীবনের প্রবৃত্তিসমূহকে অতীতের সচেতন প্রয়াসের দ্বারা ব্যাখ্যার ব্যাপারে ভারতের পুনর্জন্মবাদিগণ এবং অধুনাতম ক্রম-বিকাশবাদিগণ একমত; একমাত্র পার্থক্য এই যে, যেখানে অধ্যাত্ম-বাদী হিন্দুরা এগুলি প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র আত্মার সচেতন প্রয়াসের ফল বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, সেখানে জড়বাদী ক্রমবিবর্তনবাদীরা ঐগুলি বংশপরম্পরায় একদেহ হইতে দেহান্তরে সঞ্চারণ বলিয়া অভিহিত করেন। যে মতবাদিগণ 'অভাব' বা শূন্য হইতে সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের স্থান কোথাও নাই।

তাহা হইলে এই বিষয়ে দুইটি মাত্র পক্ষ দাঁড়াইতেছে—পুনর্জন্মবাদ এবং জড়বাদ; ইহারই কোন একটি অবলম্বন করিয়া সিদ্ধান্ত স্থির করিতে হইবে। পুনর্জন্মবাদী বলেন : অতীত সমস্ত অভিজ্ঞতা অনুভব-কর্তার মধ্যে, অর্থাৎ প্রত্যেক পৃথক্ আত্মার মধ্যে প্রবৃত্তিরূপে সঞ্চিত হইয়া আছে, এবং প্রত্যেক আত্মা যখন তাহার অবিচ্ছেদ্য পৃথক্ সত্তা লইয়া নূতন জন্ম গ্রহণ করে, তখন ঐ প্রবৃত্তিগুলিও তাহাতে সঞ্চারিত হয়। আর জড়বাদী বলেন : মানুষের মস্তিষ্কই সকল কর্মের কর্তা এবং জীবকোষ অবলম্বনে এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিতে (পুরুষাক্রমে) এ প্রবৃত্তিগুলি সঞ্চারিত হয়।

এইরূপে পুনর্জন্মবাদ আমাদের নিকট অসীম গুরুত্ব লইয়া উপস্থিত হয়, কারণ আত্মার পুনর্জন্ম ও দেহ-কোষ অবলম্বনে প্রবৃত্তির সঞ্চারণ-বিষয়ে যে বিবাদ চলিতেছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে অধ্যাত্মবাদ ও জড়বাদের সংগ্রাম। যদি কোষের মাধ্যমে সঞ্চারণই সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হয়, তাহা হইলে জড়বাদ অনিবার্য, এবং তখন আত্মতত্ত্বের কোন প্রয়োজন থাকে না। ইহা যদি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক আত্মার একটি নিজস্ব সত্তা আছে এবং আত্মা তাহার বর্তমান জীবনে অতীতের অভিজ্ঞতা বহন

করিয়া আনে—এই মতটি সম্পূর্ণ সত্য। এই দুই বিকল্প—পুনর্জন্মবাদ ও জড়বাদ; এই উভয়ের মধ্যে আর কোন কিছুর স্থান নাই। ইহার কোন্‌টি আমরা গ্রহণ করিব?

৪. আত্মা কি অমর ?

আত্মা কি অমর?

The New York Morning Advertiser পত্রিকায় এ-বিষয়ে যে আলোচনা হয়, তাহাতে যোগ দিয়া স্বামীজী এই প্রবন্ধ লিখেন।

বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি।—শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ২/১৭ সংস্কৃত ভাষার সুপ্রসিদ্ধ মহাকাব্য মহাভারতে বর্ণিত আছে—কিরূপে(বকরূপী) ধর্ম কর্তৃক জগতের আশ্চর্যতম বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া ঐ মহাকাব্যের নায়ক যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন : জগতে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জীবনের প্রায় প্রতি মুহূর্তে চারিদিকে মৃত্যু ঘটিতেছে দেখিয়াও মানুষের অটল বিশ্বাস যে, সে নিজে মৃত্যুহীন। প্রকৃতপক্ষে ইহাই মানব-জীবনের প্রচণ্ড বিস্ময়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দর্শনে ইহার বিপক্ষে অশেষ প্রকার যুক্তি প্রদর্শিত হইলেও এবং ইন্দ্রিয়গত ও ইন্দ্রিয়াতীত জগতের মধ্যে চিরবিদ্যমান রহস্য-যবনিকা যুক্তিসহায়ে ভেদ করিতে অক্ষম হইলেও মানুষ দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া বসিয়া আছে যে, সে কখনও মরিতে পারে না।

আমরা সমগ্র জীবন ব্যাপীয়া অনুশীলন করিতে পারি, তথাপি শেষ পর্যন্ত জন্ম-মৃত্যুর সমস্যাটিকে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোন যুক্তিমূলক প্রমাণের স্তরেই দাঁড় করাইতে পারি না। মানব-সত্তার স্থায়িত্ব বা অনিত্যতার পক্ষে বা বিপক্ষে আমরা যত খুশি লিখিতে, বলিতে প্রচার করিতে বা শিক্ষা দিতে পারি; ইহার যে কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়া আমরা প্রচণ্ড বিরোধে মত্ত হইতে পারি; ইহার পূর্ব নাম অপেক্ষা ক্রমেই শত শত জটিলতর নূতন নূতন নাম আবিষ্কার করিয়া আমরা ক্ষণকালের জন্য আত্মপ্রবঞ্চনার মধ্যে এই শান্তি লাভ করিতে পারি যে , আমরা চিরকালের জন্য সমস্যাটির সমাধান করিয়া ফেলিয়াছি; আমরা পূর্ণ উদ্যমে ধর্মরাজ্যের কোন একটি অদ্ভুত কুসংস্কারকে আঁকড়াইয়া ধরিতে পারি, অথবা ইহা অপেক্ষাও অধিকতর আপত্তিজনক কোন বৈজ্ঞানিক কুসংস্কারকে মানিয়া লইতে পারি,

কিন্তু অবশেষে দেখিতে পাই—আমরা যুক্তিরূপ এক সঙ্কীর্ণ ক্রীড়াক্ষেত্রে এমন একটি অনন্ত কন্দুক-ক্রীড়ায় লিপ্ত রহিয়াছি, যাহাতে বুদ্ধিরূপ খুঁটিগুলিকে বারংবার দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিতেছি, আর পরক্ষণেই উহারা কন্দুকাঘাতে ধরাশায়ী হইতেছে।

কিন্তু এই যে মানসিক শ্রম ও কষ্টভোগ, যাহা বহু ক্ষেত্রে ক্রীড়া অপেক্ষাও অধিকতর সঙ্কট উৎপন্ন করে, উহার পশ্চাতে এমন একটি সত্য আছে, যাহার সম্বন্ধে বাদবিসংবাদ করা চলে না, যাহা সমস্ত বিসংবাদের অতীত। আর ইহাই হইল মহাভারতে উল্লিখিত সেই সত্য—সেই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার : মানুষের পক্ষে ধারণা করা অসম্ভব যে, সে শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে। এমন কি আমার নিজের বিনাশের কথা ভাবিতে গেলেও আমাকে সাক্ষিরূপে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সেই বিনাশক্রিয়াটিকে দেখিতে হইব।

এখন এই অদ্ভুত ব্যাপারের অর্থ বুঝিবার পূর্বে এই একটি বিষয়ে অবহিত হওয়া আবশ্যক যে, সমগ্রজগৎ এই তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বহির্জগতের সত্তা অপরিহার্যরূপে অন্তর্জগতের সত্তার সহিত বিজড়িত। এই উভয় সত্তার কোন একটিকে বাদ দিয়া এবং অপরটিকে স্বীকার করিয়া জগৎ সম্বন্ধে যে কোন মতবাদ গড়িয়া তুলিলে উহা আপাততঃ যতই বিশ্বাসযোগ্য মনে হউক, ঐ মতবাদের স্রষ্টা নিজেই দেখিতে পাইবেন, অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ—এই উভয় জগতের স্থায়িত্বকে যদি প্রেরণাশক্তির অন্যতম কারণরূপে স্বীকার না করা হয়, তবে তাঁহার স্বকল্পিত প্রক্রিয়া অবলম্বনে একটিও সচেতন ক্রিয়া সম্ভব নয়। যদিও ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে, যখন মানব-মন আপন সীমাবদ্ধ ভাব অতিক্রম করে, তখন সে দেখে—দ্বৈত জগৎ এক অখণ্ড একত্বে পরিণত হইয়া গিয়াছে, তথাপি ঐ নিরপেক্ষ সত্তাকে তখন ইহজগতের দৃষ্টিতে দেখা হয়, এবং সমগ্র দৃশ্য জগৎ—অর্থাৎ আমাদের পরিচিত এই জগৎ, জ্ঞাতার জ্ঞেয় বিষয়মাত্ররূপেই জ্ঞাত হয় ও জ্ঞাত হইতে পারে। সুতরাং এই জ্ঞাতার ধ্বংসের কল্পনা করিতে পারার পূর্বে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া জ্ঞেয় বিষয়ের ধ্বংস কল্পনা করিতে হইবে।

এ পর্যন্ত তো খুবই সহজ। ইহার পর ব্যাপারটি কঠিন হইয়া পড়িতেছে। সাধারণতঃ আমরা নিজদিগকে শরীর ব্যতীত অন্যকিছু ভাবিতে পারি না। আমি যখনই নিজেকে অমর বলিয়া

ভাবি, তখন 'আমি' বলিতে দেহরূপ আমাদেরই গ্রহণ করি। কিন্তু শরীর যে সমগ্র প্রকৃতির মতোই অস্থায়ী এবং ইহা সর্বদা বিনাশের দিকেই অগ্রসর হইতেছে, ইহা তো প্রত্যক্ষ সত্য।

তাহা হইলে এই স্থায়িত্ব কোথায় নিহিত?
আমাদের জীবনের সঙ্গে এমন আর একটি আশ্চর্য বিষয়ের সংযোগ রহিয়াছে, যেটিকে বাদ দিলে 'কে বাঁচিতে পারে, কে এক মুহূর্তের জন্যও জীবনে আনন্দ উপভোগ করিতে পারে?'১ –সেটি হইল মুক্তির আকাঙ্ক্ষা।

এই আমাঙ্ক্ষাই আমাদের প্রতি পদক্ষেপ নিয়মিত করে, আমাদের গতিবিধি সম্ভব করে, পরস্পরের সহিত আমাদের সম্পর্ক নির্ধারণ করে। শুধু তাই নয়, ইহা যেন মানবজীবনরূপ বস্ত্রের টানা ও পোড়েন। বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান ইহাকে তিল তিল করিয়া নিজ ক্ষেত্র হইতে হটাইয়া দিতে চায়, ইহার রাজ্য হইতে একটির পর একটি দুর্গ অধিকার করিতে চায়, এবং(মানুষের)প্রতিটি পদক্ষেপ কার্য-কারণের রেলপথের লৌহবন্ধনে আবদ্ধ করে। কিন্তু আমাদের এ-সব প্রচেষ্টায় মুক্তি হাসিয়া উঠে, আর কি আশ্চর্য!মুক্তিকে যদিও আমরা অশেষ বিপুলভার বিধি ও কার্য-কারণের নিয়মের চাপে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করিতে চাহিয়াছিলাম, তথাপি সে এখনও নিজেকে ঐগুলির ঊর্ধ্বে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। ইহার অন্যথা কিরূপে হইতে পারে? সসীমকে যদি নিজের অর্থ পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে সর্বদাই তাহাকে অসীমের উচ্চতর ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতে তাহা করিতে হইবে। বদ্ধ কেবল মুক্তের দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইতে পারে। যাহা কার্যরূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে, তাহা ব্যাখ্যাত হইতে পারে কার্যাতীত বস্তুর দ্বারা। এখানে আবার সেই একই অসুবিধা আসিয়া পড়িল। মুক্ত কে?–শরীর? অথবা মনও কি মুক্ত? ইহা সকলের কাছেই সুস্পষ্ট যে বিশ্বের অন্যান্য যে-কোন বস্তুর ন্যায় এই দুইটিও নিয়মের অধীন।

এখন সমস্যাটি একটি উভয়-সঙ্কটের আকার ধারণ করিতেছে। হয় বলো, সমগ্র বিশ্ব একটি সদা-পরিবর্তনশীল জড়সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নয়, ইহা কার্য-কারণের অনিবার্য নিগড়ে চির আবদ্ধ, ইহার একটি কণিকারও কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই; অথচ অচিন্তনীয়রূপে

ইহা নিত্যত্ব ও মুক্তির এক অবিচ্ছেদ্য প্রহেলিকা সৃজন করিয়া চলিয়াছে। অথবা বলো, এই বিশ্ব ও আমাদের মধ্যে এমন কিছু রহিয়াছে, যাহা নিত্য এবং মুক্ত। ফলে ইহাই প্রতিপন্ন হয়, মানুষের মনে নিত্যত্ব ও মুক্তি সম্বন্ধে যে স্বভাবসিদ্ধ মৌলিক বিশ্বাস রহিয়াছে, তাহা প্রহেলিকা নয়। বিজ্ঞানের কর্তব্য হইল উচ্চতর সামান্যীকরণের সাহায্যে জাগতিক ঘটনাগুলিকে ব্যাখ্যা করা। সুতরাং কোন ব্যাখ্যা- কালে যদি অপরাপর তথ্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যার জন্য উপস্থাপিত নূতন তথ্যের কিয়দংশকে নষ্ট করিয়া ফেলা হয়, তবে ঐ ব্যাখ্যা আর যাহা কিছু হউক, বিজ্ঞান-নামধেয় হইতে পারে না।

অতএব যে-কোন ব্যাখ্যাতে এই সদা-বিদ্যমান এবং সর্বদা-আবশ্যক মুক্তির ধারণাকে উপেক্ষা করা হয়, তাহা উপরি-উক্ত প্রকারে ভ্রান্ত, অর্থাৎ অপর তথ্যগুলির ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে উহা নূতন তথ্যের একাংশকে অস্বীকার করে; সুতরাং উহা ভ্রান্ত। অতএব আমাদের প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া একমাত্র অপর বিকল্পটি স্বীকার করা চলে, তাহা এই যে—আমাদের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা মুক্ত এবং নিত্য।

---

১ কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। তৈত্তি. উপ.—২- ৭

কিন্তু তাহা শরীর নহে, মনও নহে। শরীর প্রতি মুহূর্তে মরিতেছে, মন নিয়ত পরিবর্তনশীল। শরীর একটি যৌগিক পদার্থ, মনও তাই; অতএব তাহারা কখনও পরিবর্তনশীলতার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে না। কিন্তু এই স্থূল জড়বস্তুর ক্ষণিক আবরণের ঊর্ধ্বে, এমন কি মনের সূক্ষতর আবরণেরও ঊর্ধ্বে, সেই আত্মা বিরাজমান, যাহা মানুষের প্রকৃত সত্তা, যাহা চিরস্থায়ী ও চিরমুক্ত। তাহারই মুক্ত স্বভাব মানুষের চিন্তা এবং বস্তুর স্তরের মধ্যে দিয়া অনুস্রুত হইতেছে এবং নামরূপের বর্নাপ্রলেপ সত্ত্বেও স্বীয় শৃঙ্খলহীন অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে। অজ্ঞানের ঘনীভূত স্তরের আররণ সত্ত্বেও তাহারই অমরত্ব, তাঁহারই

পরমানন্দ, তাঁহারই শান্তি, তাঁহারই ঐশ্বর্য উদ্ভাসিত হইয়া স্বীয় অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিতেছে। এই ভয়শূন্য, মৃত্যুহীন, মুক্ত আত্মাই প্রকৃত মানুষ।

যখন কোন বহিঃশক্তি কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, কোনও পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না, তখনই স্বাধীনতা বা মুক্তি সম্ভব। মুক্তি শুধু তাহারই পক্ষে সম্ভব, যে সর্বপ্রকার বন্ধনের—সমস্ত নিয়মের এবং কার্য-কারণের নিয়ন্ত্রনের অতীত। অর্থাৎ অন্য প্রকারে বলিতে গেলে বলা যায়, যে অবিকারী সেই শুধু মুক্ত এবং সেইজন্যই অমর হইতে পারে। মুক্ত অবিকারী ও বন্ধনহীন এই যে জীবাত্মা, এই যে মানবাত্মা, ইহাই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ; ইহারই জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই।

‘এই মানবাত্মা অজ, অমর, শাশ্বত ও সনাতন।’

৫. আত্মা, প্রকৃতি ও ঈশ্বর

আত্মা, প্রকৃতি ও ঈশ্বর

বেদান্ত দর্শনের মতে মানুষ যেন তিনটি পদার্থ দিয়া গড়া। একেবারে বাহিরে আছে দেহ, মানুষের স্থূলরূপ—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি সংবেদনের যন্ত্রসমূহ ইহাতেই রহিয়াছে। এই চক্ষু দৃষ্টির উৎস নয়, ইহা যন্ত্রমাত্র। ইহার অন্তরালে আছে প্রকৃত ইন্দ্রিয়। সেইরূপ বাহিরের কর্ণও শ্রবণের ইন্দ্রিয় নয়, যন্ত্র মাত্র। তাহার অন্তরালে আছে প্রকৃত ইন্দ্রিয়; আধুনিক শারীর-বিজ্ঞানে তাহাকেই বলে স্নায়ু-কেন্দ্র। সংস্কৃতে এগুলিকে বলে ইন্দ্রিয়। যে-কেন্দ্র চক্ষুকে পরিচালিত করে, তাহা যদি নষ্ট হয়, তাহা হইলে চক্ষু আর দেখিতে পায় না; সকল ইন্দ্রিয়-সম্পর্কেই ইহা সত্য। ইন্দ্রিয়গুলি আবার যতক্ষণ না আর একটি জিনিসের সহিত যুক্ত হয়, ততক্ষন তাহারা নিজে নিজে কোন বিষয়-সম্পর্কে অবহিত হইতে পারে না। সেই আর একটি জিনিস হইল মন। অনেক সময়েই তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ একটি বিশেষ চিন্তায় গভীরভাবে মগ্ন থাকা-কালে ঘড়ি বাজিলেও তাহা শুনিতে পাও না। কেন? কান তো ঠিকই ছিল, বায়ুর কম্পন তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল এবং মস্তিষ্কের ভিতরে নীতও হইয়াছিল, তথাপি শুনিতে পাও নাই, কারন মন সেই ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। বাহিরের বস্তুসমূহের ধারণা প্রথমে ইন্দ্রিয়ে নীত হয়; তারপর মন তাহার সহিত যুক্ত হইলে সেগুলিকে গ্রহণ করিয়া যেন একটি প্রলেপ লাগাইয়া দেয়, তাহাকেই বলে অহংকার— 'আমি'। মনে কর, আমি যখন একটা কাজে ব্যস্ত আছি, তখন একটি মশা আমার আঙুলে কামড় দিল। আমি সেটা বুঝিতে পারি না, কারণ আমার মন তখন অন্য কিছুর সঙ্গে যুক্ত ছিল। পরে ইন্দ্রিয়-প্রাপ্ত ধারণার সঙ্গে যখন আমার মন যুক্ত হয়, তখন একটি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সেই প্রতিক্রিয়ার ফলেই মশা-সম্পর্কে আমি সচেতন হই। কাজেই অঙ্গসমূহের সঙ্গে মনের যোগ হওয়াই যথেষ্ট নয়; ইচ্ছার আকারে প্রতিক্রিয়ারও উপস্থিতি প্রয়োজন। মনের যে-বৃত্তি হইতে এই প্রতিক্রিয়া আসে—এই যে জ্ঞান-বৃত্তি, ইহাকেই বলে 'বুদ্ধি'। প্রথমতঃ একটি বাহিরের যন্ত্র থাকা চাই, তারপর ইন্দ্রিয়, তারপর

ইন্দ্রিয়ের সহিত মন যুক্ত হওয়া চাই, তারপর চাই বুদ্ধির প্রতিক্রিয়া, এবং যখন এই সবগুলি সম্পূর্ণ হইবে, তৎক্ষণাৎ দেখা দিবে 'আমি এবং বহির্জাগতিক বস্তু'র ধারণা, দেখা দিবে—অনুভব বা প্রত্যয়-জ্ঞান। যে বহিরিন্দ্রিয়টি যন্ত্রমাত্র, তাহার অবস্থান দেহে; তারপর আছে সূক্ষ্মতর অন্তরিন্দ্রিয়, তারপর মন, তারপর বুদ্ধিবৃত্তি, তারপর অহংকার। অহংকার বলে : 'আমি'—আমি দেখি, আমি শুনি ইত্যাদি। সমগ্র কর্মধারাটি কয়েকটি শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। তাহাদের প্রাণশক্তি বলিতে পারো; সংস্কৃতে তাহাদের বলে 'প্রাণ'। মানুষের এই স্থূল অংশ, যাহাতে বহিরিন্দ্রয়সমূহ অবস্থিত, তাহাকে বলে স্থূল দেহ বা 'স্থূল শরীর'। তারপর আসে প্রথমে ইন্দ্রিয়, তারপর মন, বুদ্ধি, অহংকার। এই-সব এবং প্রাণশক্তিসমূহ মিলিয়া যে যৌগিক সত্তা গড়িয়া ওঠে, তাহাকে বলে সূক্ষ্ম দেহ বা সূক্ষ্ম শরীর। এই শক্তিসমূহ কতকগুলি সূক্ষ্ম পদার্থ দিয়া গঠিত: সেগুলি এত সূক্ষ্ম যে, স্থূল দেহের কোন ক্ষতিই সেগুলিকে ধ্বংস করিতে পারে না; দেহের সর্বপ্রকার আঘাতকে অতিক্রম করিয়া সেগুলি বাঁচিয়া থাকে। যে স্থূল শরীর আমরা দেখিতে পাই, তাহা স্থূল পদার্থ দিয়া গঠিত, কাজেই তাহা নিত্য নূতন হইতেছে, নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে। কিন্তু অন্তরিন্দ্রিয়সমূহ—মন বুদ্ধি ও অহংকার সূক্ষ্মতম পদার্থ দ্বারা গঠিত, কাজেই যুগ যুগ ধরিয়া তাহারা অক্ষুন্ন থাকিবে। সেগুলি এত সূক্ষ্ম যে, কোন কিছু দ্বারা তাহাদের বাধা দেওয়া যায় না; যে-কোন বাধাকে তাহারা অতিক্রম করিতে পারে। স্থূল দেহ যেমন অচেতন, সূক্ষ্মদেহও তাই, কারণ তাহাও সূক্ষ্ম পদার্থ দ্বারা গঠিত। যদিও তাহার এক অংশকে বলে মন, অপর অংশকে বুদ্ধি এবং তৃতীয় অংশকে অহংকার, তথাপি একদৃষ্টিতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, উহাদের কেহই 'জ্ঞাতা' হইতে পারে না। উহাদের কেহই অনুভবের কর্তা হইতে পারে না; সর্বকর্মের সাক্ষী বা সর্বকর্মের লক্ষ্যও হইতে পারে না। মন, বুদ্ধি বা অহংকারের সকল কর্মই এতদতিরিক্ত কাহারও জন্য হইতে বাধ্য। এই সব-কিছুই সূক্ষ্ম পদার্থ দ্বারা গঠিত বলিয়া কখনও স্বপ্রকাশ হইতে পারে না। এগুলির দীপ্তি নিজেদের ভিতরে থাকিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এই টেবিলটির প্রকাশ কোন বাহ্যবস্তুর দরুন হইতে পারে না। সুতরাং উহাদের সকলের পশ্চতে নিশ্চয় এমন একজন আছেন, যিনি প্রকৃত প্রকাশক, প্রকৃত দ্রষ্টা, প্রকৃত ভোক্তা; সংস্কৃতে তাঁহাকেই বলা হয় 'আত্মা'—

মানুষের আত্মা, মানুষের প্রকৃত স্বরূপ। তিনিই সব কিছু দেখেন। বাহিরের যন্ত্র ও ইন্দ্রিয়-সমূহ ধারণাগুলি সংগ্রহ করিয়া মনের কাছে প্রেরণ করে, মন প্রেরণ করে বুদ্ধির কাছে, বুদ্ধিতে সেগুলি আয়নার মতো প্রতিপলিত হয়; এবং তাহার পশ্চাতে আছেন আত্মা, যিনি সেগুলির উপর দৃষ্টিপাত করেন এবং তাহার আদেশ ও নির্দেশ দান করেন। এই-সব যন্ত্রের চালক তিনি, গৃহের কর্তা তিনি, দেহ-সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজা তিনি। অহংকারবৃত্তি, চিন্তা-বৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ইন্দ্রিয় ও যন্ত্রসমূহ, স্থূল দেহ—সকলেই তাঁহার আদেশ পালন করে। তিনিই এইসব-কিছুকে প্রকাশ করিতেছেন। তিনিই মানুষের আত্মা। বিশ্বের একটি ক্ষুদ্র অংশে যাহা আছে, সমগ্র বিশ্বেও তাহাই আছে। সামঞ্জস্য যদি এই বিশ্বের বিধান হয়, তাহা হইলে বিশ্বের প্রতিটি অংশ সামগ্রিকভাবে একই পরিকল্পনা অনুসারে নির্মিত হইবে। সুতরাং আমরা স্বভাবতই মনে করিতে পারি যে যাহাকে আমারা এই বিশ্ব বলি, তাহার স্থূল জড়রূপের অন্তরালে সূক্ষ্মতর উপাদানের একটি বিশ্ব নিশ্চয়ই আছে; তাহাকেই আমরা বলি মনন বা চিন্তা। আবার তাহারও অন্তরালে আছেন আত্মা—যিনি এই-সব চিন্তাকে সম্ভব করেন, যিনি আদেশ দেন, যিনি এই বিশ্ব-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রাজা। প্রতিটি মন এবং প্রতিটি দেহের অন্তরালে যে-আত্মা, তাহাকেই বলে প্রত্যগাত্মা—জীবাত্মা; আর বিশ্বের অন্তরালে অবস্থিত ইহার চালক শাসক ও নিয়ামকরূপী যে-আত্মা, তিনিই ঈশ্বর।

পরবর্তী বিবেচ্য বিষয় : এই-সব জিনিস কোথা হইতে আসিল? উত্তর—'আসিল' বলিতে কি বোঝায়? যদি ইহার এই অর্থ হয় যে, শূন্য হইতে কোন কিছু সৃষ্টি করা যায়, তবে তাহা অসম্ভব। এই সৃষ্টি—এই প্রকাশ কখনও শূন্য হইতে হয় না। কারণ না থাকিলে কোন কার্য হয় না; আর কার্য তো কারণেরই পুনঃপ্রকাশ। এই যে একটি গ্লাস। মনে কর—ইহাকে আমারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া ফেলিলাম, চূর্ণ করিলাম এবং রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে প্রায় ধ্বংস করিয়া ফেলিলাম। তাহা হইলে কি ইহা শূন্যে ফিরিয়া যাইবে? নিশ্চয়ই না। ইহার আকৃতিটিই ভাঙিবে, কিন্তু যে অণু-গুলি দ্বারা ইহা গঠিত, সেগুলি ঠিকই থাকিবে; সেগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাহিরে চলিয়া যাইবে বটে, কিন্তু থাকিবে; এবং ইহাও খুবই সম্ভব যে সেগুলি দ্বারা আর একটি গ্লাস নির্মিত হইবে। একটি ক্ষেত্রে

যদি এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে সব ক্ষেত্রেই ইহা সত্য হইবে। শূন্য হইতে কিছুই নির্মাণ করা যায় না। আবার কোন কিছুকে শূন্যে মিলাইয়াও দেওয়া যায় না। ইহা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে পারে, আবার স্থূল হইতে স্থূলতর হইতে পারে। বৃষ্টিবিন্দু সমুদ্র হইতে বাষ্পাকারে আসিয়া বাতাসের দ্বারা তাড়িত হইয়া পর্বতে যায়; সেখান হইতে আবার জল হইয়া শত শত মাইল প্রবাহিত হইয়া সমুদ্র-জননীর কাছেই ফিরিয়া আসে। বীজ হইতে বৃক্ষ জন্মলাভ করে। বৃক্ষটি মরিয়া যায়,রাখিয়া যায় শুধু বীজ। সেই বীজ আর একটি বৃক্ষ হইয়া দেখা দেয়, আবার বীজেই শেষ হইয়া যায়। এমনি করিয়াই চলে। একটি পাখিকে দেখ। ডিম হইতে জন্মিয়া কেমন সুন্দর একটি পাখি হয়। তারপর শুধু কতকগুলি ডিম রাখিয়া মরিয়া যায়; সেই ডিমে থাকে ভবিষ্যৎ পাখির জীবকোষ; ঠিক তেমনি জন্তুর বেলায়, মানুষের বেলায়। সব কিছুই যেন শুরু হয় কয়েকটি বীজ, কয়েকটি মূল, কয়েকটি সূক্ষ্ম আকার হইতে; যতই বাড়িতে থাকে, ততই স্থূল হইতে স্থূলতর হয়; তারপর আবার সেই সূক্ষ্মরূপে ফিরিয়া যায়, মিলিয়া যায়। সারা বিশ্বই এইভাবে চলিতেছে। এমন এক সময় আসে, যখন সমগ্র বিশ্ব সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হয়, অবশেষে যেন সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হইয়া যায়; তবু অতি সূক্ষ্ম বস্তুরূপে থাকিয়া যায়। আধুনিক বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্যে আমরা জানিয়াছি, এই পৃথিবী ক্রমশঃ শীতল হইতেছে এবং এক সময়ে অত্যন্ত শীতল হইয়া যাইবে। তারপর খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে হইতে শেষ পর্যন্ত পুনরায় ইথারে পরিণত হইবে। তথপি মূল উপাদান সবই থাকিবে এবং সেই মালমশলা হইতে আর একটি পৃথিবী বাহির হইয়া আসিবে। সেটিও আবার অদৃশ্য হইয়া যাইবে, এবং নতুন একটি দেখা দিবে। অতএব এই বিশ্বও ইহার মূল কারণে ফিরিয়া যাইবে; আবার তাহার উপাদানগুলি একত্র হইয়া একটি আকার ধারণ করিবে, ঠিক তরঙ্গ যেমন নীচে নামে, আবার উপরে ওঠে, এবং একটি আকার ধারণ করে। কারণে ফিরিয়া যাওয়া, আবার বাহির হইয়া আসা এবং রূপ পরিগ্রহ করাকেই সংস্কৃতে বলে ‘সংকোচ’ ও ‘বিকাশ’ অর্থাৎ সঙ্কুচিত হওয়া এবং প্রসারিত হওয়া। সমগ্র বিশ্ব যেন সঙ্কুচিত হয়, তারপর আবার প্রসারিত হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রচলিত ভাষায় বলিতে গেলে সব কিছুই ক্রমসঙ্কুচিত ও ক্রমবিকশিত হয়। তোমরা

বিবর্তনবাদ বা ক্রমবিকাশবাদের কথা শুনিয়াছ; শুনিয়াছ, কেমন করিয়া ক্রমাগত বাড়িতে বাড়িতে সব-কিছুই নিম্নতর রূপ হইতে গড়িয়া ওঠে। সে কথা খুবই ঠিক, কিন্তু প্রত্যেক বিবর্তনেরই একটি ক্রমসঙ্কুচিত পূর্বাবস্থা বা অনভিব্যক্ত অবস্থা আছে। আমরা জানি, এই বিশ্বে যে-শক্তির লীলা চলিতেছে, তাহার মোট পরিমাণ সব সময়েই এক, একটি জড়পরমাণুরও ধ্বংস নাই। কোন-মতেই তুমি এক বিন্দু পদার্থ কমাইতে পার না। এক বিন্দু শক্তিও তুমি হ্রাস করিতে পার না বা বৃদ্ধি করিতে পার না। মোট পরিমাণ সর্বদা একই থাকিবে। প্রকাশেই যাহা কিছু পার্থক্য—কখনও ক্রম-সঙ্কোচন, কখনও বিবর্তন। পূর্ব কল্পে যাহা অব্যক্ত হইয়াছিল , তাহা হইতেই এই কল্পের বিবর্তন; এই বর্তমান কল্প আবার অনভিব্যক্ত হইবে, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইবে, এবং তাহা হইতেই পরবর্তী কল্পের আবির্ভাব হইবে। সমগ্র বিশ্ব এই ভাবেই চলিয়াছে। কাজেই দেখা যাইতেছে, একেবারে শূন্য হইতে কোন কিছু গড়িয়া উঠিতেছে—এই অর্থে 'সৃষ্টি' বলিয়া কিছু নাই। বরং বলা চলে, সব কিছুরই বিকাশ বা অভিব্যক্তি হইতেছে, আর ঈশ্বর হইতেছেন বিশ্বের বিকাশ-কর্তা। এই বিশ্ব যেন তাঁহার ভিতর হইতে নিঃশ্বাসের মতো আসিতেছে, আবার তাঁহাতেই সঙ্কুচিত হইয়া মিশিয়া যাইতেছে; আবার তিনি ইহাকে বাহিরে নিক্ষেপ করিতেছেন। বেদে একটি চমৎকার উপমা আছে—'সেই শাশ্বত পুরুষ নিঃশ্বাসে এই বিশ্বকে প্রকট করিতেছেন এবং প্রশ্বাসে ইহাকে গ্রহণ করিতেছেন।' ঠিক যেমন একটি ধূলিকণা আমরা নিঃশ্বাসের সহিত বাহির ও প্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতে পারি। খুব ভাল কথা, কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে : প্রথম কল্পের বেলায় কি হইয়াছিল? ইহার উত্তর : 'প্রথম' বলিতে আমরা কি বুঝি? প্রথম কল্প বলিয়া কিছু ছিল না। সময়ের যদি আদি বলিয়া কিছু থাকে, তাহা হইলে সময়ের ধারণাই নষ্ট হইয়া যায়। সময় যেখানে শুরু হইয়াছিল, সেইরূপ একটি সীমানার কথা ভাবিতে চেষ্টা কর, দেখিবে সেই সীমানার ওপারে আরও সময়ের কথা তোমাকে ভাবিতে হইবে। স্থানের আরম্ভের কথা ভাবিতে চেষ্টা কর, দেখিবে তাহার আগেও স্থানের কথা তোমাকে ভাবিতে হইবে। স্থান এবং কাল—দুই-ই অসীম, তাহাদের আদিও নাই, অন্তও নাই। ঈশ্বর পাঁচ মিনিটে বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া ঘুমাইতে গেলেন এবং সেই সময় হইতে ঘুমাইয়াই আছেন—ইহার চেয়ে পূর্বোক্ত ধারণা অনেক ভাল। অপর

পক্ষে, এই ধারণাদ্বারা আমরা ঈশ্বরকে পাই শাশ্বত সৃষ্টি-কর্তারূপে। এখানে ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠিতেছে, পড়িতেছে; আর ঈশ্বর সেই শাশ্বত প্রবাহকে পরিচালিত করিতেছেন। এই বিশ্ব যেমন অনাদি এবং অনন্ত, ঈশ্বরও তাই। তাহাই হওয়া উচিত, কারণ আমরা যদি বলি যে, এমন এক সময় ছিল, যখন স্থূল কি সূক্ষ্ম কোন আকারেই কোন সৃষ্টি ছিল না। তাহা হইলে বলিতে হয় তখন কোন ঈশ্বরও ছিল না, কারণ ঈশ্বর আমাদের নিকট এই বিশ্বের সাক্ষিরূপেই বিদিত। কাজেই বিশ্ব যখন ছিল না, তখন তিনিও ছিলেন না। একটি ধারণা হইতেই অপরটি আসে। কার্যের ধারণা হইতেই আমরা কারণের ধারণা লাভ করি। কার্য যদি না থাকে, তাহা হইলে কারণও থাকিতে পারে না। কাজেই ইহা স্বভাবতই ধারণা করা যায়—বিশ্ব যেহেতু শাশ্বত, ঈশ্বরও শাশ্বত।

আত্মাও শাশ্বত। কেন? প্রথমত আমরা জানি—আত্মা জড় নয়। ইহা স্থূল শরীর নয়, অথবা আমরা যাহাকে মন বা চিন্তা বলি—সেরূপ কোন সূক্ষ্ম শরীরও নয়। ইহা ভৌতিক শরীর নয়, কিংবা খ্রীষ্টধর্মে যাহাকে 'আত্মিক দেহ' বলে, তাহাও নয়। স্থূল ও 'আত্মিক' শরীর দুইই পরিবর্তনশীল। স্থূল শরীর প্রায় প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তনশীল এবং মরণশীল, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর মানুষের মুক্তিলাভ পর্যন্ত দীর্ঘকাল বর্তমান থাকে, তারপর উহার শেষ হইয়া যায়। মানুষ যখন মুক্ত হয়, তখন তাহার আত্মিক শরীরও বিলীন হয়। যখনই একটি মানুষের মৃত্যু হয়, তখনই তাহার স্থূল শরীর পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়। আত্মা কোন অণুপরমাণুর দ্বারা গঠিত নয় বলিয়া অবিনশ্বর। ধ্বংস বলিতে আমরা কি বুঝি? যে-সব মূল উপাদান লইয়া একটি বস্তু গঠিত, তাহাদের বিভাজনই ধ্বংস। এই গ্লাসটি যদি নানা খণ্ডে ভাঙিয়া যায়, তাহা হইলে ইহার অংশগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে এবং তাহাতেই গ্লাসটি ধ্বংস হইবে। ধ্বংসের অর্থই অংশসমূহের বিভাজন। অতএব সহজেই বুঝা যাইতেছে—বিভিন্ন অংশদ্বারা গঠিত নয়, এমন কোন কিছুরই ধ্বংস হইতে পারে না, বিভাজন হয় না। আত্মা কোনরূপ উপাদানের সমবায়ে গঠিত নয়। ইহা অখণ্ড, এক; কাজেই ইহা অবিনশ্বর। সেই একই কারণে ইহা অনাদিও বটে। অতএব আত্মা অনাদি ও অনন্ত।

মোট তিনটি সত্তা আছে। প্রথমতঃ আছে, অসীম অথচ পরিবর্তশীল প্রকৃতি। সমগ্র প্রকৃতি অনাদি এবং অনন্ত, কিন্তু ইহার ভিতরে আছে বিবিধ পরিবর্তন। ইহা যেন সহস্র বৎসর যাবৎ সমুদ্রের অভিমুখে প্রবাহিত একটি নদীর মতো। একই নদী, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে তাহার পরিবর্তন ঘটিতেছে; জলকণাগুলি প্রতিনিয়তই তাহাদের স্থান পরিবর্তন করিতেছে। তারপর আছেন ঈশ্বর, অপরিবর্তনীয় শাস্তা। আর আছে আমাদের আত্মা, ঈশ্বরের মতোই অপরিবর্তনীয়, শাশ্বত; কিন্তু সেই শাস্তার অধীন। একজন প্রভু, অপরজন ভৃত্য; আর তৃতীয় পক্ষ হইল প্রকৃতি।

ঈশ্বর এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ; কার্যসংঘটনের জন্য কারণকে অবশ্যই উপস্থিত থাকিতে হইবে। শুধু তাই নয়, কারনই কার্যরূপে দেখা দেয়। নির্মাণকারী কর্তৃক ব্যবহৃত কিছু উপাদান ও কিছু শক্তির সাহায্যেই গ্লাস নির্মিত হয়। গ্লাসে আছে ঐ উপাদান এবং ঐ শক্তি। ব্যবহৃত শক্তিই সংলগ্ন থাকিবার সংহতি-শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। সেই শক্তির অভাব ঘটিলেই গ্লাসটি খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙিয়া যাইবে। উপাদানসমূহও নিঃসন্দেহে গ্লাসের মধ্যেই আছে। কেবলমাত্র তাহাদের আকারের পরিবর্তন হইয়াছে। কারণই কার্যরূপে পরিণত হইয়াছে। যেখানেই কার্য দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানেই বিশ্লেষণ করিলে কারণ পাওয়া যায়; কারণই নিজেকে কার্যরূপে প্রকাশ করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ঈশ্বর যদি এই বিশ্বের কারণ হন, এবং এই বিশ্ব যদি কার্য হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরই এই বিশ্বরূপে পরিণত হইয়াছেন। আত্মাসমূহ যদি কার্য হয় এবং ঈশ্বর যদি কারণ হন তাহা হইলে ঈশ্বরই আত্মা-রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। সুতরাং প্রতিটি আত্মাই ঈশ্বরের অংশ। ‘একই অগ্নি হইতে যেমন অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ বাহির হয়, ঠিক তেমনই সেই শাশ্বত-এক হইতেই বিশ্বের সকল আত্মা বাহির হইয়াছে।’ ১

আমরা দেখিলাম, শাশ্বত ঈশ্বর আছেন এবং শাশ্বত প্রকৃতিও আছে, আর আছে অসংখ্য শাশ্বত আত্মা। এই হইল ধর্মের প্রথম সোপান। ইহাকে বলে দ্বৈতবাদ। এই স্তরে মানুষ নিজেকে এবং ঈশ্বরকে অনন্তকাল ধরিয়া স্বতন্ত্রভাবে দেখে। এই স্তরে ঈশ্বর একটি স্বতন্ত্র সত্তা। ‘ মানুস একটি স্বতন্ত্রসত্তা , এবং প্রকৃতি একটি স্বতন্ত্র সত্তা। ইহাই হইল দ্বৈতবাদ।

এই মতে জ্ঞাতা কর্তা এবং জ্ঞেয় কর্ম পরস্পর-বিরোধী। মানুষ প্রকৃতির দিকে তাকাইয়া মনে করে, সে কর্তা আর প্রকৃতি কর্ম। কর্তা ও কর্মের দ্বৈতভাব সে নিরীক্ষণ করে। মানুষ যখন ঈশ্বরের দিকে তাকায়, তখন ঈশ্বরকে দেখে কর্মরূপে, আর নিজেকে দেখে কর্তারূপে। এই হইল মানুষ আর ঈশ্বরের মধ্যে দ্বৈতভাব। সাধারণভাবে ইহাই হইল ধর্মের প্রথম রূপ।

তারপর আসে আর একটি রূপ, যাহা এইমাত্র তোমাদের দেখাইলাম। মানুষ বুঝিতে আরম্ভ করে যে, ঈশ্বর যদি এই বিশ্বের কারণ হন, এবং এই বিশ্ব যদি কার্য হয়, তাহা হইলে স্বয়ং ঈশ্বরই তো এই বিশ্ব এবং আত্মাসমূহেরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, এবং মানুষ নিজেও পূর্ণ সত্তা ঈশ্বরের একটি অংশ মাত্র। আমরা ছোট ছোট জীব সেই অগ্নিকুণ্ডের স্ফুলিঙ্গ মাত্র; সমগ্র বিশ্ব স্বয়ং ঈশ্বরেরই প্রকাশ। ইহাই পরবর্তী সোপান। সংস্কৃতে ইহাকে বলে 'বিশিষ্টাদ্বৈত'। যেমন আমার এই শরীর আছে, এই শরীর আত্মাকে আচ্ছাদন করিয়া আছে, এই শরীরের ভিতরে আত্মা ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে, সেইরূপ অসংখ্য আত্মা ও প্রকৃতি-সমন্বিত এই সমগ্র বিশ্ব যেন ঈশ্বরের দেহস্বরূপ। ক্রমসঙ্কোচন বা অনভিব্যক্তির সময় যখন আসে, তখন এই বিশ্ব সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হয় বটে, তবু ঈশ্বরের দেহরূপেই থাকে। স্থূল প্রকাশ যখন শুরু হয়, তখনও বিশ্ব ঈশ্বরের দেহরূপেই থাকে। মানুষের আত্মা যেমন মানুষের দেহ ও মনের আত্মা, সেইরূপ ঈশ্বর আমাদের 'আত্মারও আত্মা'। আমাদের 'আত্মার আত্মা'—এই কথাটি তোমরা প্রত্যেক ধর্মেই শুনিয়াছ। ইহার অর্থ এই—তিনি যেন তাহাদের সকলের মধ্যে বাস করেন, তাহাদের পরিচালিত করেন, তাহাদের সকলকে শাসন করেন। দ্বৈতবাদীর প্রথম মতে—আমরা প্রত্যেকেই এক একটি ব্যক্তি, অনাদি কাল ধরিয়া ঈশ্বর ও প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র। দ্বিতীয় মতে—আমরা ব্যক্তি, কিন্তু ঈশ্বর হইতে পৃথক্ নই। আমরা যেন একই বস্তুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চরমান অংশ, আর ঈশ্বর হইলেন সমষ্টিবস্তু। ব্যক্তিহিসাবে আমরা স্বতন্ত্র। কিন্তু ঈশ্বরে আমরা এক। আমরা সকলে তাঁহাতেই আছি। আমরা সকলে তাঁহারই অংশ, সুতরাং আমরা এক। তথাপি মানুষে মানুষে, মানুষে ও ঈশ্বরে একটি কঠোর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আছে—স্বতন্ত্র, তবু স্বতন্ত্র নয়।

তারপর আসে একটি আরও সূক্ষ্মতর প্রশ্ন। প্রশ্নটি হইল : অসীমের কি অংশ থাকিতে পারে? অসীমের অংশ বলিতে কি বোঝায়? যদি বিচার করিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে–ইহা অসম্ভব। অসীমকে কখনও ভাগ করা যায় না, উহা সর্বদাই অসীম। অসীমকে যদি ভাগ করা যাইত, তাহা হইলে প্রতিটি অংশই অসীম হইত; অথচ অসীম কখনও দুইটি থাকিতে পারে না। ধর যদি দুইটি থাকিত, তাহা হইলে একটি অপরটিকে সীমাবদ্ধ করিত, এবং উভয়ই সসীম হইয়া যাইত। কাজেই আমাদের সিদ্ধান্ত হইল–অসীম এক, বহু নয়; একই অসীম আত্মা হাজার হাজার দর্পণে নিজেকে প্রতিবিম্বিত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন আত্মা-রূপে প্রতিভাত হইতেছে। এই বিশ্বের পটভূমি সেই অসীম আত্মাকেই আমরা বলি 'ঈশ্বর'। মানব মনের পটভূমি সেই একই অসীম আত্মাকেই আমরা বলি 'মানবাত্মা' ।

৬. প্রকৃতি ও মানুষ

প্রকৃতি ও মানুষ

বিশ্বজগতের যেটুকু অংশে ভৌতিক স্তরে অভিব্যক্ত, শুধু সেইটুকুই প্রকৃতি-সম্বন্ধে আধুনিক ধারণার অন্তর্গত। মন বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায়, তাহা প্রকৃতিরূপে বিবেচিত হয় না।

ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা প্রতিপন্ন করিতে গিয়া দার্শনিকগণ মনকে প্রকৃতি হইতে বাদ দিয়া থাকিবেন, কারণ প্রকৃতি নিয়মের—কঠোর অনমনীয় নিয়মের শাসনে আবদ্ধ, প্রকৃতির অন্তর্গত বিবেচিত হইলে মনও নিয়মের অধীন হইয়া পড়িবে। ফলে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির মতবাদ দাঁড়াইতে পারিবে না; কেন না যাহা কোন নিয়মের অধীন, তাহা কিরূপে স্বাধীন বা স্বতন্ত্র হইতে পারে?

যুক্তি ও তথ্যের উপর দণ্ডায়মান ভারতীয় দার্শনিকগণের দৃষ্টিভঙ্গী এ-বিষয়ে বিপরীত। তাঁহাদের মতে—ব্যক্ত অথবা অব্যক্ত সমগ্র বাস্তব জীবনই নিয়মের অধীন। তাঁহাদের মতে : মনও বাহ্য প্রকৃতি, দুই-ই নিয়মের—একই নিয়মের অধীন। মন যদি নিয়মের অধীন না হয়, আমরা এখন যাহা চিন্তা করিতেছি, তাহা যদি পূর্ব চিন্তার অনিবার্য ফলস্বরূপ না হয়, যদি একটি মানসিক অবস্থা আর একটি মানসিক অবস্থার অনুসরণ না করে, তবে মনকে অযৌক্তিক বলিতে হইবে। এমন কে আছে, যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি স্বীকার করিয়া যুক্তির ক্রিয়া অস্বীকার করিতে পারে? অপর পক্ষে মন কার্য-কারণ নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, ইহা স্বীকার করিয়া কে বলিতে পারে যে, ইচ্ছাশক্তি স্বাধীন?

নিয়মই কার্য-কারণের ক্রিয়া। পূর্ববর্তী কতকগুলি ঘটনার অনুযায়ী হইয়া পরবর্তী কতকগুলি ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। প্রতিটি পূর্বগামী ঘটনার বা কারণের অনুবর্তী কার্য আছে। প্রকৃতি এইরূপেই চলিয়াছে। এই নিয়মের শাসন যদি মনের স্তরেও চালু থাকে, তাহা হইলে মন বদ্ধ—স্বাধীন নয়। না, ইচ্ছাশক্তিও স্বাধীন নয়। ইহা কিরূপে সম্ভব? কিন্তু আমরা

সকলেই জানি, অনুভব করি যে, আমরা স্বাধীন। স্বাধীন না হইলে আমাদের জীবনের কোন অর্থ থাকে না, জীবনযাপন বৃথা হইয়া যায়।

প্রাচ্যদেশীয় দার্শনিকগণ এই মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন, বা বলা যায়—উদ্ভাবন করিয়াছেন যে, মন এবং ইচ্ছাশক্তি দেশকালনিমিত্তের দ্বারা তথা- কথিত জড়বস্তুর মতোই বদ্ধ; সুতরাং উহারা কার্যকারণের নিয়মে শাসিত। আমরা কালের মধ্যে চিন্তা করি, আমাদের চিন্তাগুলি কালের দ্বারা সীমিত; যাহা কিছুর অস্তিত্ব আছে, সে সব কিছুই দেশে ও কালে বর্তমান। সব কিছুই কার্য-কারণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

যাহাকে আমরা জড়পদার্থ বলি, এবং মন—এ দুইই একই উপাদানে গঠিত। প্রভেদ কেবল কম্পনের তারতম্যে। মনের অতি নিম্নগ্রামের স্পন্দনকেই আমরা জড়বস্তু বলিয়া জানি। আবার জড়পদার্থের দ্রুত স্পন্দনকে আমরা মন বলিয়া জানি। উভয়ের উপাদান একই। অতএব জড়পদার্থ এবং দেশকালনিমিত্তের দ্বারা সীমিত বলিয়া জড়ের দ্রুত স্পন্দন মনও একই নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ।

প্রকৃতির উপাদান সর্বত্র সমজাতীয়। প্রভেদ কেবল বিকাশের তারতম্যে। এই বিশ্বপ্রপঞ্চের সংস্কৃত প্রতিশব্দ হইল 'প্রকৃতি' এবং ইহার আক্ষরিক অর্থ 'প্রভেদ'। সবই এক উপাদান, কিন্তু ইহা বিচিত্ররূপে অভিব্যক্ত।

মন জড়ে রূপান্তরিত হয়, আবার জড়ও মনে রূপান্তরিত হয়, ইহা শুধু কম্পনের তারতম্য।

একটি ইস্পাতের দণ্ড লও, উহাকে কম্পিত করিতে পারে—এইরূপ একটি শক্তি ইহাতে প্রয়োগ কর; তারপর কি ঘটিবে? যদি একটি অন্ধকার ঘরে এই পরীক্ষাটি করা হয়, তবে প্রথমে তুমি শুনিতে পাইবে একটি শব্দ—একটি গুনগুন শব্দ। শক্তিপ্রবাহ বর্ধিত কর, দেখিবে ইস্পাতের দণ্ডটি আলোকময় হইয়া উঠিয়াছে। শক্তি আরও বর্ধিত কর, ইস্পাতের দণ্ডটি আলোকময় হইয়া উঠিয়াছে। শক্তি আরও বর্ধিত কর, ইস্পাত-দণ্ডটি একেবারে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। উহা মনে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে।

আর একটি উদাহরণ লও : দশদিন আহার না করিলে আমি কোনপ্রকার চিন্তা করিতে পারি না। শুধু কয়েকটি এলোমেলো চিন্তা আমার মনে থাকিবে। আমি অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িব এবং সম্ভবতঃ আমার নামও ভুলিয়া যাইব। তারপর কিছু খাদ্য গ্রহণ করিলাম এবং কিছুক্ষণের মধ্যে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিব; আমার মনের শক্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। খাদ্যই মনে রূপান্তরিত হইয়াছে। তেমনি স্পন্দনের গতিবেগ কমাইয়া মন দেহে অভিব্যক্ত হয়, জড়ে পরিণত হয়।

জড় ও মন—এ দুইটির কোনটি প্রথম? একটি উদাহরণসহ বুঝাইতেছি—একটি মুরগী ডিম পাড়িল, ডিমটি হইতে আর একটি মুরগীর জন্ম হইল; মুরগীটি আর একটি ডিম পাড়িল; ডিমটি হইতে আবার আর একটি মুরগী জন্মিল; অনন্ত কার্যকারণ-পরম্পরা এইরূপ চলিতে থাকিবে। এখন কোন্‌টি প্রথম—ডিম, না মুরগী? এমন কোন ডিমের কথা কল্পনা করিতে পার না, যাহা কোন মুরগী হইতে জন্মে নাই; অথবা এমন কোন মুরগীর বিষয় চিন্তা করিতে পার না, যাহা ডিম হইতে ফুটে নাই। যেটিই প্রথম হউক না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। আমাদের প্রায় সব চিন্তাধারাই এই ডিম ও মুরগীর ব্যাপারের মতো১।

মহত্তম সত্যগুলি অত্যন্ত সরল বলিয়াই বিস্মৃতির গর্ভে চলিয়া যায়। মহৎ সত্যগুলি সহজ, কেন না এগুলির প্রয়োগ সার্বকালিক। সত্য নিজেই সর্বদা সহজ ও সরল। যাহা কিছু জটিল, তাহা কেবল মানুষের অজ্ঞতার জন্য।

মানুষের স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব মনেতে নাই, কেন না মন বদ্ধ। সেখানে কোন স্বাধীনতা নাই। মানুষ মন নয়, আত্মা। এই আত্মা সর্বদা মুক্ত, সীমাহীন ও চিরন্তন। এইখানেই—এই আত্মাতেই মানুষের মুক্তভাব। আত্মা সর্বদাই মুক্ত; কিন্তু মন উহার ক্ষণস্থায়ী তরঙ্গগুলির সঙ্গে নিজেকে এক মনে করিয়া আত্মাকে দেখিতে পায় না এবং দেশকালনিমিত্ত-রূপ গোলকধাঁধায়—মায়ায় নিজেকে হারাইয়া ফেলে।

ইহাই আমাদের বন্ধনের কারণ। আমরা সর্বদা মন এবং মনের অদ্ভুত পরিবর্তনগুলির সঙ্গে নিজেদের এক ভাবিতেছি।

মানুষের স্বতন্ত্রভাব আত্মাতেই অবস্থিত এবং নিজেকে মুক্ত উপলব্ধি করিয়া—মনের বন্ধন সত্ত্বেও সর্বদা ঘোষণা করিতেছে : আমি মুক্ত! আমি যা, আমি তাই; আমি সেই। ইহাই আমাদের মুক্তি। সদামুক্ত সীমাহীন চিরন্তন আত্মা যুগে যুগে তাঁহার মন-রূপ যন্ত্রের মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে অধিকতর ব্যক্ত হইতেছেন।

তাহা হইলে মানুষের সহিত প্রকৃতির সম্পর্ক কি? জীবের নিম্নতম বিকাশ হইতে মানব পর্যন্ত—সর্বত্রই প্রকৃতির মধ্য দিয়া আত্মা বিকশিত হইতেছেন। নিম্নতম অভিব্যক্ত জীবনের মধ্যেও আত্মার শ্রেষ্ঠ বিকাশ নিহিত আছে, ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মা নিজের বিকাশ সাধন করিতেছেন।

বিবর্তনের সমগ্র প্রক্রিয়াই আত্মার নিজেকে ব্যক্ত করিবার সংগ্রাম। ইহা প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম। প্রকৃতির অনুযায়ী কাজ করিয়া নয়, তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াই মানুষ আজ বর্তমান অবস্থা লাভ করিয়াছে। প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া জীবনধারণ করা, প্রকৃতির সঙ্গে একতানতা রক্ষা করা প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু কথাই আমরা শুনিয়া থাকি। এরূপ ধারণা ভ্রম। এই টেবিলটি, এই জলের কুঁজাটি, এই খনিজ পদার্থগুলি, ঐ বৃক্ষ—ইহারা সকলেই প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতেছে। সেখানে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান—কোন বিরোধ নাই। প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের অর্থ নিশ্চেষ্টতা, মৃত্যু। মানুষ এই গৃহ কিরূপে নির্মাণ করিয়াছে—প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া? না, প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়াই ইহা নির্মিত হইয়াছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামের পথেই মানুষের উন্নতি, প্রকৃতির অনুগত হইয়া নয়।

৭. আত্মা-ইহার স্বরুপ ও লক্ষ্য

আত্মা—ইহার স্বরূপ ও লক্ষ্য

প্রাচীনতম ধারণা এই যে, মানুষের মৃত্যু হইলে সে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। মৃত্যুর পরও একটা সত্তা অবশিষ্ট থাকে এবং তাহাই বাঁচিয়া থাকে। মিশরীয়, ব্যবিলনীয় এবং প্রাচীন হিন্দু—সম্ভবতঃ পৃথিবীর প্রাচীনতম তিনটি জাতির মধ্যে তুলনা করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে এই ধারণাটি গ্রহণ করা সমীচীন হইবে। মিশরীয় এবং ব্যাবিলনীয়দিগের মধ্যে একটি আত্মা-বিষয়ক ধারণা—একটি যুগ্ম-সত্তার ধারণা দেখিতে পাই। তাহাদের মতে এই দেহের অভ্যন্তরে অপর একটি দেহ বর্তমান, যাহা এখানে বিচরণ করিয়া কর্মাদি সম্পাদন করিতেছে। যখন বাহ্যদেহটির মৃত্যু হয়, তখন ঐ দ্বিতীয় দেহটি বাহিরে আসে এবং কিছুকাল বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু এই দ্বিতীয় দেহটির জীবনকাল বাহ্যদেহটির সংরক্ষণের উপর নির্ভর করে। প্রথম দেহটির কোন অঙ্গ আহত হইলে দ্বিতীয়টিরও সেই অঙ্গ সমভাবে আহত হইবে। এই কারণেই প্রাচীন মিশরীয়দিগের মধ্যে মৃতব্যক্তির দেহকে সুগন্ধ আরক প্রভৃতি দ্বারা সুবাসিত করিয়া, পিরামিড প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া সংরক্ষণ করিবার আগ্রহ দেখিতে পাই। আমরা দেখিতেছি যে, ব্যাবিলনীয় এবং প্রাচীন মিশরীয়দিগের মতে—এই দ্বিতীয় দেহটি অনন্তকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে না; বড় জোর ইহা কিছুকাল থাকিতে পারে, অর্থাৎ পরিত্যক্ত বাহ্যদেহটি যতদিন সংরক্ষিত হয় ততদিন।

পরবর্তী বৈশিষ্ট্যটি এই যে, এই দ্বিতীয়দেহ-সম্বন্ধীয় ধারণার সঙ্গে একটি ভয়ের ভাব মিশ্রিত রহিয়াছে। ইহা সর্বদাই অসুখী এবং দুর্দশাগ্রস্ত। তীব্রতম যন্ত্রণা সহ্য করিয়া ইহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়। যাহারা জীবিত, তাহাদের নিকট সে পুনঃপুনঃ ফিরিয়া আসে এবং খাদ্য, পানীয় ও ভোগ্য বস্তুসমূহ, যেগুলি সে এখন পাইতেছে না, সেগুলি পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করে। নীলনদের স্বচ্ছ জল, যাহা সে এখন পান করিতে পারে না, তাহা পান করিতে চায়। জীবিত থাকিতে যে-সব দ্রব্য সে ভোগ করিত, সেগুলি পাইবার আকাঙ্ক্ষা করে। যখন

দেখে, সে এইগুলি পাইবে না, তখন অত্যন্ত হিংস্র হইয়া উঠে এবং সময়ে সময়ে ঐ-সকল খাদ্য না পাইলে জীবিত ব্যক্তিদের জীবন বিপন্ন করিয়া তোলে।

আর্যগণের চিন্তাধারা আলোচনা করিলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ইহার একটি বিশেষ ব্যতিক্রম লক্ষ্য করি। এখানেও একটি দ্বিতীয় দেহের ধারণা রহিয়াছে; কিন্তু ঐটি একপ্রকার অধ্যাত্ম দেহ। অপর একটি বড় প্রভেদ এই যে, এই অধ্যাত্ম দেহ বা আত্মা বা যাহাই আমরা বলি না কেন, এইটির জীবনকাল পরিত্যক্ত দেহ দ্বারা বদ্ধ নয়। বরং আত্মা পূর্বদেহের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে বলিয়াই মৃতদেহ দাহ করিবার অপূর্ব পদ্ধতিটি আর্যদের মধ্যে বর্তমান। মৃত্যের পরিত্যক্ত দেহ হইতে তাহারা অব্যহতি পাইতে চায়, আর মিশরীয়গণ এই দেহকে সুগন্ধ আরক দ্বারা সুবাসিত করিয়া, কবরে প্রোথিত করিয়া পিরামিড প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া উহাকে সংরক্ষিত করিতে চায়। মৃতের দেহকে বিনষ্ট করিয়া দেওয়ার এই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রথা ছাড়াও কতকটা উন্নত জাতিগুলির মধ্যে মৃতদেহ বিনষ্ট করিবার যে রীতি দেখা যায়, তাহা দ্বারা বেশ প্রমাণিত হয় যে, উহাদের মধ্যে আত্মার ধারণাটি বর্তমান। যেখানেই দেহবিযুক্ত আত্মার ধারণাটি দেহের ধারণার সহিত যুক্ত, সেখানেই আমারা মৃতদেহ সংরক্ষিত করিবার এবং যে-কোন ভাবে ইহাকে প্রোথিত করিবার আগ্রহ লক্ষ্য করি। অপর পক্ষে যাহাদের মধ্যে এই ধারণা পরিস্ফুট হইয়াছে যে, আত্মা দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং মৃতদেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও আত্মা আহত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, তাহাদের মধ্যেই মৃতদেহকে দাহ করিবার রীতি অবলম্বিত হইয়াছে। তাই আমারা প্রাচীন আর্যজাতির মধ্যে এই মৃতদেহ দাহ করিবার প্রথা দেখিতে পাই, যদিও পারসীকরা অবশ্য এই প্রথাকে পরিবর্তন করিয়া একটি উচ্চস্থানে অনাবৃতভাবে মৃতদেহ রাখিবার প্রথা অনুসরণ করে। কিন্তু এই উচ্চস্থান বা দখ্‌ম(dakhma)-নামের অর্থ দাহ করিবার স্থান; ইহা দ্বারা প্রতীত হয় যে, প্রাচীনকালে তাহারাও মৃতদেহ পোড়াইত। আর্যজাতির অপর একটি বিশেষত্ব এই যে, তাহাদের এই দ্বিতীয়-দেহগুলির ধারণার সঙ্গে কোন ভীতির ভাব জড়িত ছিল না। দ্বিতীয়-দেহগুলি খাদ্য বা সাহায্যের জন্য এই পৃথিবীতে নামিয়া আসে না, বা ঐ সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইলে হিংস্রও হয় না, অথবা জীবিত ব্যক্তি-গণের জীবন বিপন্ন করিতেও প্রয়াসী হয় না।; উহারা বরং আনন্দিত–দেহ-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ

করিয়া আহ্লাদিত। চিতাগ্নি বিশ্লিষ্ট হইয়া যাওয়ার প্রতীক। দেহমুক্ত আত্মাকে ধীরে পিতৃপুরুষগণের নিকট–যেখানে দুঃখ নাই, যেখানে চির আনন্দ বিরাজিত–সেইখানে ধীরে বহন করিয়া লইবার জন্য এই চিতাগ্নির উদ্দেশে বলা হইয়া থাকে।

এই দুইটি ভাবধারা লক্ষ্য করিলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারি, দুটি ভাব স্বরূপতঃ এক–প্রাথমিকভাবে একটি আশাবাদী, অপরটি নৈরাশ্যবাদী; একটি অপরটির বিবর্তন মাত্র। ইহা খুবই সম্ভব যে, অতি প্রাচীন কালে মিশরীয়দের ন্যায় আর্যগণও এই ভাবধারা পোষণ করিতেন। তাঁহাদের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিলে আমরা এই কথার সম্ভাব্যতা বুঝিতে পারি। কিন্তু ভাবটি যথার্থই সুন্দর এবং অপূর্ব। যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তখন এই আত্মা পিতৃপুরুষগণের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদের সহিত সুখৈশ্বর্য সম্ভোগ করে। পিতৃপুরুষগণ আত্মাকে অত্যন্ত করুণাপূর্ণভাবে গ্রহণ করেন। আত্মা সম্বন্ধে ভারতের প্রাচীন ধারণা হইল এই। পরবর্তীকালে এই ভাবটি উন্নত হইতে উন্নত পর্যায়ে গিয়া পৌঁছিয়াছে। তখন দেখা গেল, তাঁহারা যাহাকে 'আত্মা' বলিয়া অভিহিত করেন, তাহা বস্তুতঃ আত্মা নয়। এই জ্যোতির্ময় দেহ, সূক্ষ্ম দেহ–যত সূক্ষ্মই হউক না কেন, বস্তুতঃ দেহমাত্র, এবং সূক্ষ্ম বা স্থূল সকল দেহই কোন না কোন উপাদানের দ্বারা গঠিত। যাহা কিছু কোনপ্রকার অবয়ববিশিষ্ট, তাহা অবশ্যই সীমিত, তাহা কখনই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। যাহা অবয়ববিষিষ্ট, তাহাই পরিবর্তনশীল, আর যাহা পরিবর্তনশীল তাহা কিরূপে নিত্য হইতে পারে? সুতরাং এই জ্যোতির্ময় দেহের পশ্চাতে তাঁহারা যেন একটি সত্তাকে অনুভব করিয়াছেন, যাহাকে মানুষের আত্মা-নামে অভিহিত করা যায়। ইহাকেই 'আত্মা' বা 'জীবাত্মা' বলা হইয়া থাকে। আত্মা-সম্বন্ধীয় ধারণা এইখানেই আরম্ভ হইল, এইটিকেও অবশ্য বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছে। কেহ চিন্তা করিলেন, এই জীবাত্মা নিত্য; কেহ ভাবিয়াছেন, ইহা অতিসূক্ষ্ম, প্রায় এক-একটি অণুর মতো সূক্ষ্ম; ইহা শরীরের একটি বিশেষ অংশে বাস করে এবং যখন একজন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার জীবাত্মা জ্যোতির্ময় দেহকে সঙ্গে লইয়া অন্তর্হিত হয়। আবার অন্য একদল লোক আছেন–যাঁহারা স্বীকার করেন না, জীবাত্মা আণবিক প্রকৃতিবিশিষ্ঠ ; জ্যোর্তিময় দেহ

জীবাত্মা নয় , এ-কথা বলিতে গিয়া তাঁহারা যে যুক্তি দেন , জেবাত্মার আনতিক প্রকৃতি অস্বীকার করিতে গিয়াও তাঁহারা সেই একই-যুক্তি প্রদর্শন করেন।

এই-সব বিভিন্ন মতবাদ হইতে সাংখ্যদর্শনের উদ্ভব হইয়াছে এবং সেখানে আমরা প্রভূত প্রভেদ দেখিতে পাই। সাংখ্যদর্শনের প্রতিপাদ্য ভাব এই : মানুষের প্রথমতঃ একটি স্থূলদেহ আছে; স্থূলদেহের পশ্চাতে রহিয়াছে সূক্ষ্মদেহ, তাহা যেন মনের বাহক এবং ইহারও পশ্চাতে রহিয়াছে আত্মা বা সাংখ্যমতে 'মনের জ্ঞাতা' এবং তাহা সর্বত্র বিচরণশীল। অর্থাৎ তোমার আত্মা, আমার আত্মা এবং প্রত্যেকের আত্মা একইকালে সর্বত্র বিরাজিত। আত্মা যদি নিরবয়ব হয়, তবে কিরূপে বলা যায় যে তাহা 'দেশে' বদ্ধ হইবে? কেন না, যাহা স্থান অধিকার করে, তাহারই অবয়ব রহিয়াছে; যাহা নিরবয়ব, তাহাই অনন্ত হইতে পারে; সুতরাং প্রত্যেক আত্মাই সর্বব্যাপী। এই বিষয়ে দ্বিতীয় মতবাদটি আরও চমকপ্রদ। প্রাচীনকালে তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, সব মানুষই প্রগতিশীল–অন্ততঃ তাহাদের মধ্যে অনেকে। তাহারা পবিত্রতা, শক্তি এবং জ্ঞানের পথে বর্ধিত। প্রশ্ন হইল–এই জ্ঞান, এই পবিত্রতা এবং এই শক্তি মানুষের মধ্যে কোথা হইতে বিকশিত হইয়াছে? একটি শিশুর কোন জ্ঞান নাই। এই শিশুটি বড় হইয়া শক্তিমান্, ক্ষমতাপন্ন বিজ্ঞ ব্যক্তিতে পরিণত হয়। কোথা হইতে এই শিশুটি তাহার জ্ঞান ও শক্তির উৎসের সন্ধান পাইল? উত্তর–ঐ জ্ঞান ও শক্তি তাহার মধ্যেই ছিল; শিশুর আত্মার মধ্যেই তাহার জ্ঞান, তাহার শক্তি প্রথমাবধি বর্তমান। এই শক্তি, এই পবিত্রতা এবং এই ক্ষমতা তাহার আত্মাতে ছিল, অবিকশিত অবস্থায় ছিল; তাহাই এখন বিকশিত। এই বিকশিত এবং অবিকাশিত অবস্থা বলিতে আমরা কি বুঝি? সাংখ্যবাদীরা বলেনঃ প্রত্যেক আত্মাই পবিত্র, পূর্ণ, সর্বশক্তিমান্ এবং সর্বজ্ঞ; কিন্তু ইহা যেরূপ মনের মধ্য দিয়া প্রতিফলিত হয়, সেইরূপেই বিকশিত হইতে পারে। মন যেন আত্মার প্রতিফলনের একটি আয়না মাত্র। আমার মন আমার শক্তির কিয়দংশ যেমন প্রতিফলিত করিতে পারে, তেমনি তোমার এবং অপরের আত্মাও করিতেছে। যে আয়না যত বেশী স্বচ্ছ, তাহাতে আত্মা তত বেশী সুন্দরভাবে প্রতিবিম্বিত হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি যেরূপ মনের অধিকারী, তাহার আত্মিক বিকাশও তেমনি হইয়া থাকে। কিন্তু সকল আত্মাই পবিত্র এবং পূর্ণ।

আবার এক সম্প্রদায় মনে করিলেন, এইরূপ হওয়া সম্ভব নয়। যদিও আত্মা স্বভাবতই পবিত্র ও পূর্ণ, এই পবিত্রতা ও পূর্ণত্ব সময় সময় যেন সঙ্কুচিত হয়, আবার সময় সময় যেন প্রসারিত হইয়া থাকে। কতকগুলি কাজ এবং চিন্তা যেন আত্মার প্রকৃতিকে সঙ্কুচিত করে, আবার কতকগুলি কাজ এবং চিন্তা যেন তাহার স্বভাবকে পরিস্ফুট ও বিকশিত করে। এই বিষয়টি আরও পরিষ্কাররূপে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। যে-সব চিন্তা ও কার্য আত্মার পবিত্রতা ও শক্তি সঙ্কুচিত করে, সেগুলি অশুভ; যে-সব চিন্তা ও কার্য আত্মার শক্তিকে পরিস্ফুট করে, সেইগুলি শুভ। দুইটি মতবাদের মধ্যে প্রভেদ অতি সামান্য। 'সঙ্কোচন' এবং 'প্রসারণ'—এই দুইটি শব্দের ব্যাখ্যার উপরই ইহা নির্ভর করিতেছে। যে-মতে আত্মার যন্ত্র-স্বরূপ মনের গঠনের উপরেই আত্মার বিকাশের তারতম্য নির্ভর করে, সেই মতটি নিঃসন্দেহে স্পষ্টতর বলা যাইতে পারে। কিন্তু সঙ্কোচন এবং প্রসারণ-মতবাদী এই দুইটি শব্দের আশ্রয় লইতে চায়। তাহাদের নিকট প্রশ্ন করা কর্তব্য, আত্মার সঙ্কোচন এবং প্রসারণ বলিতে তাহারা কি বুঝিয়া থাকে? আত্মা চেতন বস্তু। প্রশ্ন করিতে পারো, স্থূল জড়পদার্থ বা সূক্ষ্ম চেতনবস্তু মন-সম্পর্কে সঙ্কোচন ও প্রসারণ বলিতে কি বুঝায়? কিন্তু ইহা ছাড়া যাহা জড় নয়, যাহা দেশ-কালের অতীত, তাহার সম্বন্ধে এই সঙ্কোচন ও প্রসারণ শব্দ-দুইটি কিরূপে প্রযুক্ত হইবে? সুতরাং মনে হয়, যে-মতবাদে আত্মা সর্বদাই পবিত্র ও পূর্ণ, শুধু মানসিক গঠনের তারতম্য অনুসারে আত্মার প্রতিফলনের তারতম্য ঘটে, সেই মতই অপেক্ষাকৃত ভাল। মনের পরিবর্তনের সঙ্গে ইহার স্বভাবও যেন ক্রমশঃ আরও শুদ্ধ হইতে থাকে এবং আত্মার বিকাশও উন্নততর হয়। যতদিন না মন শুদ্ধ হয়—তাহাতে আত্মার অন্তর্নিহিত সব গুণই পূর্ণবিকশিত না হয়, ততদিন এরূপ চলিতে থাকে; তারপর আত্মা মুক্ত হয়।

আত্মার প্রকৃতিই এই। কিন্তু চরম লক্ষ্য কি? ভারতের বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মার লক্ষ্য এক বলিয়াই প্রতীত হয়। সকলেরই মূল-ভাবটি এক—মুক্তি। মানুষ অনন্ত, এবং বর্তমানে যে বদ্ধ অবস্থায় সে আছে, ইহা তাহার স্বভাব নয়। কিন্তু এই বিভিন্ন বদ্ধ অবস্থার মধ্য দিয়াই আত্মা ক্রমশঃ মুক্তির পথে অগ্রসর হইবার প্রাণপন চেষ্টা করিতেছে

এবং যতদিন না আত্মা স্বাধিকার—সেই অসীম, অনন্ত, মুক্ত স্বভাব—লাভ করিতেছে, ততদিন সে নিরস্ত হইবে না। আমরা আমাদের চতুর্দিকে যে-সব সংযোগ, পুনঃসংযোগ এবং বিকাশ দেখিতে পাইতেছি, সেগুলি উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নয়—পথের ক্ষণিক ঘটনা মাত্র। পৃথিবী সূর্য, চন্দ্র নক্ষত্র, শুভ অশুভ, হাসি কান্না, আনন্দ ও দুঃখ প্রভৃতি সংযোগ আমাদিগকে অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করে এবং অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়াই আত্মা সব বন্ধন ছিন্ন করিয়া নিজ পূর্ণ স্বরূপ প্রকাশ করে। আত্মা তখন অন্তঃ- ও বহিঃ-প্রকৃতির কোন নিয়মের দ্বারাই বদ্ধ হয় না। আত্মা তখন সব বন্ধন, সব নিয়ম ও সমগ্র প্রকৃতির ঊর্ধ্বে চলিয়া গিয়াছে। প্রকৃতি তখন আত্মার অধীন হইয়া পড়ে; আত্মা প্রকৃতির অধীন হয় না, এখন যেমন অধীন বলিয়া মনে হইতেছে। ইহাই আত্মার একমাত্র লক্ষ্য। যে অভিজ্ঞতা-পরম্পরার মধ্য দিয়া আত্মা বিকশিত হইতেছে, তাহার লক্ষ্য—মুক্তি লাভ। অভিজ্ঞতাগুলি আত্মার জন্ম ও জীবন বলিয়া প্রতিভাত হয়। আত্মা যেন একটি নিম্নতর দেহ ধারণ করে এবং উহার মধ্য দিয়া আত্ম-প্রকাশের চেষ্টা করিতেছে। আত্মা নিম্নতর দেহটি অপর্যাপ্ত মনে করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতেছে এবং একটি উন্নত ধরণের দেহ গ্রহণ করিতেছে। এটিকেও অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করে এবং উন্নততর দেহ ধারণ করে, অবশেষে আত্মা এমন একটি শরীরের সন্ধান পাইবে, যাহার সাহায্যে তাহার উচ্চতম আকাঙ্ক্ষা বিকশিত হইবে। তখনই আত্মা মুক্তি লাভ করিবে।

এখন প্রশ্ন এই, আত্মা যদি অনন্ত ও সর্বব্যাপী হয়, আত্মা যদি সূক্ষ্ম চেতন বস্তু হয়, তবে ইহার পর পর শরীর গ্রহণ করিবার অর্থ কি? তত্ত্বটি এই—আত্মা আসেও না, যায়ও না, জন্মগ্রহণও করে না এবং মরেও না। যাহা সর্বব্যাপী, তাহার জন্মগ্রহণ কিরূপে সম্ভব? আত্মা দেহে বাস করে—এরূপ বলা অর্থহীন নির্বুদ্ধিতা। যাহা অসীম, তাহা সীমাবদ্ধ স্থানে থাকিবে কিরূপে? কিন্তু এক ব্যক্তি যখন হাতে একখানি বই লইয়া পড়িতে পড়িতে পাতার পর পাতা উলটাইয়া অগ্রসর হইতে থাকে, তখন বইয়ের পাতাগুলি পুনঃপুনঃ স্থাণ পরিবর্তন করিতে থাকে, কিন্তু পাঠক যথাস্থানেই অবস্থান করে, আত্মার সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। সমগ্র প্রকৃতিই আত্মার নিকট একখানি পুস্তকের মতো—আত্মা যেন উহা পাঠ করিতেছে। এক একটি জীবন যেন সেই পুস্তকের একটি পাতা, ঐ পাতাটি পড়া হইয়া

গেলে সে ক্রমশঃ পাতা উল্টাইয়া অগ্রসর হইতে থাকে, যতদিন না পুস্তক পড়া শেষ হইয়া যায়, এবং চরাচর বিশ্বের সমস্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আত্মা পূর্ণ হয়। তথাপি একই কালে এই আত্মা কখনও নড়ে নাই, আসে নাই, যায়ও নাই, শুধু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছিল। কিন্তু আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, আমরা যেন ঘুরিতেছি। পৃথিবী আবর্তিত হইতেছে, তথাপি আমরা মনে করি যে, পৃথিবীর পরিবর্তে সূর্য ঘুরিতেছে; আমরা জানি ইহা একটি ভুল—ইন্দ্রিয়ের ছলনামাত্র। আমরা জন্মগ্রহণ করি এবং মরি, আমার আসি এবং যাই—ইহাও একটি ভ্রান্তিমাত্র। আমরা আসিও না, যাইও না; আমরা জন্মগ্রহণও করি না। কেন না আত্মা কোথায় যাইবে? উহার গমনের কোন স্থান নাই। এমন কোন্ স্থান আছে, যেখানে আত্মা পূর্ব হইতেই বর্তমান নাই?

অতএব প্রকৃতির বিবর্তন এবং আত্মার বিকাশের তত্ত্বটি আসিয়া পড়িল। বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়গুলি—উচ্চ হইতে উচ্চতর সংযোগসমূহ আত্মায় নাই। আত্মা যেমন তেমনই আছে। এইগুলি প্রকৃতিতে অবস্থিত; কিন্তু যেহেতু প্রকৃতি উচ্চ হইতে উচ্চতর পর্যায়ে বিবর্তিত হইতেছে, আত্মার মহিমাও ক্রমশঃ বিকশিত হইতেছে। মনে কর, এখানে একটি পর্দা রহিয়াছে, এবং পর্দার পশ্চাতে একটি আশ্চর্য দৃশ্য বর্তমান। এই পর্দায় একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে যাহার সেই ভিতর দিয়া ঐ দৃশ্যের কিয়দংশ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে। মনে কর, ছিদ্রটি ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যটি আমাদের দৃষ্টিপথে অধিকতর পরিস্ফুর হইতে থাকে; যখন সমস্ত পর্দাটি অপসারিত হয়, তখত দৃশ্য ও তোমার মধ্যে কোন ব্যবধাব থাকে না, তুমি উহার সবটুকুই দেখিতে পাও। এই পর্দাটি হইল মানুষের মন। ইহার পশ্চাতে আত্মার সেই মহিমা, সেই পবিত্রতা, সেই অনন্ত শক্তি বর্তমান; এবং মন যতই স্বচ্ছ হইতে স্বচ্ছতর, পবিত্র হইতে পবিত্রতর হইতে থাকে, আত্মাও স্বমহিমায় ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া উঠে। ইহার কারণ এই নয় যে, আত্মা পরিবর্তিত হইতেছে—পরিবর্তন যাহা কিছু, তাহা এই পর্দায়। আত্মা সেই অপরিবর্তনীয়, অমৃতস্বরূপ, পবিত্র আনন্দময় অদ্বৈত সত্তা।

সুতরাং শেষ পর্যন্ত তত্ত্বটি এইরূপ দাঁড়াইল : উচ্চতম হইতে নিম্নতম—নিকৃষ্ট ব্যক্তি পর্যন্ত, শ্রেষ্ঠ ব্যাক্তি হইতে ক্ষুদ্রতম বিচরণশীল কীটাণু পর্যন্ত—সকলেই সেই পবিত্রতা পূর্ণস্বরূপ, অসীম আনন্দময় সত্তা। কীটের মধ্যে আত্মার অনন্ত শক্তির স্বল্প বিকাশ; শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির মধ্যে আত্মার শক্তি সর্বাধিক বিকশিত হইতেছে। প্রভেদ শুধু বিকাশের তারতম্যে, মূলতঃ আত্মা একই। সকল জীবের মধ্যে সেই পবিত্র পূর্ণ আত্মা অবস্থান করিতেছে।

স্বর্গ বা অনুরূপ স্থানসমূহের যে উল্লেখ রহিয়াছে, সেগুলি গুরুত্বের দিক দিয়া দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত বলা যাইতে পারে। স্বর্গের ধারণাকে একটি নিম্নস্তরের ধারণা বলা যাইতে পারে। ভোগপূর্ণ একটি স্থানের ধারণা হইতেই ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। আমরা নির্বোধের মতো বিশ্ব চরাচরকে আমাদের বর্তমান অভিজ্ঞতার মধ্যেই সীমিত করিয়া রাখিতে চাই। শিশুরা চিন্তা করে, সমগ্র বিশ্ব শিশুতে পরিপূর্ণ; উন্মাদের নিকট সমগ্র পৃথিবী একটি উন্মাদাগার। সুতরাং যাহাদের নিকট পৃথিবী কেবল ইন্দ্রিয়-ভোগের জন্য, যাহাদের সমগ্র জীবন আহার এবং প্রমোদে ব্যয়িত হয়, যাহাদের সঙ্গে পশুরা ব্যবধান অত্যন্ত সামান্য, তাহারা স্বভাবতই এই জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব লক্ষ্য করিয়া এমন একটি স্থানের কল্পনা করে, যেখানে তাহারা আরও ভোগসুখ লাভ করিবে। তাহাদের ভোগাকাঙ্ক্ষা অসীম, সুতরাং তাহারা এমন একটি স্থানের কল্পনা করিতে বাধ্য, যেখানে অবিরত ইন্দ্রিয়সুখ রহিয়াছে, এবং যতই আমরা অগ্রসর হই, ততই দেখি, যাহারা ঐ-সকল স্থানে যাইতে আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাদের অবশ্যই সেখানে যাইতে হয়। তাহারা স্বপ্নের মধ্য দিয়া চলে—একটি স্বপ্ন শেষ হইলে অপর একটি স্বপ্নের মধ্যে গিয়া পড়ে, যেখানে ইন্দ্রিয়ভোগের প্রাচুর্য বর্তমান। তারপর যখন তাহাদের স্বপ্ন ভাঙিয়া যায়, তাহারা অন্য একটি জিনিসের জন্য চিন্তা করিতে বাধ্য হয়। এইরূপে তাহারা এক স্বপ্ন হইতে অন্য স্বপ্নে তাড়িত হইতে থাকিবে।

তারপর শেষ তত্ত্ব—আত্মা সম্বন্ধে আরও একটি ধারণা। যদি আত্মা পবিত্র এবং স্বরূপতঃ পূর্ণ, যদি প্রতি আত্মা অনন্তশক্তিসম্পন্ন এবং সর্বব্যাপী হয়, তবে বহু আত্মার কল্পনা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? একই সঙ্গে বহু অনন্তের কল্পনা সম্ভব নয়। বহুর কথা

ছাড়িয়া দাও, একই সঙ্গে দুইটিরও কল্পনা করা যায় না। যদি দুইটি অনন্ত থাকিত, তবে একটি অপরটির দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকিত, ফলে দুইটিই সীমিত হইত। অনন্ত কেবল একটিই হইতে পারে এবং সাহসের সহিত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, অনন্ত এক—দুই নয়।

দুইটি পক্ষী একই বৃক্ষে অবস্থান করিতেছে—একটি শীর্ষদেশে, অপরটি নিম্নে। উভয়ই বিচিত্র বর্ণের; একটি ফল ভক্ষণ করে, কিন্তু অপরটি শান্ত, মহিমময় হইয়া নিজ গৌরবে অবস্থান করিতেছে। নিম্নতর পক্ষীটি ভাল ও মন্দ ফল ভক্ষণ করিতেছে এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর পশ্চাতে ধাবিত হইতেছে। যখনই পক্ষীটি একটি তিক্ত ফল ভক্ষণ করে, তখনই উর্ধ্বগামী হয়; ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া সে দেখে, অপর পক্ষীটি সেখানে শান্ত সংযত হইয়া অবস্থান করিতেছে; সে ভাল বা মন্দ কোন ফলেরই আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, কোনপ্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অনুসন্ধান না করিয়া, আত্মস্থ হইয়া অবস্থান করিতেছে। নিম্নস্থ পক্ষীটি ঊর্ধ্বে অবস্থানকারী পক্ষীটিকে দেখিয়া ক্রমশঃ উহার সমীপবর্তী হইবার চেষ্টা করিতেছে। একটু ঊর্ধ্বে উঠিতেছে, কিন্তু পূর্বপূর্ব সংস্কারসমূহ বলবৎ থাকায় সে একই ফল আবার ভক্ষণ করিতেছে। আবার একসময়ে একটি অত্যন্ত তিক্ত ফল খাইয়া মর্মাহত হয় এবং ঊর্ধ্বে নিরীক্ষণ করে। সেখানে সেই শান্ত সংযত পক্ষীটিকে আবার দেখে। সে উহার নিকটবর্তী হইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পূর্ব সংস্কার-প্রভাবে পুনঃপুনঃ নিম্নগামী হইয়া স্বাদু এবং তিক্ত ফল ভক্ষণ করিতেছে। সে আবার একটি তিক্ত ফল ভক্ষণ করিয়া ঊর্ধ্বে চাহিয়া দেখিল এবং ঐ পক্ষীটির আরও সমীপবর্তী হইল। এইরূপে যতই সে নিকটে যাইতে লাগিল, ততই অপর পক্ষীটির দেহ-বিচ্ছুরিত আলোকে তাহার উপর পড়িতে লাগিল। উহার নিজের পালকগুলি যেন খসিয়া পড়িতেছে। যখন সে অনেকটা নিকটবর্তী হইয়াছে, তখন সমস্ত দৃশ্যটি পরিবর্তিত হইয়া গেল। নিম্নের পক্ষীটি কোন দিনই ছিল না; যাহা ছিল, তাহা শুধু ঐ ঊর্ধ্বের পক্ষীটি; নিম্নের পক্ষীটি বলিয়া যাহা এতক্ষণ মনে হইয়াছিল, তাহা উহার এক সামান্য প্রতিবিম্ব মাত্র।

আত্মার প্রকৃতি বলিতে ইহাই বুঝায়। এই মানুষের আত্মা পার্থিব ইন্দ্রিয়ভোগ ও অনিত্য বস্তুর পশ্চাতে ছুটাছুটি করিতেছে। পশুর মতো ইহা কেবল ইন্দ্রিয়সুখ, কেবল ক্ষণিক স্নায়ু-

উত্তেজনার পশ্চাতে ধাবমান। যখন আঘাত আসে, মুহূর্তের মধ্যে মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হইতে থাকে এবং সমস্ত কিছুই তখন অদৃশ্য হইয়া যায়। তখন পৃথিবীকে সে যেরূপ ভাবিয়াছিল, জীবনটাকে যত সহজ ভাবিয়াছিল, আর সেরূপ দেখিতে পায় না। ঊর্ধ্বে নিরীক্ষণ করিয়া অনন্ত ঈশ্বরকে দেখে, সেই পরম পুরুষের ক্ষণিক অনুভূতি লাভ করে, আরও একটু সমীপবর্তী হয়, কিন্তু অতীত কর্মের দ্বারা আবার নিম্নমূখী হইয়া পড়ে। অপর একটি আঘাত আসিয়া তাহাকে আবার সেই স্থানে প্রেরণ করে। সে আর একবার সেই পূর্ণসত্তার অনুভূতি লাভ করে এবং সমীপবর্তী হয়। এইরূপে সে যতই নিকটে যাইতে থাকে, দেখিতে পায় তাহার ব্যক্তিত্ব–হীন নিকৃষ্ট অত্যন্ত স্বার্থপূর্ণ ব্যক্তিত্ব–ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। যে ক্ষুদ্র সত্তাকে সুখী করিতে গিয়া সে পৃথিবীকে ত্যাগ করিতে তৎপর হইয়াছিল, তাহার সেই আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ লয় পাইতেছে; এবং আরও যতই অগ্রসর হয়, ততই ধীরে ধীরে প্রকৃতি অপসৃত হইতে থাকে। যখন সে যথেষ্ট নিকটবর্তী হয়, তখন সমস্ত দৃশ্যপটের পরিবর্তন ঘটে, এবং সে দেখিতে পায় অপর পক্ষীটি–সেই অনন্ত সত্তা, যাহাকে সে এতদিন দূর হইতে দেখিতেছিল, যাহার অপূর্ব মহিমা এবং গৌরবের আভাস সে পাইয়াছিল, তাহা বস্তুতঃ তাহার নিজ আত্মারই, এবং উহা সেই নিত্যবস্তু। যাহা সর্ব বস্তুতে সত্যরূপে অধিষ্ঠিত, যাহা প্রতি অণুতে বিরাজিত ও সর্বত্র প্রকাশিত, যাহা সমস্ত বস্তুর মূল সত্তা, যাহা এই চরাচর বিশ্বের ঈশ্বর, আত্মা তখন তাহাকেই খুঁজিয়া পায়। জানো ‘তত্ত্বমসি’–তুমি সেই; জানো–তুমি মুক্ত।

৮. পরম লক্ষ্য

পরম লক্ষ্য

১৯০০ খৃঃ ২৭শে মার্চ স্যান ফ্র্যান্সিস্কোতে প্রদত্ত বক্তৃতা।
[মাঝে মাঝে বিরামবিন্দু (...)গুলির অর্থ লিপিকার কিছু ভাব ধরিতে পারেন নাই।]

আমরা দেখি, মানুষ যেন সর্বদাই তাহার নিজের অপেক্ষা বৃহত্তর কোন কিছুর দ্বারা পরিবেষ্টিত, এবং তাহারই অর্থ অনুধাবন করিতে সদা সচেষ্ট। মানুষ চিরদিনই শ্রেষ্ঠ আদর্শের সন্ধান করিবে। সে জানে, সে-আদর্শ আছে এবং সেই শ্রেষ্ঠ আদর্শের অনুসন্ধান করাই ধর্ম। প্রথম দিকে তাহার সমস্ত অনুসন্ধানই বাহিরের স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল—মানুষের পূর্ণ স্বরূপ সম্পর্কে তাহার জ্ঞানানুসারে কখনও স্বর্গে, কখনও বা বিভিন্ন স্থানে।

পরে মানুষ নিজেকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখিতে আরম্ভ করিল; সে বুঝিল যে, 'আমি' বলিতে সাধারণতঃ সে যাহা বোঝে, তাহা প্রকৃত 'আমি' নয়। তাহার ইন্দ্রিয়গোচর সত্তা আর প্রকৃত সত্তা এক নয়। সে তখন নিজের মধ্যেই নিজেকে খুঁজিতে লাগিল; সে আবিষ্কার করিল,...যে-আদর্শকে সে এতকাল বাহিরা খুঁজিতেছিল তাহা তাহার অন্তরেই আছে; বাহিরে যাহাকে সে পূজা করিতেছিল, সে তাহারই অন্তরের সত্য স্বরূপ। দ্বৈতবাদ আর অদ্বৈতবাদের মধ্যে পার্থক্য এই : আদর্শকে যখন নিজের বাহিরে স্থাপন করা হয়, তখন তাহাই দ্বৈতবাদ। আর ঈশ্বরকে যখন নিজের অন্তরে খোঁজা হয়, তখন তাহাই অদ্বৈতবাদ।

প্রথমতঃ সেই পুরাতন প্রশ্ন—কেন এবং কোথা হইতে...? মানুষ কেমন করিয়া সীমিত হইল? অসীম কেমন করিয়া সসীম হইল, পবিত্র কেমন করিয়া অপিবিত্র হইল? প্রথমতঃ ভুলিলে চলিবে না যে, কোন দ্বৈতবাদী কল্পনার দ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাইতে পারে না।

ঈশ্বর কেন এই অপবিত্র জগৎ সৃষ্টি করিলেন? পূর্ণ অসীম দয়ালু পরমপিতার সৃষ্টি হইয়াও মানুষ কেন এত দুঃখী? কেন এই স্বর্গ আর মর্ত্য, যাহার দিকে চাহিয়া আমরা নিয়মের ধারণা লাভ করি? না দেখিয়া কোন কিছু সম্বন্ধেই কেহ কল্পনা করিতে পারে না।

এই জীবনে যত কিছু নির্যাতন ভোগ করি, সবই আমরা আর একটি জায়গার উপযুক্ত বলিয়া মনে করি—সেটি হইল আমাদের নরক।

অসীম ঈশ্বর কেন এই পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন? দ্বৈতবাদী বলেন, ঠিক যেভাবে কুম্ভকার ঘট তৈয়ারি করে। ঈশ্বর কুম্ভকার; আমরা ঘটমাত্র। দার্শনিকের ভাষায় প্রশ্নটি এই : প্রকৃত স্বরূপে মানুষ যে পবিত্র, পূর্ণ এবং অসীম—এ কথা সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইল কেমন করিয়া? অদ্বৈতবাদমূলক যে-কোন চিন্তাপ্রণালীতে ইহা একটি প্রধান সমস্যা। অন্যান্য সবই পরিষ্কার ও স্পষ্ট। এ প্রশ্নের কোন উত্তর নাই। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, প্রশ্নটিই স্ববিরোধী।

দ্বৈতবাদের কথাই ধরা যাক—প্রশ্ন হইবে : ঈশ্বর কেন জগৎ সৃষ্টি করিলেন? ইহা স্ববিরোধী? কেন? কারণ—ঈশ্বর বলিতে আমরা কি বুঝি? ঈশ্বর এমন এক সত্তা, যাঁহার উপরে বাহির হইতে কোন প্রতিক্রিয়া হইতে পারে না।

তুমি বা আমি মুক্ত নই। আমি তৃষ্ণার্ত। তৃষ্ণা বলিয়া একটা কিছু আছে, যাহার উপর আমার কোন কর্তৃত্ব নেই, যাহা আমাকে জলপান করিতে বাধ্য করে। আমার দেহের প্রতিটি কর্ম, এমন কি আমার মনের প্রতিটি চিন্তা পর্যন্ত আমার বাহিরের প্রভাবে প্রভাবিত। আমাকে ইহা করিতেই হইবে। সেই জন্যেই তো আমি বাধ্য...এইরূপ করিতে, ইহা পাইতে আমি বাধ্য।...আবার কেন এবং কোথা হইতে, এই প্রশ্ন দুইটিরই বা অর্থ কি? বাহিরের শক্তির অধীন হওয়া। তুমি কেন জলপান কর? কারণ তৃষ্ণা তোমাকে বাধ্য করে। তুমি দাস। কোন কিছুই তুমি নিজের ইচ্ছায় কর না, কারণ সব কিছু করিতেই তুমি বাধ্য। তোমার কাজের একমাত্র প্রেরণা কোন শক্তি...।

কোন কিছুর দ্বারা চালিত না হইলে এই পৃথিবীও কখন চলিত না। আলো জ্বলে কেন? কেহ আসিয়া একটি দেশলাই না জ্বালিলে আলো জ্বলে না। প্রকৃতির সর্বত্র সব কিছুই বাধ্যতামূলক। দাসত্ব, দাসত্ব! প্রকৃতির সঙ্গে মিলাইয়া চলার অর্থই দাসত্ব। প্রকৃতির দাস হইয়া সোনার খাঁচায় বাস করিয়া লাভ কি? মানুষ যে আসলে মুক্ত এবং স্বর্গীয়—এই জ্ঞানই তো শ্রেষ্ঠ নিয়ম ও শৃঙ্খলা। কাজেই 'কেন এবং কোথা হইতে?'—এই প্রশ্ন করা যাইতে পারে অজ্ঞানেই। কোন কিছুর সহায়তায় কিছু করিতে আমি বাধ্য।

কখনও বলো, 'ঈশ্বর মুক্ত'; আবার প্রশ্ন কর, 'ঈশ্বর কেন জগৎ সৃষ্টি করেন?' স্ববিরোধী কথা বলিতেছ। ঈশ্বরের অর্থই হইল সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছা। যুক্তিশাস্ত্রের ভাষায় বলিলে প্রশ্নটি এইরূপ দাঁড়ায় : যাহাকে কেহ কখনও বাধ্য করিতে পারে না, তিনি কাহার দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইলেন? তোমরা একই সঙ্গে প্রশ্ন কর, ঈশ্বরকে কে বাধ্য করিল? প্রশ্নটি অর্থহীন। স্বরূপেই তিনি অসীম; তিনি স্বাধীন। তোমরা যখন যুক্তি শাস্ত্রের ভাষায় প্রশ্ন করিতে পারিবে, তখনই আমরা সে প্রশ্নের জবাব দিব। যুক্তিই তোমাদের বলিয়া দিবে—সত্তা এক, দ্বিতীয় নাই। যেখানেই দ্বৈতবাদ দেখা দিয়াছে, সেখানেই অদ্বৈতবাদ আসিয়া তাহাকে বিতাড়িত করিয়াছে।

এ কথা বুঝিবার পথে একটিমাত্র অসুবিধা আছে। ধর্ম দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ বুদ্ধির বিষয়। দার্শনিকের ভাষায় না বলিয়া তুমি যদি সাধারণ মানুষের ভাষায় বলো, তাহা হইলে যে-কেহ ইহা বুঝিতে পারে। মানুষের স্বভাবই নিজেকে প্রক্ষেপ করা। সন্তানের সঙ্গে এক করিয়া নিজের কথা ভাবো। তাহার সহিত নিজে এক হইয়া যাও, দেখিবে তোমারই যেন দুইটি দেহ। ঠিক তেমনি তোমার স্বামীর মনের ভিতর দিয়াও তুমি দেখিতে পারো। কোথায় থামিবে তুমি? অসংখ্য শরীরের মধ্যে তুমি নিজেকে দেখিতে পারো।

মানুষ প্রতিদিন প্রকৃতিকে জয় করিয়া চলিয়াছে। জাতি হিসাবে মানুষ তাহার শক্তিকে প্রকাশ করিতেছে। কল্পনায় মানুষের এই শক্তির একটা সীমা নির্দেশ করিতে চেষ্টা কর। তুমি স্বীকার করিবে যে, জাতি হিসাবে মানুষ অসীম শক্তির—একটি অসীম দেহের অধিকারী। কিন্তু একমাত্র প্রশ্ন হইতেছে, তুমি কি? তুমি কি জাতি, না একটি ব্যক্তি? যে-

মুহূর্তে তুমি নিজেকে পৃথক্ করিয়া দেখিবে, সব কিছুই তোমাকে আঘাত করিবে। যে-মুহূর্তে তুমি নিজেকে প্রসারিত করিয়া অন্যের কথা ভাবিবে, অমনি তুমি সহায়তা পাইবে। স্বার্থপর মানুষই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শোচনীয় জীব। যে মোটেই স্বার্থপর নয়, সেই সর্বাপেক্ষা সুখী। সমগ্র সৃষ্টির সঙ্গেই সমগ্র জাতির সঙ্গে সে তখন এক; ঈশ্বর তখন তাহার মধ্যে আবির্ভূত হন।...সেইরূপ দ্বৈতবাদে—খ্রীষ্টান, হিন্দু এবং অন্য সব ধর্মে নীতির বিধান এই : স্বার্থপর হইও না।...নিঃস্বার্থ হও। অন্যের জন্য কাজ কর! নিজেকে প্রসারিত কর!...

অজ্ঞ ব্যক্তিকে এ কথা বোঝানো যায় খুবই সহজে, আর বিদ্বানকে বোঝানো যায় আরও সহজে। কিন্তু যে অতি সামান্য শিক্ষা পাইয়াছে, স্বয়ং ঈশ্বরও তাহাকে বুঝাইতে পারিবেন না। আসল কথা, তুমি এই পৃথিবী হইতে আলাদা নও, যেমন তোমার আত্মা তোমার অন্য সব কিছু হইতে আলাদা নয়। তাহা যদি না হইত, তুমি কিছুই দেখিতে পাইতে না, কিছুই বুঝিতে পারিতে না। বস্তুর সমুদ্রে আমাদের দেহ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত মাত্র। জীবন একটি মোড় ঘুরিয়া অন্যরূপে বহিয়া চলিয়াছে... সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, তুমি, আমি—সবই আবর্তমাত্র। কেন আমি একটি বিশেষ মনকে আমার বলিয়া বাছিয়া লইলাম? মনের সমুদ্রে ইহা একটি মানস আবর্ত মাত্র।

তাহা না হইলে এই মুহূর্তে আমার স্পন্দন যে তোমার কাছে পৌঁছিতেছে, তাহা কেমন করিয়া সম্ভব হইল? হ্রদের মধ্যে একটি পাথর নিক্ষেপ কর, দেখিবে একটি স্পন্দন শুরু হইবে এবং সমস্ত জলটাকে স্পন্দিত করিয়া তুলিবে। আমার মনকে আনন্দের অবস্থায় লইয়া গেলাম, ফলে তোমার মনেও সেই আনন্দ সঞ্চারিত হইবে। এমন কত সময়েই তুমি তোমার মনে বা হৃদয়ে কিছু ভাবিয়াছ এবং মুখে না বলিলেও অন্যেরা তোমার সে ভাবনার স্পর্শ পাইয়াছে। সর্বত্রই আমরা এক। ...অথচ সেই কথাটাই আমরা কখনও বুঝিতে পারি না। সমগ্র জগৎই দেশ কাল ও নিমিত্ত দ্বারা গড়া। ঈশ্বরও সেই বিশ্বরূপেই প্রকট হন।...প্রকৃতি শুরু হইল কখন? ...তুমি যখন তোমার প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া দেশ কাল এবং নিমিত্তে বাঁধা পড়িলে।

ইহাই তোমাদের দেহের চক্রাবর্ত। আবার ইহাই তোমাদের অসীম প্রকৃতি...ইহাই তো প্রকৃতি—দেশ কাল ও নিমিত্ত। প্রকৃতি বলিতে ইহাই বুঝায়। তুমি যখন চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলে, তখনই সময়ের সূত্রপাত হইল। তুমি যখন দেহলাভ করিলে, অমনি দেশ বা স্থান দেখা দিল; অন্যথা দেশ বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। তুমি যখন সীমাবদ্ধ হইলে, তখনই দেখা দিল কার্য-কারণ-সম্পর্ক। কোন না কোন একটা উত্তর আমাদের চাই। এই সেই উত্তর। আমাদের সীমাবদ্ধ হওয়া তো খেলা মাত্র—খেলার আনন্দ মাত্র। কিছুই তোমাকে বাঁধিতে পারে না; কিছুই তোমাকে বাধ্য করিতে পারে না। তুমি কখনও বদ্ধ নও। আমাদের নিজেদের গড়া এই খেলায় নিজ নিজ ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করিতেছি মাত্র।

ব্যক্তি-সত্তার আর একটি সমস্যার কথা তাহা হইলে তোলা যাক। অনেকে আবার ব্যক্তি-সত্তাকে হারাইবার ভয়েই ভীত! শূকর-ছানা যদি দেবত্ব লাভ করিতে পারে, তহা হইলে তাহার শূকর-সত্তাকে হারানো কি তাহার পক্ষে ভাল নয়? নিশ্চয়। কিন্তু বেচারা শূকর তখন তাহা মনে করে না। কোন্ অবস্থা আমার ব্যক্তি-সত্তা? যখন আমি একটি ছোট শিশু ছিলাম এবং ঘরের মেঝেয় হামাগুড়ি দিয়া আমার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি গলাধঃ-করণ করিতে চেষ্টা করিতাম? সেই সত্তাকে হারাইতে কি আমার দুঃখিত হওয়া উচিত? আজ যেমন আমার শৈশবকালের দিকে তাকাইয়া আমি হাসি, আজ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পরে আমার বর্তমান অবস্থার দিকে তাকাইয়াও সেইরূপ হাসিব। ইহার মধ্যে কোন্ ব্যক্তি-সত্তাটিকে আমি রক্ষা করিব?...

ব্যক্তি-সত্তার অর্থ কি, তাহা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। ...দুইটি বিপরীত ভাবধারা আছে : একটি ব্যক্তি-সত্তা সংরক্ষণ, অপরটি ব্যক্তি-সত্তা বিসর্জন দিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। ...শিশুর প্রয়োজনে মা তাঁহার সব বাসনাই ত্যাগ করেন। ...শিশুকে যখন কোলে নেন, ব্যক্তি-সত্তার ডাক, আত্ম-রক্ষার ডাক তখন আর তাঁহার কানে আসে না। নিকৃষ্ট খাদ্য নিজে গ্রহণ করিয়া সন্তানকে দেন উত্তম খাদ্য। যাহাকে ভালবাসি, তাহার জন্য আমরা মরিতেও প্রস্তুত।

একদিকে এই ব্যক্তি-সত্তাকে রক্ষা করিবার জন্য আমরা কঠোর সংগ্রাম করিতেছি, আবার অন্য দিকে ইহাকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু তাহার ফল কি হইতেছে? টম ব্রাউন কঠোর সংগ্রাম করিতেছে। স্বীয় ব্যক্তি-সত্তার জন্য সে যুদ্ধ করিতেছে। তারপর টমের মৃত্যু হইল; কিন্তু পৃথিবীর বুকে কোথাও এতটুকু চাঞ্চল্য দেখা দিল না। উনিশ শত বছর আগে একটি ইহুদী জন্মগ্রহণ করিলেন; স্বীয় ব্যক্তি-সত্তাকে রক্ষা করিবার জন্য একটি অঙ্গুলিও তিনি হেলন করিলেন না।... তাঁহার কথা ভাবো! সেই ইহুদী ব্যক্তি-সত্তাকে রক্ষা করিবার জন্য কখনও সংগ্রাম করেন নাই; আর সেই জন্যই পৃথিবীতে তিনি মহত্তম। এই কথাটাই পৃথিবীর মানুষ জানে না।

যথাসময়ে আমাদিগকে 'ব্যক্তি' হইতে হইবে। কিন্তু কোন্ অর্থে? মানুষের ব্যক্তিত্ব কি? টম ব্রাউন নয়, মানুষের মধ্যে যে ঈশ্বর তিনিই প্রকৃত ব্যক্তি-সত্তা। মানুষ যতই তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবে, ততই নিজের মিথ্যা ব্যক্তি-সত্তা সে ত্যাগ করিবে। নিজের জন্য সব কিছু সংগ্রহ করিতে, সব কিছু পাইতে যত বেশী চেষ্টা সে করিবে, ততই সে ব্যক্তি হিসাবে ছোট হইয়া যাইবে। নিজের কথা সে যত কম ভাবিবে, জীবিতকালে নিজের ব্যক্তিত্ব সে যত বেশী ত্যাগ করিবে,...ততই সে ব্যক্তি হিসাবে বড় হইবে। পৃথিবীর মানুষ এই গূঢ় কথাটি বুঝিতে পারে না।

আমাদের প্রথম বুঝিতে হইবে ব্যক্তি-সত্তার অর্থ কি। ব্যক্তি-সত্তা হইল আদর্শে পৌঁছানো। তুমি এখন পুরুষ, বা তুমি নারী। তোমার পরিবর্তন ঘটিবেই। তোমরা কি থামিয়া থাকিতে পারো? তোমাদের মন আজ যেমন আছে, সেই রকমই কি রাখিতে চাও? রাখিতে চাও ক্রোধ ঘৃণা ঈর্ষা দ্বন্দ্ব প্রভৃতি মনের সহস্রপ্রকার বৃত্তি? তোমরা কি বলিতে চাও, সে-সবই তোমরা অক্ষুন্ন রাখিবে?...কোথাও তোমরা থামিতে পার না...যতদিন না জয়লাভ সম্পূর্ণ হয়, যতদিন না তোমরা পবিত্র এবং পূর্ণ হও।

তোমরা যখন সচ্চিদানন্দময় হইবে, তখন আর কোন ক্রোধ থাকিবে না। তোমার কোন্ দেহকে তুমি রক্ষা করিবে? যে জীবনের শেষ নাই, সেখানে না পৌঁছানো পর্যন্ত তুমি থামিতে পার না। অসীম জীবন! সেইখানে তুমি থামিবে। আজ তোমরা কিছু জ্ঞানলাভ

করিয়াছ; আরও জ্ঞানলাভ করিতে সর্বদাই চেষ্টা করিতেছ। কোথায় থামিবে? জীবনের সঙ্গে একাত্ম যতদিন না হইবে, ততদিন কোথাও থামিবে না।...

অনেকেই সুখলাভকেই লক্ষ্য মনে করে। সেই সুখের জন্য তাহারা শুধু ইন্দ্রিয়কে খোঁজে। ঊর্ধ্বতর স্তরে আরও অনেক বেশী আনন্দ পাওয়া যায়। তারপর আত্মিক স্তরে। তারপর নিজের মধ্যে–জীবের মধ্যে যিনি শিব, তাঁহার মধ্যে। যে মানুষের সুখ তাহার বাহিরে, বাহিরের জিনিস চলিয়া গেলেই সে অসুখী হইয়া পড়ে। সুখের জন্য তুমি এই পৃথিবীর কোন কিছুর উপর নির্ভর করিতে পার না। আমার সব সুখ যদি আমার নিজের মধ্যে থাকে, তাহা হইলে সে সুখ আমি সর্বদাই ভোগ করিতে পারি, কারণ আমার আত্মাকে তো আমি কখনও হারাইব না।...মাতা, পিতা, সন্তান স্ত্রী, দেহ, সম্পদ– সব আমি হারাইতে পারি , শুধু হারাইতে পারি না আমার আত্মা....আত্মাই আনন্দ। সব বাসনাই আত্মায় বিধৃত। ... ইহাই ব্যক্তিত্ব। ইহার পরিবর্তন নাই; ইহাই পূর্ণ।

...এবং কেমন করিয়া ইহাকে পাওয়া যায়? এই পৃথিবীর মনীষীরা–শ্রেষ্ঠ নরনারীগণ– সুদীর্ঘ সাধনার দ্বারা যাহা পাইয়াছেন, সকলেই তাহা পাইতে পারে।...বিশটি বা ত্রিশটি দেবতায় বিশ্বাসী দ্বৈতবাদী মতগুলির কথা বলিতেছ? উহাতে কিছু যায় আসে না। একটি সত্য সকলেই মানে–এই মিথ্যা ব্যক্তি-সত্তাকে ছাড়িতে হইবে।...এই যে অহং–ইহা যত হ্রাস পাইবে, ততই আমি আমার প্রকৃত স্বরূপের সান্নিধ্যে পৌঁছিব; সেটি আমার বিশ্বময় দেহ। নিজের মনের কথা আমি যত অল্প ভাবিব, ততই আমি সেই বিশ্বব্যাপী মনের নিকটতর হইব। নিজের আত্মার কথা আমি যত অল্প ভাবিব, ততই আমি বিশ্বব্যাপী আত্মার নিকটতর হইব।

আমরা একটি দেহে বাস করি। আমরা কিছুটা দুঃখ ভোগ করি, কিছুটা সুখ ভোগ করি। এই দেহে বাস করিয়া যে সামান্য সুখ আমরা পাই, তাহার জন্য, আত্মরক্ষার জন্য জগতের সব কিছু ধ্বংস করিতেও আমরা প্রস্তুত। যদি আমার দুইটি শরীর থাকিত, তাহা হইলে আরও ভাল হইত না কি? এমনি করিয়াই আমরা আনন্দের পথে অগ্রসর হই। সকলের মধ্যেই আমি। সকলের হাত দিয়া আমি কাজ করি; সকলের পায়ে ভর দিয়া

আমি হাঁটি। সকলের মুখে আমি কথা বলি; সকলের দেহে আমি বাস করি। আমার দেহ অসীম, আমার মনও অসীম। নাজারেথের যীশুর মধ্যে, বুদ্ধের মধ্যে, মহম্মদের মধ্যে–অতীত ও বর্তমানের যাহা কিছু মহৎ এবং শুভ–সকলের মধ্যেই আমি বাস করিয়াছি। আমার পরে যাহা কিছু আসিবে, তাহার মধ্যেও আমি বাস করিব। এ কি মতবাদ মাত্র? না, ইহাই সত্য।

এই সত্য যদি উপলব্ধি করিতে পারো, সে যে অসীম আনন্দের কথা হইবে! আনন্দের সে কী উচ্ছ্বাস! কোন্ দেহ এত বড় যে, এখানে আমাদের শরীরের সকল প্রয়োজন মিটিয়া যায়? অন্য সকলের শরীরে বাস করিয়া পৃথিবীর সব শরীরকে ভোগ করিবার পর আমাদের কি অবস্থা হয়? আমরা অসীমের সঙ্গে এক হইয়া যাই, আর সেটাই আমাদের লক্ষ্য। সেই একমাত্র পথ। একজন বলেন, 'আমি যদি সত্যকে জানি, মাখনের মতো আমি গলিয়া যাইব।' মানুষ যদি তেমনি গলিয়া যাইত! কিন্তু মানুষ বড়ই কঠিন, এত তাড়াতাড়ি গলিয়া যাইবে না!

মুক্তির জন্য আমাদের কি করিতে হইবে? তোমরা তো মুক্তই।... যে মুক্ত, সে কি কখনও বদ্ধ হয়? মিথ্যা কথা। তোমরা কখনও বদ্ধ ছিলে না। যে সীমাহীন, সে কি কখনও সীমাবদ্ধ হইতে পারে? অসীমকে অসীম দিয়া ভাগ কর, অসীমের সঙ্গে অসীম যোগ কর, অসীমকে অসীম দিয়া গুণ কর, অসীমই থাকে। তুমি অসীম; ঈশ্বর অসীম। তোমরা সকলেই অসীম। সত্তা দুই হইতে পারে না, সত্তা কেবল এক। অসীমকে কখনও সসীম করা যায় না। তোমরা কখনও বদ্ধ নও। এই শেষ কথা।...তোমরা মুক্তই আছ। লক্ষ্যে তোমরা পৌঁছিয়াছ। সকলকেই লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইবে। তোমরা লক্ষ্যে পৌঁছাও নাই–এ কথা কখনও ভাবিও না।...

আমরা যাহা (ভাবি), তাহাই হই। যদি মনে ভাবো যে, তোমরা পাপী, তাহা হইলে মোহগ্রস্তের মতো ভাবিবে–আমি একটি বিচরণশীল হতভাগ্য কীট। যাহারা নরকে বিশ্বাস করে, মৃত্যুর পরে তাহারা নরকেই যায়; আর যাহারা বলে–স্বর্গে যাইবে, তাহারা স্বর্গেই যায়।

সবই লীলা।...তোমরা বলিতে পারো, 'কিছুই যখন করিতেই হইবে, তখন ভালই করি না কেন।' কিন্তু ভাল মন্দের কথা কে শুনিতেছে? লীলা! সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর লীলা করিতেছেন। ব্যস্।...তুমিই তো সেই লীলারত সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর। যদি খেলায় নামিয়া ভিক্ষুকের ভূমিকা গ্রহণ কর, তুমি ভূমিকা-নির্বাচনের জন্য অন্যকে দোষী করিতে পার না। ভিক্ষুক হওয়াতেই তোমার আনন্দ। তোমার প্রকৃত ঐশ্বরিক স্বরূপ তো তুমি অবগত আছ। তুমি রাজা, খেলায় নামিয়া ভিক্ষুক সাজিয়াছ মাত্র। ...সবই তো কৌতুক। সব জানিয়া শুনিয়া খেলায় নামো। এই তো সব। তারপর অভ্যাস কর। সারা জগৎই তো একটা বিরাট খেলা। সবই ভাল, কারণ সবই মজা। ঐ নক্ষত্রটি কাছে আসে এবং আমাদের পৃথিবীর সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়া চুরমার হইয়া যায়—আমরাও সবাই মরিয়া গেলাম। এটাও তো কৌতুক। যে-সব ছোট জিনিস তোমাদের ইন্দ্রিয়কে আনন্দ দেয়, সেগুলিকেই তোমরা কৌতুক মনে কর!...

আমাদের বলা হয়—এখানে একজন ভাল ঈশ্বর আছেন, এবং একজন মন্দ ঈশ্বর ওখানে আছেন, ভুল করামাত্র আমাকে পাকড়াও করিবার জন্য যিনি ওঁত পাতিয়া আছেন।...আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন কে যেন আমাকে বলিয়াছিলেন—ঈশ্বর সব কিছুই দেখিতে পান। শুইতে যাইয়া আমি উপরে চাহিয়া রহিয়ালাম। মনে আশা ছিল, ঘরের ছাদ খুলিয়া যাইবে; কিন্তু কিছুই ঘটিল না। নিজেরা ছাড়া আর কেহই আমাদের উপর লক্ষ্য রাখে না। নিজের আত্মা ছাড়া অপর কোন প্রভু নাই; আমাদের অনুভূতি ছাড়া অপর কোন প্রকৃতি নাই। অভ্যাসই দ্বিতীয় স্বভাব বা প্রকৃতি; ইহা প্রথম প্রকৃতিও বটে। প্রকৃতির এই শেষ কথা। কোন কাজ আমি দুই বা তিনবার পুনরাবৃত্তি করি, অমনি উহা আমার প্রকৃতি বা স্বভাব হইয়া যায়। অসুখী হইও না! অনুশোচনা করিও না! যাহা হইয়াছে, হইয়াছে। যদি অনুতাপ কর, ফল ভোগ করিতে হইবে।

...বুদ্ধিমান্ হও। আমরা ভুল করি; তাহাতে কি হইল? সবই তো কৌতুক বা মজা। অতীতের পাপের জন্য লোকে এমন পাগল হইয়া ওঠে, এমন ভাবে আর্তনাদ করে, কাঁদে, যে কি বলিব! অনুশোচনা করিও না। কাজ করিবার পরে আর সে কথা ভাবিও না। অগ্রসর

হও! থামিও না! পিছনে তাকাইও না! পিছনে তাকাইয়া কি লাভ হইবে? ক্ষতিও নাই, লাভও নাই। তুমি তো আর মাখনের মতো গলিয়া যাইতেছ না। স্বর্গ, নরক আর অবতার—সব অর্থহীন কথা!

কে জন্মায় আর কে মরে? মজা করিতেছ, পৃথিবীকে লইয়া খেলা করিতেছ মাত্র। যতদিন ইচ্ছা শরীরটাকে ধারণ করিতেছ। যদি পছন্দ না হয়, করিও না। অসীমই সত্য; সসীম তো খেলামাত্র। তুমি একাধারে অসীম ও সসীম দেহবান্, ইহা নিশ্চয় জানিও। কিন্তু জানে কোন তফাত হইবে না; খেলা চলিতেই থাকিবে।...দুইটি শব্দ—আত্মা ও দেহ—যুক্ত করা হইয়াছে। আংশিক জ্ঞানই কারণ। নিশ্চয় জানিও তুমি সর্বদাই মুক্ত। জ্ঞানের আগুনে যত কিছু কলুষ ও অসম্পূর্ণতা সব পুড়িয়া যায়। আমিই সেই অসীম।

একেবারে আদিতে তোমরা মুক্ত ছিলে, এখনও আছ, চিরদিন থাকিবে। যে জানে সে মুক্ত, সেই মুক্ত; যে জানে সে বদ্ধ, সেই বদ্ধ;

তাহা হইলে ঈশ্বর, পূজা-অর্চনা প্রভৃতির কি হইবে? এগুলিরও প্রয়োজন আছে। আমি নিজেকে ঈশ্বর ও আমি—এই দুই অংশে ভাগ করিয়াছি; আমিও পূজিত হই এবং নিজেকে পূজা করি। কেন করিব না? ঈশ্বরই তো আমি। আমার আত্মাকে কেন পূজা করিব না? সর্বেশ্বর ভগবান্ যিনি, তিনি তো আমার আত্মাও। সবই খেলা, সবই কৌতুক; আর কোন উদ্দেশ্য নাই।

জীবনের পরিণাম ও লক্ষ্য কি? কিছুই না, কারণ আমি জানি—আমিই সেই অসীম। তোমরা যদি ভিক্ষুক হও, তোমাদের লক্ষ্য থাকিতে পারে। আমার কোন লক্ষ্য নাই, কোন অভাব নাই, কোন উদ্দেশ্য নাই। আমি তোমাদের দেশে আসিয়াছি, বক্তৃতা করিতেছি—নিছক মজার খেলা; আর কোন অর্থ নাই। কি অর্থই বা থাকিতে পারে? একমাত্র ক্রীতদাসরাই অপরের জন্য কাজ করিয়া থাকে। তোমরা তো অপরের জন্য কাজ কর না। যখন প্রয়োজন হয়, তোমরা পূজা কর। খ্রীষ্টান, মুসলমান, চীনা, জাপানী—সকলের সঙ্গেই তোমরা যোগ দিতে পারো। যত ঈশ্বর আছেন আর যত ঈশ্বর আসিবেন, সকলের সঙ্গেই তোমরা যোগ

দিত পারো। যত ঈশ্বর আছেন আর যত ঈশ্বর আসিবেন, সকলকেই তোমরা পূজা করিতে পারো।...

আমি সূর্যে আছি, চন্দ্রে আছি, নক্ষত্রমণ্ডলীতে আছি। আমি পরমেশ্বরের সঙ্গে আছি—আছি সব দেবতার মধ্যে। আমার আত্মাকেই আমি পূজা করি।

ইহার আর একটি দিক আছে। সেটি আমি এখনও বলি নাই। আমার ফাঁসি হইবে। আমিই দুষ্ট। নরকে আমিই শাস্তি পাইতেছি। সে-সবও মজার খেলা। আমি অসীম—এই জ্ঞানলাভ করাই দর্শনের লক্ষ্য। লক্ষ্য প্রেরণা, উদ্দেশ্য, কর্তব্য—সব পিছনে পড়িয়া থাকে।...

এই সত্যকে প্রথমে শ্রবণ করিতে হইবে, তারপর মনন। যুক্তি কর, যত প্রকারে পারো তর্ক কর। বিদ্বান্ লোক ইহা অপেক্ষা অধিক জানে না। নিশ্চিত জানিও, সব কিছুতেই তুমি আছ। সেই জন্যই কাহাকেও আঘাত করিও না, কারণ অন্যকে আঘাত করিলে তুমি নিজেকেই আঘাত করিবে।...সবশেষে এই সত্যকে ধ্যান করিতে হইবে। এই সত্যকে চিন্তা কর। তুমি কি ভাবিতে পারো—এমন এক সময় আসিবে, যখন সব কিছু ধূলায় চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে, আর তুমি একাকী দাঁড়াইয়া থাকিবে? উচ্ছ্বাসিত আনন্দের সেই মুহূর্তটি কখনও তোমাকে ত্যাগ করিবে না। তুমি প্রকৃতই দেখিতে পাইবে, তোমার দেহ নাই। তোমার দেহ কোন কালে ছিল না।

অনন্তকাল ধরিয়া আমি এক—একাকী। কাহাকে আমি ভয় করিব? সবই তো আমার আত্মা। এই সত্যকে অবিরাম ধ্যান করিতে হইবে। ইহার ভিতর দিয়াই উপলব্ধি আসিয়া থাকে, সেই উপলব্ধির ভিতর দিয়াই তুমি হইবে অপরের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ।...

‘ব্রহ্মবিদের মুখের ন্যায় তোমার মুখমণ্ডল প্রতিভাত হইতেছে’১—এই অবস্থাই লক্ষ্য। আমি যেভাবে প্রচার করিতেছি, ইহা সেভাবে প্রচার করিবার বস্তু নয়। ‘একটি গাছের নীচে আমি একজন গুরুকে দেখিয়াছিলাম, ষোড়শবর্ষীয় এক যুবক; শিষ্য এক আশীতিবর্ষের বৃদ্ধ। গুরু নীরবে শিক্ষা দিতেছেন, আর শিষ্যের সব সন্দেহ দূরীভূত হইতেছে।’২ কে কথা বলে? সূর্যকে দেখিবার জন্য কে মোমবাতি জ্বালায়? সত্য যখন

প্রকাশ পায়, কোন সাক্ষের প্রয়োজন হয় না। তোমরাও তাহা জানো। ...তোমরাও তাহাই করিবে...উপলব্ধি করিবে। প্রথমে ইহা লইয়া চিন্তা কর। যুক্তি দিয়া বোঝ। কৌতুহল চরিতার্থ কর। তারপর আর কিছু ভাবিও না। কোন কিছুই যদি আমরা না পড়িতাম! ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন! একজন শিক্ষিত লোকের অবস্থা দেখ।

———————

১ ছান্দোগ্য উপ., ৪/ ৯/ ২

২. দক্ষিণামূর্তিস্তোত্রম্ ১২

‘এ কথা বলা হয়, এবং সে কথা বলা হয়।...’

‘বন্ধু, আপনি কি বলেন?’

‘আমি কিছুই বলি না।’

তিনি শুধু উদ্ধৃত করেন অন্যের চিন্তা; কিন্তু নিজে কিছুই করেন না। এই যদি শিক্ষা হয়, তাহা হইলে পাগলামি আর কাহাকে বলে? যাঁহারা গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের দিকে চাও!...এই-সব আধুনিক লেখকগণ–দুইটি বাক্যও তাহাদের নিজেদের নয়! সবই উদ্ধৃতি!...

পুঁথির মূল্য খুব বেশী নয়, আর পরের মুখে শোনা, ধর্মের তো কোন মুল্যই নাই। ইহা ঠিক আহারের মতো। তোমার ধর্ম আমাকে সন্তুষ্ট করিবে না। যীশু ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, বুদ্ধও করিয়াছিলেন। তুমি যদি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ না করিয়া থাকো, তুমি নাস্তিক অপেক্ষা বেশী কিছু নও। সেই নির্বাক; আর তুমি কেবলই বক্ বক্ কর, আর পৃথিবীকে বিরক্ত কর। পুঁথি, বাইবেল আর ধর্মগ্রন্থের কোন প্রয়োজন নাই। বাল্যকালে আমি একটি পৌঢ়কে দেখিয়াছিলাম, তিনি কোন ধর্মগ্রন্থ পড়েন নাই, কিন্তু স্পর্শদ্বারা তিনি অপরের মধ্যে ঈশ্বরীয় অনুভূতি সঞ্চারিত করিতে পারিতেন।

‘হে পৃথিবীর গুরুবৃন্দ, তোমরা চুপ কর। স্তব্ধ হও, গ্রন্থরাজি! হে প্রভু, তুমি শুধু কথা বলো, আর তোমার ভৃত্য শুনুক।১...সেখানে যদি সত্য না থাকে, তাহা হইলে এ জীবনের আর

প্রয়োজন কি? আমরা সকলেই ভাবি, ইহাকে ধরিতে পারিব, কিন্ত পারি না। আমরা অনেকেই শুধু ধুলা ধরিয়া থাকি। ঈশ্বর সেখানে নাই। ঈশ্বরই যদি নাই, তবে জীবনের দরকার কি? এই পৃথিবীতে কি বিশ্রাম-স্থান কোথাও আছে? আমাদিগকেই সে সন্ধান করিতে হইবে; কিন্তু তীব্রভাবে সে সন্ধান আমরা করি না। আমরা স্রোত-তাড়িত ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডের মতো।

সত্য যদি থাকে, ঈশ্বর যদি থাকেন, আমাদের অন্তরেই আছেন।...আমাকে বলিতে হইবে, 'তাঁহাকে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।' নতুবা আমার কোন ধর্ম নাই। কতকগুলি বিশ্বাস, মতবাদ আর উপদেশে ধর্ম হয় না।

---

১ Imitation of Christ

উপলব্ধি—ঈশ্বরপ্রত্যক্ষই একমাত্র ধর্ম। সমগ্র বিশ্ব যাঁহাদের পূজা করে, সেই-সব মানুষের গৌরব কিসে? তাঁহাদের কাছে ঈশ্বর একটি মতবাদমাত্র নয়। পিতামহ বিশ্বাস করিতেন বলিয়া কি তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন? না। নিজেদের দেহ, মন—সব কিছুর ঊর্ধ্বে যে অসীম, তাঁহার উপলব্ধিতেই তাঁহাদের গৌরব। সেই ঈশ্বরের তিলমাত্র প্রতিবিম্ব আছে বলিয়াই এই পৃথিবী সত্য। আমরা ভাল লোককে ভালবাসি, কারণ তাঁহার মুখে সেই প্রতিবিম্ব আরও একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠে। নিজেদেরই উহা ধরিতে হইবে। অন্য কোন পথ নাই।

সেই তো লক্ষ্য। তাহার জন্য সংগ্রাম কর! নিজের বাইবেল রচনা কর। নিজের খ্রীষ্টকে আবিষ্কার কর। নতুবা তোমরা ধার্মিক নও। ধর্মের কথা বলিও না। মানুষ কথার পর কথা বলিয়া যায়। 'তাহাদের মধ্যে অনেকে অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকিয়াও অন্তরের গর্বে ভাবে, সেই আলোক তাহারা পাইয়াছে। আর শুধু তাহাই নয়, অপরকেও তাহার ঘাড়ে লইতে চায় এবং উভয়েই গর্তে পড়িয়া যায়।' ১

শুধু গীর্জাই কাহাকেও রক্ষা করিতে পারে না। মন্দির বা গির্জার আশ্রয়ে জন্মগ্রহণ করা ভাল, কিন্তু সেখানেই যাহার মৃত্যু হয়, সে বড়ই হতভাগ্য! সে কথা থাক!...আরম্ভটা

ভাল, কিন্তু সে কথাও থাক। সে তো শৈশবের স্থান...কিন্তু তাই হোক! ...ঈশ্বরের কাছে সোজা চলিয়া যাও। কোন ধারণা নয়, কোন মতবাদ নয়। একমাত্র তাহা হইলেই সব সন্দেহ দূর হইবে।... যাহা কিছু বাঁকা, তাহা একমাত্র তখনই সোজা হইবে।...

‘বহুর মধ্যে যিনি এককে দেখেন, বহু মৃত্যুর মধ্যে যিনি দেখেন সেই এক জীবনকে, বহুর মধ্যে যিনি তাঁহাকে দেখেন, যিনি নিজের অপরিবর্তনীয় আত্মাকে দেখেন, তিনিই শাশ্বত শান্তির অধিকারী।

৯. সুবিদিত রহস্য

সুবিদিত রহস্য

ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত লস্ এঞ্জেলেস্-এ প্রদত্ত বক্তৃতা।

বস্তুর স্বরূপ অবধারণ করিতে গিয়া আমরা যে-উপায়ই অবলম্বন করি না কেন, গভীর বিশ্লেষণের ফলে আমরা দেখিতে পাই, বস্তুর যে-স্বরূপ আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়, তাহাকে আপাততঃ স্ববিরোধী ছাড়া আর কিছু বলা চলে না; তাহা যুক্তির অগম্য হইলেও সত্য। প্রাথমিক দৃষ্টিতে যে-কোন বস্তুই সসীম বলিয়া মনে হয়; কিন্তু উহাকে বিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করিলে—কি গুণের দিক দিয়া, কি সম্ভাবনার দিক দিয়া কি শক্তির দিক দিয়া, কি সম্বন্ধের দিক দিয়া উহার কোন অন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; বিচারের দৃষ্টিতে উহা অসীম হইয়া দাঁড়ায়। একটি ফুলের কথাই ধরা হউক। ফুল তো ক্ষুদ্র, সসীম পদার্থ, কিন্তু কে বলিতে পারে, সে ফুলের সম্বন্ধে সবই জানে? সামান্য একটি ফুলের সম্বন্ধেও জ্ঞানের শেষ সীমায় পৌঁছানো কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ ফুলটি প্রথমে সসীম বলিয়া প্রতীত হইলেও বিচারের দৃষ্টিতে অসীমে পরিণত হইয়াছে। একটি ক্ষুদ্র বালুকণাকে বিশ্লেষণ করিলেও বুঝা যায়, উহা আপাতদৃষ্টিতে সসীম হইলেও বস্তুত অসীম ; তথাপি বালুকণা আমরা সসীম পদার্থ বলিয়াই মনে করিয়া আসিতেছি, ফুলও তেমনি আমাদের কাছে সসীম পদার্থ বলিয়া বিবেচিত হয়।

আমাদের অন্তরের এবং বাহিরের সকল চিন্তা ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে এই একই কথা। আমরা প্রথমে সামান্য জিনিস মনে করিয়া যাহা কিছু চিন্তা করিতে আরম্ভ করি, অতি অল্পকাল-মধ্যেই তাহা আমাদের জ্ঞানের পরিধি অতিক্রম করিয়া অনন্তের গভীরে ডুবিয়া যায়। অনুভূত বস্তুর মধ্যে আমরা নিজেরাই প্রতম ও শ্রেষ্ঠ। অস্তিত্বের কথা ভাবিতে গেলেও ধাঁধায় পড়িতে হয়। আমাদের অস্তিত্ব আছে। আমরা সসীম জীব। আমরা জীবনধারণ করি এবং মরিয়া যাই। আমাদের দিগন্ত সীমাদ্ধ। আমরা জানি—আমাদের সত্তা সসীম,

আমাদের জীবনের পরিণতি মৃত্যু, আমাদের দিঙ্‌মণ্ডল স্বল্পপ্রসারী; আমরা চারিদিকে জগৎ-পরিবেষ্টিত হইয়া সঙ্কীর্ণ জীবন যাপন করিতেছি। বিশ্বপ্রকৃতি যে-কোন মুহূর্তে আমাদিগকে চূর্ণ করিয়া আমাদের সত্তার বিলোপ ঘটাইতে পারে। বিশাল বিশ্বের সম্মুখে আমাদের ক্ষুদ্র দেহগুলি কোনমতে টিকিয়া আছে, মুহূর্তমধ্যে ইহারা ভাঙিয়া পড়িতে পারে। আমরা জানি, কর্মক্ষেত্রে আমরা কত শক্তিহীন। প্রতিনয়তই আমাদের ইচ্ছা প্রতিহত হইতেছে। কত শত ইচ্ছা আমরা পূর্ণ করিতে চাই, কিন্তু কয়টি ইচ্ছা আমরা পূর্ণ করিতে পারি? আমাদের বাসনা অনন্ত । আমরা সব কিছুই কামনা করিতে পারি। অন্য বাসনা তো তুচ্ছ, সুদূর নীলাকাশের লুব্ধক নক্ষত্রে যাইব, এইরূপ বাসনাও আমরা পোষণ করিতে পারি। কিন্তু কয়কটি বাসনা আমরা পূর্ণ করিতে পারি? আমাদের দেহ অপটু, বহিঃপ্রকৃতি ইচ্ছার প্রতিকূল, আমরা দুর্বল। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, আমাদের আর একটি দিক আছে। ক্ষুদ্র ফুলটি কিংবা সূক্ষ্ম বলকণাটি যেমন একাধারে সসীম ও অসীমের দ্যোতক, আমাদের স্বরূপও সেইরূপ। আমরা সমুদ্রের তরঙ্গের মতো। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে তরঙ্গটি সমুদ্র ভিন্ন আর কিছু নয়, আবার অন্য দিক দিয়া বিচার করিলে তরঙ্গ এবং সমুদ্রের পার্থক্য স্পষ্ট। তরঙ্গের এমন কোন অংশ নাই, যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা যায় না যে, ইহা সমুদ্রই। 'সমুদ্র' নামটি শুধু তরঙ্গ সম্বন্ধে নয় , সমুদ্রের সকল অংশ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, তথাপি সমুদ্র তরঙ্গ হইতে পৃথক্। সত্তারূপ বিরাট সমুদ্রের মধ্যে আমরা এক-একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গের মতো; কিন্তু আমরা যখন আমাদের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে যাই, তখন আমরা বুঝিতে পারি, আমাদের সত্তাকে ধরা সম্ভব নয়, কারণ আমরা অসীম হইয়া পড়িয়াছি।

আমরা যেন স্বপ্নে বিচরণ করিতেছি। যতক্ষণ মন স্বপ্নাবস্থায় থাকে, ততক্ষণ কিছুই অস্বাভাবিক মনে হয় না, কিন্তু যখনই স্বপ্নের বিষয়কে বাস্তব বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করা হয়, তখনই উহা অদৃশ্য হয়। কেন?—স্বপ্ন মিথ্যা বলিয়া নয়, স্বপ্নের স্বরূপ আমাদের যুক্তি বিচার ও বুদ্ধির অগোচর বলিয়া। জীবনে অনুভূত প্রত্যেকটি বস্তু এত বিরাট যে, তাহার তুলনায় আমাদের বুদ্ধি অতি তুচ্ছ। বুদ্ধি চায় নিজের উদ্ভাবিত কতকগুলি নিয়মের মধ্যে বস্তুকে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে, কিন্তু বস্তু কখনও বুদ্ধির নিগড়ে

আবদ্ধ হইতে স্বীকৃত হয় না। বস্তুকে নিয়মের জালে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বুদ্ধির এই প্রচেষ্টা মানবাত্মার ক্ষেত্রে আরও সহস্রগুণ ব্যর্থ বলিয়া প্রতীত হয়। বস্তুতঃ বিশ্বের সকল পদার্থের মধ্যে 'আমরা নিজেরাই' সর্বাধিক রহস্যময়।

সব কিছুই বিস্ময়কর! মানুষের চোখের দিকে তাকাও! কত সহজে ইহা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। অথচ তোমার চোখ দেখিতেছে বলিয়াই প্রকাণ্ড সূর্যের অস্তিত্ব। সেই রহস্যের কথা ভাবো! ক্ষুদ্র অসহায় চোখ-দুটি! একটা তীব্র আলোক কিংবা একটা কাঁটা চোখ-দুটিকে নষ্ট করিয়া দিতে পারে। তবু সবচেয়ে শক্তিশালী ধ্বংসকারী যন্ত্র, প্রলয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মহাবিস্ময়কর চন্দ্র সূর্য তারকা পৃথিবী প্রভৃতির অস্তিত্ব এই দুইটি ক্ষুদ্র চোখের উপর নির্ভর করে! তোমার চোখই বিশ্বের অস্তিত্বের সাক্ষী। চোখ বলে, 'এই তো বিরাট বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রকৃতি সম্মুখে রহিয়াছে'; আমরা চোখের সাক্ষ্যে বিশ্বাস করিয়া প্রকৃতির বিচিত্র রূপের অস্তিত্ব স্বীকার করি। এইভাবে ক্ষুদ্র কান, নাক, জিভ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা বিপুল বিশ্বের পরিচয় লাভ করি।

কিন্তু বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে কে ক্ষুদ্র, কে মহৎ, কে দুর্বল, কে সবল, কে উচ্চ, কে নীচ—তাহা নিশ্চয় করিয়া বলার উপায় নাই, কারণ এই বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের পরস্পর-নির্ভরশীলতা এমন অদ্ভুত যে, ক্ষুদ্রতম পরমাণুটির সত্তাও সমগ্র জগতের অস্তিত্বের পক্ষে অত্যাবশ্যক। কেহই ছোট নয়, কেহই বড় নয়। সব কিছুই এক অসীম পরম সত্যের সহিত বিজড়িত, সব কিছুই অনন্ত সমুদ্রে ভাসমান, সব কিছুই তত্ত্বতঃ অসীম। স্থূল বৃক্ষাদি ও সূক্ষ্ম বালুকাদি যাহা দেখা যায়, সুখ-দুঃখাদি যাহা অনুভব করা যায়—সব কিছুই বস্তুতঃ অসীম। প্রত্যেকটি জীব, প্রত্যেকটি চিন্তা, প্রত্যেকটি পরিচ্ছন্ন সত্তাই স্বরূপতঃ অসীম। আমাদের সত্তার রহস্য এই যে, আমরা অসীম হইয়াও সসীম এবং সসীম হইয়াও অসীম।

ইহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় অসীমের এই উপলব্ধি আমাদের প্রায় অজ্ঞাত। আমরা আমাদের অসীমত্ব ভুলিয়া গিয়াছি, তাহা নয়, কারণ নিজের প্রকৃত স্বরূপ কেহই ভুলিতে পারে না। কেহ কি কখনও নিজের ধ্বংস কল্পনা করিতে পারে? কে ভাবিতে পারে, সে মরিয়া যাইবে?—কেহই এইরূপ চিন্তা করিতে পারে না। অসীমের

সহিত আমাদের সম্বন্ধ-বোধ অজ্ঞাতসারেও আমাদের মধ্যে কাজ করিতে থাকে। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহা আমাদের স্বরূপ-বিস্মৃতি এবং ইহাই আমাদের সকল দুঃখের মূল।

দৈনন্দিন ব্যাবহারিক জীবনে দেখা যায় যে, আমরা সামান্য কারণেই ব্যথিত হই, ক্ষুদ্র সত্তার দাসত্ব স্বীকার করি। আমরা মনে করি, আমরা সসীম—ক্ষুদ্র জীব। এই ধারণা হইতেই আমাদের দুঃখের উৎপত্তি। তথাপি আমরা যে অসীম, এই ধারণা পোষণ করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। আমরা যখন দুঃখ-দুর্দশায় পতিত হই, আমরা যখন তুচ্ছ বিষয়ে বিচলিত হই, তখন আমাদের এই বিশ্বাস জাগ্রত করা উচিত যে, আমরা অসীম। বস্তুতঃ আমরা অসীমই। জ্ঞাতসারে হউক কিংবা অজ্ঞাতসারে হউক, আমরা তো অসীম অনন্তের সন্ধানেই ছুটিতেছি; আমরা সর্বদা এমন কিছু খুঁজিতেছি, যাহা মুক্ত।

জগতে কোনদিন এমন জাতি ছিল না, যাহাদের ধর্ম ছিল না বা যাহারা কোন না কোন প্রকার ঈশ্বর অথবা দেবতার পূজা করিত না। ঈশ্বর আছেন কিনা, দেবতারা আছেন কিনা, এই-সকল প্রশ্নের প্রয়োজন নাই। আসল প্রশ্ন, মানুষের মনোবৃত্তি বিশ্লেষণ করিলে কোন্ তথ্য আবিষ্কৃত হয়? সারা জগতের লোক একজন ঈশ্বরের খোঁজ করে কেন? মানুষের কত বাধা, কত বন্ধন! নিয়মের ভয়াবহ নিষ্পেষণ তাহাকে কোন দিকে নড়িতে দেয় না। সে যাহা কিছু করিতে চায়, তাহাতেই নিয়মের বাধা। সর্বত্রই নিয়ম। কিন্তু এত বাধা এবং নিষ্পেষণ সত্ত্বেও মানুষের আত্মা তাহার স্বাধীনতা বিস্মৃত হয় না, সে খোঁজে মুক্তি। জগতে যত ধর্মমত আছে, তাহাদের সকলেরই লক্ষ্য এক—সকল ধর্মই খোঁজে মুক্তি। মানুষ জানুক আর নাই জানুক, স্পষ্ট ভাষায় বুঝাইয়া বলিতে পারুক আর নাই পারুক, মুক্তির ধারণা, স্বাধীনতার ভাব তাহার স্বভাবগত। মানুষের মধ্যে যাহারা অতি সাধারণ, যাহারা নিতান্ত অজ্ঞ, তাহারাও এমন কিছু খোঁজে, যাহা প্রকৃতির নিয়মের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে। কেউ দানবের খোঁজ করে, কেউ ভূতের খোঁজ করে, কেউ বা দেবদেবীর খোঁজ করে। এই দানব, ভূত বা দেবতার নিকট প্রকৃতি সর্বশক্তিময়ী নয়, তাহার দৃষ্টিতে প্রাকৃতিক নিয়ম তুচ্ছ, কারণ সে প্রকৃতিকে দমন করিতে পারে। মানুষের হৃদয়ের চিরন্তন

আকাঙ্ক্ষা : আহা, যদি এমন কাহাকেও পাওয়া যাইত, যিনি নিয়মের নিগড় ভাঙিয়া দিতে পারেন! আমরা তো সর্বদা তাঁহারই খোঁজ করিতেছি, যিনি নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারেন। একটি ধাবমান ইঞ্জিন রেলপথে অগ্রসর হইতেছে, আর উহার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে একটি ক্ষুদ্র কীট সরিয়া যাইতেছে। তখনই আমরা বলি : ইঞ্জিনটি যত প্রকাণ্ডই হউক, উহা জড় পদার্থ, উহা একটি যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়; উহা যতই শক্তিশালী হউক না কেন, উহা কে নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়; মানুষ যে দিকে চালাইতে চায়, সেই দিকেই উহাকে চলিতে হয়; উহা কখনও নিয়মকে অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু কীটটি ক্ষুদ্র হইলেও নিয়ম লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করে, নিজেকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে। নিয়মকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিতে পারুক বা নাই পারুক, নিয়মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সে তাহার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে। ইহাই তাহার মধ্যে ভবিষ্যৎ অসীমত্ব বা ঐশী সত্তার লক্ষণ।

নিয়মের বিরুদ্ধে স্বাধীন ইচ্ছার এই আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মার এই মুক্তিপ্রবণতা সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক ধর্মেই ঈশ্বর বা কোন দেবতার আকারে ইহা প্রতিফলিত হয়। কিন্তু ইহা সর্বৈব বাহিরের—যাহারা দেবতাকে কেবল বাহিরেই দেখে, তাহাদের জন্য। মানুষ প্রথমে নিজেকে নিতান্তই তুচ্ছ মনে করিয়াছিল; তাহার ভয় হইয়াছিল, সে হয়তো কোনদিনই মুক্ত হইতে পারিবে না। এইজন্য সে প্রকৃতির বাহিরে এমন একজনের খোঁজ করিতেছিল, যিনি স্বভাবতঃ মুক্ত। তারপর তাহার মনে হইল, বাহিরে এইরূপ অসংখ্য মুক্ত সত্তা বা দেবতা আছেন। ক্রমে মানুষ সকল দেবতাকে এক দেবাদিদেব পরমেশ্বরে মিলিত করিল। কিন্তু তাহাতেও মানুষ তৃপ্ত হইতে পারে নাই। যে যখন চরম সত্যের দিকে আরও অগ্রসর হইল, তখন সে বুঝিতে পারিল যে, সে নিজে যাহাই হউক না কেন, যিনি সকল দেবতার দেবতা, যিনি সকল প্রভুর প্রভু, তাঁহার সহিত তাহার নিজের কোন সম্বন্ধ আছে। সে বদ্ধ, হীনমতি এবং দুর্বল হইলেও পরমেশ্বরের সহিত সম্পর্কযুক্ত। এইভাবে মানুষের দৃষ্টি খুলিল, চিন্তার উন্মেষ হইল এবং জ্ঞানের প্রসার হইল। মানুষ ক্রমশঃ সেই পরমেশ্বরের নিকটবর্তী হইতে লাগিল। অবশেষে সে বুঝিল, এক সর্বশক্তিমান্ মুক্ত আত্মাকে খুঁজিতে গিয়া তাহার মানসপটে পরমেশ্বর ও নানা দেবতার যে দৃশ্য প্রতিভাত

হইয়াছে, সেই দৃশ্য তাহার নিজেরই সম্বন্ধে নিজভাবের প্রতিচ্ছবি মাত্র। সত্য আবিষ্কৃত হইল—সে বুঝিল, পরমেশ্বর নিজেরই অনুরূপ করিয়া মানুষকে গড়িয়াছেন, ইহাই শুধু সত্য নয়, মানুষ নিজের মতো করিয়া পরমেশ্বরকে গড়িয়াছে, ইহাও সত্য।

এরূপেই মানুষ স্বরূপতঃ মুক্ত—এই বোধ জাগ্রত হইল। সেই পরমেশ্বর সদা অন্তরে বিরাজমান, আমাদের নিকটতম। এতকাল আমরা তাঁহাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিলাম, অবশেষে বুঝিলাম—তিনি আমাদের অন্তরের অন্তরে।

গল্পে আছে, এক ব্যক্তি তাহার নিজের হৃৎস্পন্দনের শব্দকে গৃহের দরজায় ধাক্কা বলিয়া ভুল করিয়াছিল। প্রথমে একবার দরজা খুলিয়া সে দেখিল, বাহিরে কেহ নাই। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সে আবার সেই দরজায় ধাক্কার শব্দ শুনিয়া বিস্মিত হইল। এবারও দরজা খুলিয়া বাহিরে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। অবশেষে সে বুঝিতে পারিল যে, উহা তাহার নিজেরই হৃৎস্পন্দনের শব্দ। মানুষের অবস্থা এই গল্পের লোকটির মতো। এক অনন্ত মুক্ত সত্তার সন্ধানে বাহির হইয়া মানুষ যখন গন্তব্যস্থলে পৌঁছিল, তখন তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, এতদিন সে বহির্জগতে যাঁহাকে অনন্ত মুক্ত সত্তা বলিয়া কল্পনা করিয়াছে, তিনি তাহার স্বরূপেরই বহিঃপ্রকাশ—সকল আত্মার আত্মা। এই সত্যস্বরূপ সে নিজেই।

এইরূপেই মানুষ একদিন বুঝিতে পারে, তাহার সত্তার মধ্যে এক অদ্ভুত দ্বৈতভাব বিদ্যমান। সে একাধারে অসীম ও সসীম। যিনি অসীম, তিনিও তাহারই আত্মা। অসীম অনন্ত পরব্রহ্ম যেন বুদ্ধির জালে পড়িয়া সসীম জীবকুলের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন। কিন্তু ইহাতে ব্রহ্মের স্বরূপে কোন বিকার উপস্থিত হয় নাই। তিনি অবিকৃতই রহিয়াছেন।

যিনি আমাদের আত্মার আত্মা, তাঁহাকে নিত্য মুক্ত আনন্দময় ও নির্বিকার পরব্রহ্ম বলিয়া জানাই প্রকৃত জ্ঞান। এই জ্ঞানই আমাদের সুদৃঢ় ভিত্তি, আমাদের আশ্রয়স্থল। ইহার মধ্যেই মৃত্যুর চির অবসান, দুঃখের চির নিবৃত্তি এবং অমৃতত্বের আবির্ভাব। যিনি বহুর মধ্যে এক,

যিনি পরিনামশীল জগতের মধ্যে এক অপরিনামী সত্তা -তাহাকে যিনি নিজের আত্মা-রূপে উপলব্ধি করেন, শুধু তিনিই শাশ্বত শান্তির অধিকারী, অপর কেহ নয়।

মানুষ যখন দুঃখ-দুর্দশার অন্ধকারে পড়ে, তখন এই আত্মা স্বীয় জ্যোতির প্রভাবে তাহাকে জাগ্রত করে; মানুষ জাগিয়াই বুঝিতে পারে, যাহা সত্য-সত্যই তাহার নিজস্ব, তাহা সে কখনও হারাইতে পারে না। না, যাহা আমাদের নিজস্ব, তাহা আমরা হারাইতে পারি না। কে তাহার স্বরূপ হারাইতে পারে? যদি আমি ভাল হই, তাহা হইলে আমার সত্তাই প্রথম স্বীকৃত হয়, তারপর সেই সত্তাই ভাল গুণে রঞ্জিত হয়। যদি আমি মন্দ হই, তাহা হইলেও আমার সত্তাই প্রথম স্বীকৃত হয়, তারপর সেই সত্তাই দোষ দ্বারা রঞ্জিত হয়। আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে—সর্বত্রই এক অদ্বিতীয় সত্তা বা 'সৎ' বিদ্যমান। সৎ-এর ধ্বংস নাই।

অতএব সকলেরই আশা আছে। কেহই বিনষ্ট হইতে পারে না; কেহই চিরকাল হীন থাকিতে পারে না। জীবন একটা ক্রীড়াক্ষেত্র ছাড়া কিছু নয়, ক্রীড়া যতই স্থূল হউক না কেন। আমরা যতই দুঃখ-ক্লেশ ও আঘাত পাই না কেন, তাহাতে আত্মার কোন অনিষ্ট হয় না, আত্মা অচল ও সনাতন। আমরা সেই নিত্য আত্মা।

বৈদান্তিক বলেন, 'আমার ভয় নাই, সংশয় নাই, মৃত্যু নাই; আমার পিতা নাই, মাতা নাই; আমার কখনও জন্ম হয় নাই। আমার শত্রুই বা কে? আমিই যে সব কিছু। আমি সচ্চিদানন্দ, আমি ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম। কাম, ক্রোধ, লোভ, মাৎসর্য, কুচিন্তা প্রভৃতি আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ আমি সচ্চিদান্দ, আমি ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম।'

এই ভাবনাই সকল ব্যাধির মহৌষধ, ইহাই মৃত্যুহর অমৃত। আমরা এই জগতে আছি; আমাদের স্বরূপ সেই জগৎকে মানিয়া লইতে চায় না, উহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আমাদিগকে বার বার বলিতে দাওঃ আমি সেই, আমি সেই। আমার ভয় নাই সংশয় নাই, মৃত্যু নাই। আমি স্ত্রী নই পুরুষ নই; আমার সম্প্রদায় নাই, বর্ণও নাই। আমার কি মত থাকিতে পারে? এমন কোন্ সম্প্রদায় আছে, আমি যাহার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারি? কোন্ সম্প্রদায় আমাকে ধরিয়া রাখিতে পারে? আমি তো সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই

বিদ্যমান! দেহ যতই প্রতিকূল আচরণ করুক, মন যতই বিদ্রোহী হউক, যখনই চারিদিক হইতে গভীরতম অন্ধকার, তীব্র বেদনাময় উৎপীড়ন এবং অকূল নৈরাশ্য আসিয়া ঘিরিবে, তখনই এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, 'আমি ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম'—একবার নয়, দুইবার নয়, তিনবার নয়, বার বার।

বার বার আমি মৃত্যুর কবলে পড়িয়াছি। কতবার দিনের পর দিন অনাহারে কাটিয়াছে, কতবার পায়ে নিদারুণ ক্ষত দেখা দিয়াছে, হাঁটিতে অক্ষম হইয়া ক্লান্তদেহে বৃক্ষতলে পড়িয়া রহিয়াছি, মনে হইয়াছে এইখানেই জীবনলীলা শেষ হইবে। কথা বলিতে পারি নাই, চিন্তাশক্তি তখন লুপ্তপ্রায়।

কিন্তু অবশেষে ঐ মন্ত্র মনে জাগিয়া উঠিয়াছে : আমার ভয় নাই, মৃত্যু নাই; আমার ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই। আমি ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম। বিশ্বপ্রকৃতির সাধ্য নাই যে, আমাকে ধ্বংস করে। প্রকৃতি আমার দাস। হে পরমাত্মন্, হে পরমেশ্বর, তোমার শক্তি বিস্তার কর। তোমার হৃতরাজ্য পুনরধিকার কর। উঠ, চলো, থামিও না। এই মন্ত্র ভাবিতে ভাবিতে আমি নবজীবন লাভ করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছি এবং আজ এখানে সশরীরে বর্তমান আছি। সুতরাং যখনই অন্ধকার আসিবে, তখনই নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিও, দেখিবে—সকল বিরুদ্ধ শক্তি বিলীন হইয়া যাইবে। বিরুদ্ধ শক্তিগুলি তো স্বপ্ন মাত্র। জীবন-পথের বাধাবিঘ্নগুলি পর্বতপ্রমাণ, দুর্লঙ্ঘ্য ও বিষাদময় বলিয়া মনে হইলেও এগুলি মায়া ছাড়া আর কিছুই নয়। ভয় করিও না, দেখিবে উহারা দূরে চলিয়া গিয়াছে। নিষ্পেষণ কর, দেখিবে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে; পদদলিত কর, দেখিবে মরিয়া গিয়াছে। ভীত হইও না। বার বার বিফল হইয়াছ বলিয়া নিরাশ হইও না। কাল নিরবধি, অগ্রসর হইতে থাকো, বার বার তোমার শক্তি প্রকাশ করিতে থাকো, আলোক আসিবেই। জগতে প্রত্যেকের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হইতে পারি, কিন্তু তাহাতে কি ফল হইবে? কে তোমাকে সাহায্য করিবে? মৃত্যুর হাত কে এড়াইতে পারিয়াছে? কে তোমাকে মৃত্যু হইতে উদ্ধার করিবে? তোমার উদ্ধারসাধন তোমাকেই করিতে হইবে:। তোমাকে সাহায্য করার সাধ্য অপর কাহারও নাই। তুমি নিজেই তোমার পরম শত্রু, আবার তুমিই তোমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। আত্মাকে

জানো; উঠ, জাগো; ভীত হইও না। দুঃখ ও দুর্বলতার মধ্যে আত্মাকে প্রকাশ কর,—প্রথমে ইহা যতই ক্ষীণ ও অনুভবের অতীত বলিয়া মনে হউক না কেন। তোমার এমন সাহস হইবে যে, তুমি সিংহগর্জনে বলিয়া উঠিবে : আমিই আত্মা , আমিই ব্রহ্ম। আমি পুরুষ নই, স্ত্রীও নই; দেবতা নই, দৈত্যও নই, কোন প্রাণী বা বৃক্ষাদিও নই। আমি ধনী নই, দরিদ্রও নই, পণ্ডিত নই, মূর্খও নই। আমার স্বরূপের তুললায় এই-সকল উপাধি অতি তুচ্ছ। আমি পরমাত্মা, আমি ব্রহ্ম। ঐ যে দেদীপ্যমান চন্দ্র-সূর্য গ্রহনক্ষত্র-নিচয় দেখিতেছে, উহারা আমার প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়াই আলোক বিস্তার করিতেছে। অগ্নির যে রূপ, তাহা আমিই; বিশ্বের যে শক্তি, তাহাও আমি, কারণ আমিই পরমাত্মা, আমিই ব্রহ্ম।

যে মনে করে, 'আমি ক্ষুদ্র', সে ভ্রান্ত, কারণ আমিই তো একমাত্র সত্তা, আমিই সব কিছু। আমি বলি, 'সূর্য আছে', তাই সূর্য আছে; আমি বলি, 'পৃথিবী আছে', তাই পৃথিবী আছে। আমার উপর নির্ভর না করিয়া উহাদের কেহই থাকিতে পারে না, কারণ আমি সচ্চিদান্দ, আমি ব্রহ্ম, আমি চিরসুখী, চিরপবিত্র, চিরসুন্দর। বাহিরের ঐ সূর্য যেমন মানুষের দৃষ্টিশক্তির কারণ হইয়াও কাহারও চোখের দোষে দূষিত হয় না, তেমনি জগতের ভাল-মন্দ আমার স্বরূপকে স্পর্শ করে না। আমি সকল ইন্দ্রিয় এবং সকল বিষয়ের ভিতর দিয়া কাজ করিতেছি, কিন্তু কোন ইন্দ্রিয় বা কোন বস্তুর দোষ আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আমি কোন নিয়ম বা কর্মের অধীন নই। আমি কর্মাধ্যক্ষ। আমি চিরদিন ছিলাম, চিরদিন আছি।

আমাদেরই জনৈক কবি বলিয়াছেন—আমার প্রকৃত সুখ জাগতিক পদার্থে নাই; পতি-পত্নী, পুত্র-কন্যা প্রভৃতি কোন কিছু আমাকে আনন্দ দিতে পারে নাই। আমি অনন্ত নীলাকাশের মতো। কত বিচিত্র মেঘ আকাশের বুকে খেলা করিয়া মুহূর্তমধ্যে দূরে চলিয়া যায়। আবার সেই একই নীলাকাশ। সুখ-দুঃখ শুভাশুভ আত্মাকে আবৃত করিয়া আমাকে মুহূর্তের জন্য অভিভূত করিতে পারে; কিন্তু ইহারা স্থায়ী নয়, অল্পক্ষণের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া যায়। আমি সকল অবস্থাতেই আছি। আমি নিত্য, আমি অপরিণামী, আমি চির-ভাস্বর। দুঃখ আসে আসুক, আমি জানি উহা সসীম; অতএব উহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

অশুভ আসে আসুক, আমি জানি উহাও বিনষ্ট হইবে; কেবল উহাও সসীম, ক্ষণস্থায়ী। একমাত্র আমিই অসীম, আমাকে কোন কিছুই স্পর্শ করিতে পারে না। আমি চিরন্তন, অসীম, অব্যয় পরমাত্মা।

এস, আমরা এই জ্ঞানামৃত পান করি; ইহাই আমাদিগকে অমৃতত্বে পৌঁছাইয়া দিবে। ইহাই অক্ষয় ব্রহ্মলাভের পথ। মা ভৈঃ। আমরা পাপী, আমরা সসীম, আমারা মৃত্যুর অধীন–একথা বিশ্বাস করিও না। ইহা সত্য নয়।

‘আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, নিদিধ্যাসন করিবে।’ হাত যখন কাজ করিবে, মন যেন তখন জপ করিতে থাকে, ‘ আমি ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম।’

যতদিন না এই সত্য তোমার অস্থি-মাংসের সহিত মিশিয়া যায়, যতদিন না তোমার অন্তর হইতে নিজের ক্ষুদ্রতা দুর্বলতা দুঃখ এবং অমঙ্গলের ভয়াবহ স্বপ্ন চিরতরে তিরোহিত হয়, ততদিন জাগরণে ও স্বপ্নে ইহা চিন্তা কর এবং তখনই পরম সত্য তোমার নিকট আর ক্ষণকালও আত্মগোপন করিয়া থাকিবে না।

১০. জ্ঞানলাভের সোপানশ্রেণী

জ্ঞানলাভের সোপানশ্রেণী

আমেরিকায় বেদান্ত-শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা।

জ্ঞনমার্গের সাধকের সর্বপ্রথম আবশ্যক—শম ও দম। এই দুইটির ব্যাখ্যা একসঙ্গেই করা যাইতে পারে। ইহাদের অর্থ ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখী হইতে না দিয়া স্ব স্ব কেন্দ্রে সংস্থাপিত করা। আমি প্রথম তোমাদের বলিব 'ইন্দ্রিয়' শব্দের অর্থ কি। ধর, চোখগুলি রহিয়াছে; এই চোখগুলি দর্শনেন্দ্রিয় নয়, ইহারা দর্শনক্রিয়ার যন্ত্রমাত্র। যখন দর্শনেন্দ্রিয় না থাকে , তখন চক্ষু থাকিলেও দেখিতে পারি না। কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয় রহিয়াছে, দর্শণের যন্ত্র চক্ষুও রহিয়াছে, কিন্তু যতক্ষণ মন এই দুইটির সহিত সংযুক্ত না হইবে, ততক্ষণ দর্শনক্রিয়া হয় না। সুতরাং প্রত্যেক প্রত্যক্ষব্যাপারে তিনটি বস্তু আবশ্যক—প্রথমতঃ বাহ্য করণাবলী, তারপর অন্তরিন্দ্রিয়সমূহ এবং সর্বশেষে মন। ইহাদের যে-কোন একটি না থাকিলে কোন প্রকার প্রত্যক্ষ্য হইবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে মন, বাহ্য ও আভ্যন্তর দুইটি করণ-সহায়ে কাজ করে। যখন আমি কোন কিছু দেখি, আমার মন বাহির হইয়া যায় এবং বাহ্য বস্তুর আকার ধারণ করে। কিন্তু মনে কর আমি চোখ বুজিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিলাম; মন তখন বাহিরে যায় না; ইহা ভিতরেই সক্রিয় থাকে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই ইন্দ্রিয়-গুলি সক্রিয় থাকে। যখন আমি তোমাদের দিকে তাকাই এবং তোমাদের সঙ্গে কথা বলি, তখন ইন্দ্রিয় ও উহাদের যন্ত্রসমূহ উভয়ই কার্যরত থাকে। যখন আমি চোখ বুজিয়া ভাবিতে আরম্ভ করি, তখন ইন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় থাকে, কিন্তু ইহাদের যন্ত্রগুলি সক্রিয় থাকে না। এই ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়া ব্যতীত কোন চিন্তা বা মনন-ক্রিয়া হয় না। তোমরা লক্ষ্য করিবে, তোমাদের কেহই কোন প্রতীকের সাহায্য ছাড়া চিন্তা করিতে পার না। অন্ধলোককেও কোন একটি আকারের মাধ্যমে চিন্তা করিতে হয়। দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবেণেন্দ্রিয় সাধারণতঃ অত্যন্ত সক্রিয়। তোমাদের অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে, 'ইন্দ্রিয়' শব্দের অর্থ মস্তিষ্ক-স্থিত স্নায়ুকেন্দ্র। চক্ষু ও কর্ণ দর্শন ও শ্রবণের যন্ত্রমাত্র; ইন্দ্রিয়গুলি রহিয়াছে ভিতরে।

ইন্দ্রিয়গুলি যদি কোন কারণে নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে চক্ষুকর্ণ থাকা সত্ত্বেও আমরা দেখিতে বা শুনিতে পাইব না। সুতরাং মনকে সংযত করিবার জন্য আমাদিগকে প্রথম এই ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিতে হইবে। বাহ্য ও আন্তর বিষয়ে মনের গতি-রোধ করা এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে স্ব স্ব স্থানে স্থপন করা—ইহাই হইল শম ও দম শব্দের অর্থ। মন বা অন্তরিন্দ্রিয়-সংযম হইল শম এবং চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম দম।

তারপর আবশ্যক—উপরতি। ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি সম্বন্ধে চিন্তা না করা কে 'উপরতি' বলা হয়। ইন্দিয়ের বিষয় চিন্তা করিতে করিতেই আমাদের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়—যাহা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি, যাহা দেখিব বা শুনিব, যাহা খাইয়াছি, খাইতেছি বা খাইব, যে যে স্থানে বাস করিয়াছি ইত্যাদি বিষয়েই আমাদের চিন্তা। আমারা প্রায় সব সময়ই ইহাদের সম্বন্ধে চিন্তা করি অথবা কথা বলি। যিনি বেদান্তী হইতে ইচ্ছুক তাঁহাকে এই অভ্যাস অতি অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে।

পরবর্তী সাধন হইল তিতিক্ষা দার্শনিক জীবন দুঃসাধ্য সাধন!—এই সাধনটি সর্বাধিক দুষ্কর। অন্যায়ের প্রতিরোধ না করা সহিষ্ণুতার চরম আদর্শ; তিতিক্ষা ইহা হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে। বিষয়টি একটু পরিষ্কারভাবে বোঝানো দরকার। বাহ্যত অন্যায়ের প্রতিরোধ না করিতে পারি কিন্তু তজ্জন্য অন্তরে দুঃখবোধ হইতে পারে। আমরা অত্যন্ত বিষণ্ণ বোধ করিতে পারি। কোন ব্যক্তি আমার প্রতিঅত্যন্ত রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে, তজ্জন্য বাহ্যতঃ তাহাকে ঘৃণা না করিতে পারি, তাহার কথার প্রত্যুত্তর না দিতে পারে এবং নিজেকে সংযত করিয়া আপাততঃ ক্রোধ প্রকাশ করিতে না পারি, তথাপি আমার অন্তরে ক্রোধ ও ঘৃণা থাকিতে পারে এবং আমি ঐ লোকটির প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করিতে পারি। ইহা আদর্শ অপ্রতিরোধ নয়। এই আদর্শানুসারে আমার মনেও কোন ঘৃণা অথবা ক্রোধের ভাব থাকা উচিত নয়, এমন কি প্রতিরোধের চিন্তাও নয়; আমার মন এত স্থির ও শান্ত থাকিবে যেন কিছুই ঘটে নাই। যখনই আমি সেই অবস্থায় উপনীত হই, তখনই অপ্রতিরোধ-অবস্থা প্রাপ্ত হই; ইহার পূর্বে নয়। দুঃখ প্রতিরোধ করিবার অথবা দূর করিবার চিন্তামাত্র না করিয়া, মনের মধ্যে কোন প্রকার দুঃখময় অনুভূতি অথবা

অনুশোচনা না রাখিয়া সর্ববিধ দুঃখের যে সহন—তাহাই তিতিক্ষা। মনে কর, অশুভের প্রতিরোধ করিলাম, ফলে গুরুতর অনিষ্টপাত হইল। আমার যদি তিতিক্ষা থাকে, তাহা হইলে অশুভ প্রতিরোধ না করার জন্য আমার অনুশোচনা বোধ করা উচিত নয়। সেই অবস্থায় উন্নীত হইলে বলা যায়, মন তিতিক্ষায় প্রতিষ্ঠিত হইল। ভারতবাসীরা এই তিতিক্ষা অভ্যাস করিবার জন্য অসাধারণ কর্ম করিয়া থাকেন। তাঁহারা কিছু গ্রাহ্য না করিয়া অত্যুগ্র শীত ও উষ্ণ সহ্য করেন; তাঁহারা তুষারও গ্রাহ্য করেন না, কেন না দেহ সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনই চিন্তা থাকে না। দেহের ভাবনা দেহই করে, ইহা যেন একটি বাহিরের জিনিস।

অতঃপর যে সাধনের প্রয়োজন, তাহা শ্রদ্ধা। ধর্ম ও ঈশ্বরে প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকা দরকার। যতক্ষণ এই বিশ্বাস না হয়, ততক্ষণ কেহ জ্ঞানী হইবার উচ্চআশা পোষণ করিতে পারে না। একসময় একজন মহাপুরুষ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, এই জগতে দুই কোটি লোকের মধ্যে একজনও ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, 'মনে কর, এই ঘরে একটি চোর রহিয়াছে এবং সে জানিতে পারিল, পাশের ঘরে রাশীকৃত সোনা আছে; ঘর দুইটের মাঝে একটি খুব পাতলা পরদা রহিয়াছে। আচ্ছা, সেই চোরটির কি অবস্থা হইবে?' আমি উত্তর দিলাম, 'চোরটি একেবারে ঘুমাইতে পারিবে না; তাহার মস্তিষ্ক সক্রিয়ভাবে সেই সোনা হস্তগত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে থাকিবে এবং তাহার অন্য কোন চিন্তা থাকিবে না।' তদুত্তরে তিনি বলেন,'তুমি কি বিশ্বাস কর, কোন মানুষ ঈশ্বরবিশ্বাসী হইয়া ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য পাগল হইয়া যাইবে না? যদি কোন লোক আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে, এক অসীম অনন্ত আনন্দের আকর রহিয়াছে এবং তাহা লাভ করা যায়, তাহা হইলে উহা লাভ করিবার চেষ্টায় সে কি পাগল হইবে না?' ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস এবং তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য অনুরূপ আগ্রহকেই বলে 'শ্রদ্ধা' ।

তারপর সমাধান, অর্থাৎ মন ঈশ্বরে একাগ্র করিবার নিয়ত অভ্যাস। কো কিছুই এক দিনে সম্পন্ন হয় না। ধর্ম একটি বটিকার আকারে গিলিয়া ফেলা যায় না। ইহার জন্য প্রতিনিয়ত কঠোর অনুশীলনের দরকার। কেবল ধীর ও নিয়ত অভ্যাস দ্বারা মনকে জয় করা যায়।

তারপর মুকুক্ষুত্ব—মুক্তিলাভের তীব্র ইচ্ছা। তোমাদের মধ্যে যাহারা এড্‌উইন আর্নল্ডের ‘ Light of Asia’ (এশিয়ার আলো) নামক গ্রন্থ পড়িয়াছ, বুদ্ধের প্রথম উপদেশের অনুবাদ নিশ্চয়ই তাহাদের মনে আছে। সেখানে বুদ্ধ বলিয়াছেন :

‘তোমরা নিজেদের জন্যই দুঃখভোগ করিয়া থাকো; অন্য কেহই তোমাদিগকে দুঃখ ভোগ করিতে বাধ্য করে না। তুমি জীবনধারণ কর, মৃত্যুমুখে পতিত হও, জীবন-মৃত্যুর চক্রে বিঘূর্ণিত হইয়া দুঃখের শলাকা, অশ্রুর বেষ্টনী এবং অসারতার মধ্যবিন্দুকে আলিঙ্গন কর—ইহাতে অন্য কেহই তোমাকে ধরিয়া রাখে না।’

আমাদের যাবতীয় দুঃখ আমরা নিজেরাই বাছিয়া লইয়াছি। ইহাই আমাদের প্রকৃতি। একজন বৃদ্ধ চৈনিক ষাট বৎসর কারারুদ্ধ ছিল; কোন নূতন সম্রাটের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। কারগার হইতে বাহির হইয়া সে চীৎকার করিয়া বলিল, ‘আমি আর বাঁচিতে পারিব না।’ তাহাকে আবার সেই বিভীষিকাপূর্ণ রুদ্ধ কারগৃহে যাইতে হইবে। সে আলোক সহ্য করিতে পারে নাই। সে রাজকর্মচারিগণকে বলিল, ‘তোমরা আমাকে মারিয়া ফেলো অথবা কারাগারে পাঠাইয়া দাও।’ তাহাকে কারাগারেই পাঠানো হইল। মানুষ মাত্রেরই ঠিক এইরূপ অবস্থা। আমরা উদ্দামগতিতে সর্বপ্রকার দুঃখের পিছনে ছুটি, দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিতে আমরা অনিচ্ছুক। প্রতিদিন আমরা সুখের পশ্চাতে ধাবিত হই, নাগাল পাইবার পূর্বেই দেখি, উহা বিলীন হইয়া গিয়াছে, আঙুলের ফাঁক দিয়া গলিয়া পড়িয়া গিয়াছে। তবুও আমারা উন্মত্তভাবে সুখান্বেষণ হইতে বিরত হই না, বরং আগাইয়া চলি। এমন মোহান্ধ নির্বোধ আমরা!

ভারতবর্ষের কোন কোন তেলের কলে বা ঘানিতে বলদ ব্যবহার করা হয়। বলদগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া তৈলবীজ পেষণ করে। বলদের কাঁধে একটি জোয়াল আছে। একটুকরা

কাঠ জোয়াল হইতে লম্বমান থাকে এবং ইহার সঙ্গে এক গোছা খড় বাঁধা থাকে। বলদের চোখ-দুইটি এমনভাবে বাঁধিয়া দেওয়া হয় যে, সে কেবল সম্মুখের দিকে তাকাইতে পারে; সুতরাং খড়টুকুর নাগাল পাইবার জন্য সে আপন গলদেশ বাড়াইয়া দেয়, এইরূপ করিতে গিয়া সে কাষ্ঠখণ্ডটিকেই খানিকটা সরাইয়া দেয়। সে আবার চেষ্টা করে, কিন্তু ফল হয় একই। এই ভাবে বার বার চেষ্টা চলিতে থাকে। বলদটি কখনই খড়ের নাগাল পায় না, কিন্তু ইহা পাইবার আশায় বার বার ঘুরিয়া যায় এবং এইভাবেই সে তৈলবীজ পেষণ করে। তুমি ও আমি প্রকৃতির দাসরূপে, সম্পদের দাসরূপে, স্ত্রীপুত্র-পরিজনের দাসরূপে জন্মিয়াছি; এবং আমরা এইভাবেই একটি কল্পিত অবাস্তব তৃণগুচ্ছের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া অসংখ্য জীবন অতিক্রম করিতেছি, অথচ যাহা আমরা আকাঙ্ক্ষা করি, তাহা পাই না। ভালবাসাই আমাদের মহান্ স্বপ্ন; আমরা সকলেই ভালবাসিবার জন্য এবং ভালবাসা পাইবার জন্য চলিয়াছি; আমরা সকলেই সুখী হইবার জন্য চলিতেছি, কখনই দুঃখের সম্মুখীন হই না; কিন্তু যতই আমরা সুখের দিকে অগ্রসর হই, সুখ ততই আমাদের নিকট হইতে দুরে সরিয়া যায়। এইভাবেই জগৎ চলিয়াছে, সমাজ চলিয়াছে। আমরা অজ্ঞানান্ধ, বিষয়ের দাস; অজ্ঞাতসারেই আমাদিগকে বিষয়াসক্তির মূল্য দিতে হয়। তোমরা নিজেদের জীবন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ কর, দেখিবে তাহাতে সুখের মাত্রা কত অল্প এবং জগৎ-প্রপঞ্চের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া বাস্তবিক পক্ষে কত অল্পই লাভ করিয়াছ।

সোলন ও ক্রিসাসের (Solon and Croesus) কথা তোমাদের মনে আছে তো? রাজা সেই মহান্ জ্ঞানী-পুরুষকে বলিলেন, 'এশিয়া-মাইনর খুব সুখের স্থান।' সোলন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সবচেয়ে সুখী কে? বিশেষ সুখী একটি লোকও তো আমি দেখি নাই।' ক্রিসাস বলিলেন, 'ইহা একেবারে বাজে কথা! জগতে আমিই সর্বাপেক্ষা সুখী।' সোলন তখন বলিলেন, 'মহাশয়, আপনার জীবনের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করুন; হঠাৎ কোন সিদ্ধান্ত করিবেন না।' এই কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। কালক্রমে সেই নৃপতি পারসীকদের হস্তে পরাজিত হণ এবং তাহারা জীবন্ত অবস্থায় তাঁহাকে পোড়াইয়া ফেলিবার নির্দেশ দিল। চিতা প্রস্তুত; ক্রিসাস ইহা দেখিবামাত্র চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, 'সোলন! সোলন!!' তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কাহার কথা বলিতেছেন?' উত্তরে

তিনি সোলনের বিষয়টি বিবৃত করিলেন। পারস্য-সম্রাটের মনে লাগিল; তিনি ক্রিসাসের জীবন রক্ষা করিলেন।

আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনকাহিনী এইরূপ। আমাদের উপর প্রকৃতির এইরূপই প্রবল প্রভাব। ইহা বার বার পদাঘাত করিয়া আমাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিতেছে, তবু আমরা অদম্য উত্তেজনা-বশে ইহাকেই অনুসরণ করিতেছি। নৈরাশ্যের পর নৈরাশ্য সত্ত্বেও আমরা সর্বদা অন্তরে আশা পোষণ করিতেছি। এই কুহকিনী আশা আমাদিগকে পাগল করিয়া তোলে; আমরা সর্বক্ষণ সুখের আশা করিতেছি।

প্রাচীন ভারতে একজন মহান্ নৃপতি ছিলেন। তাঁহাকে একদিন চারিটি প্রশ্ন করা হয়; ইহাদের মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল: 'জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বস্তু কি?' তিনি উত্তরে বলেন, 'আশা'। সত্য, ইহাই সর্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক বস্তু। দিবারাত্র আমরা দেখিতে পাই, আমাদের চারিদেকে মানুষ মরিতেছে; তথাপি আমরা মনে করি, আমরা মরিব না। আমরা কখনও মনে করি না যে, আমরা মরিব অথবা দুঃখকষ্ট পাইব। প্রত্যেকেই মনে করে, সে জীবনে সাফল্য লাভ করিবেই—সর্বপ্রকার নৈরাশ্য, বিপর্যয় ও তর্ক-যুক্তি উপেক্ষা করিয়াও সে অন্তরে আশা পোষণ করে। এ জগতে কেহই যথার্থ সুখী নয়। ধর, কোন ব্যক্তি ধনবান্, তাহার প্রচুর খাদ্যদ্রব্য রহিয়াছে; কিন্তু তাহার পরিপাক-শক্তির গোলমাল থাকিলে সে খাইতে পারে না। আর একজনের ভাল পরিপাক-শক্তি আছে, এবং সে সামুদ্রিক পক্ষী 'কর্‌মোর‍্যান্ট' (Cormorant)-এর মতো হজম করিতে পারে, কিন্তু মুখে দিবার মতো কোন খাদ্যই তাহার নাই। কেহ আবার ধনী, কিন্তু নিঃসন্তান। কেহ আবার দরিদ্র—ক্ষুধায় কাতর, কিন্তু তাহার একপাল ছেলেমেয়ে, তাহাদের লইয়া কি যে করিবে, সে বুঝিতে পারে না। এইরূপ হয় কেন? সুখ ও দুঃখ একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। যে সুখকে গ্রহণ করে তাহাকে দুঃখও গ্রহণ করিতে হয়। আমাদের সকলের এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, আমরা দুঃখকে বাদ দিয়া সুখ লাভ করিতে পারি। এই ধারণা আমাদিগকে এমনই পাইয়া বসিয়াছে যে, আমরা নিজেদের ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিতে পারি না।

আমি যখন বস্টনে ছিলাম, একজন যুবক আমার কাছে আসে। সে আমাকে একটুকরা কাগজ দিল; ইহার উপর সে একটি নাম ও ঠিকানা লিখিল। নীচে লেখা ছিল : 'যদি পাইবার উপায় তোমার জানা থাকে, তবে জগতের যাবতীয় ঐশ্বর্য ও সুখ তোমারই। আমার কাছে আসিলে বলিয়া দিব, কি ভাবে তাহা লাভ করা যায়। ইহার জন্য পাঁচ ডলার দিতে হইবে।' সে আমাকে কাগজখানি দিয়া বলিল, 'এ-সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?' আমি বলিলাম, 'ইহা ছাপিবার জন্য তুমি অর্থের ব্যবস্থা কর না কেন? ইহা ছাপিবার জন্য তোমার যথেষ্ট অর্থ নাই।' সে আমার কথা বুঝিতে পারিল না। কোন প্রকার কষ্ট স্বীকার না করিয়া সে প্রচুর সুখ ও অর্থ লাভ করিতে পারিবে—এই ধারণায় সে ছিল মশগুল। মানুষ দুইটি চরম সীমার দিকে ছুটিতেছে : একটি চূড়ান্ত শুভবাদ—যাহাতে সবকিছুই শুভ, সুন্দর ও গোলাপী বলিয়া মনে হয়। অপরটি চূড়ান্ত দুঃখবাদ—যাহাতে সবকিছুই তাহার নিকট বিরোধী বলিয়া প্রতীত হয়। অধিকাংশ লোকের মস্তিষ্ক কমবেশী অপরিণত। দশ লক্ষের মধ্যে একজনের মস্তিষ্ক সুপরিণত দেখা যায়। বাকী যাহারা, তাহারা—হয় অদ্ভুত খেয়ালী অথবা বাতিকগ্রস্ত।

স্বভাবতই আমরা সর্ববিষয়ে চূড়ান্ত সীমার দিকে ধাবিত হই। যখন আমরা সুস্থ থাকি ও আমাদের বয়স অল্প, তখন আমরা মনে করি—জগতের সমস্ত ধন আমদের করায়ত্ত হইবে; কিন্তু পরে বয়স বাড়িলে সমাজ যখন আমাদিগকে ফুটবলের মতো চারিদিকে আঘাতে জর্জরিত করে, তখন এক কোণে বসিয়া বিরক্তির অস্ফুট শব্দ উচ্চরণপূর্বক আমরা অপরকে নিরুৎসাহ করিয়া দিই। অল্প লোকেই জানে যে, সুখের সঙ্গে দুঃখ আসে, এবং দুঃখের সঙ্গে আসে সুখ। দুঃখ যেমন বিরক্তিকর, সুখও তাই; সুখ দুঃখের যমজ ভ্রাতা। মানুষ দুঃখের পশ্চাতে ছুটিবে— ইহা তাহার মর্যাদার পক্ষে হানিকর; আবর সে সুখের পশ্চাতে ধাবিত হইবে—ইহাও সমভাবে অসম্মানজনক। যাহাদের বিচারবুদ্ধি সাম্যে স্থিত, তাহারা উভয়কেই পরিত্যাগ করিবে। মানুষ যাহাতে অপরের দ্বারা যন্ত্রবৎ চালিত না হয়, সেই চেষ্টা করিবে না কেন? এই মাত্র আমাদের চাবুক মারা হইল: যখনই কাঁদিতে আরম্ভ করিলাম, প্রকৃতি আমাদের একটি ডলার দিয়া দিল। আবার চাবুক খাইলাম,

আবার কাঁদিতে লাগিলাম—প্রকৃতি তখন আমাদিগকে একখণ্ড পিষ্টক দিল; সঙ্গে সঙ্গেই আবার আমরা হাসিতে লাগিলাম।

জ্ঞানের সাধক চান মুক্তি। তিনি দেখেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলি সব অসার, এবং সুখ-দুঃখের অন্ত নাই, জগতে কত ধনীই না নূতন নূতন সুখ লাভ করিতে চায়! সব সুখই পুরাতন হইয়া গিয়াছে; এখন তাহারা মুহূর্তের স্নায়বিক উত্তেজনার জন্য নূতন সুখ চায়। দেখিতে পাইতেছ না—প্রতিদিন তাহারা কতই হাস্যাস্পদ বস্তু আবিষ্কার করিতেছে? তারপর লক্ষ্য করিয়াছ, ইহার কিরূপ প্রতিক্রিয়া আসে? অধিকাংশ লোক মেষপালের মতো। দলের প্রথমটি নর্দমায় পড়িলে বাকী সবগুলি তাহাকে অনুসরণ করিয়া বিপন্ন হয়। ঠিক এই ভাবেই সমাজের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যাহা করে, অন্য সকলে নিজেদের কাজের পরিণাম না ভাবিয়াই তাহা করিতে থাকে। যখন কোন ব্যক্তি পার্থিব বস্তুর অসারতা উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করে, সে অনুভব করে এইভাবে তাহার পক্ষে প্রকৃতির ক্রীড়নক হওয়া অথবা প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত নয়; ইহা দাসত্ব। কোন ব্যক্তিকে কয়েকটি মধুর কথা বলিলে সে তৃপ্তির হাসি হাসিতে থাকে; কিন্তু কয়েকটি কর্কশ কথা শুনিলে সে কাঁদিতে থাকে। সে এক মুঠা অন্ন, একটু শ্বাস-প্রশ্বাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, দেশপ্রেম, দেশ, নাম ও যশের দাস। এই ভাবে সে দাসত্বের মধ্যে বাস করে এবং দাসত্ব-হেতু তাহার প্রকৃত স্বরূপ চাপা পড়িয়া যায়। তুমি যাহাকে মানুষ বলো, সে একটি ক্রীতদাস। এই সব দাসত্ব মর্মে মর্মে অনুভব করিলেই মুক্ত হইবার ইচ্ছা জাগে, মুক্তির একটি উদ্‌গ্র বাসনা আসে। একখণ্ড জ্বলন্ত কয়লা একজনের মাথায় স্থপিত হইলে ইহা দূরে ফেলিয়া দিবার জন্য সে কিরূপ চেষ্টা করে! যে-ব্যক্তি সত্য সত্যই বুঝিতে পার যে, সে প্রকৃতির ক্রীতদাস—তাহার মুক্তির সংগ্রামও এইরূপ হইবে।

আমরা এইমাত্র দেখিলাম—মুমুক্ষুত্ব অর্থাৎ মুক্তির ইচ্ছা কি। সাধনার পরবর্তী সোপানটিও খুব শক্ত। ইহা হইল—নিত্যানিত্য-বিবেক অর্থাৎ সত্য ও অসত্য, নিত্য ও অনিত্যের বিচার। কেবল ঈশ্বরই নিত্য, আর সব কিছুই অনিত্য। সব কিছুই মরে—দেবদূত, মানুষ, জীবজন্তু সব মরে, পৃথিবী সূর্য চন্দ্র তারকা সব ধ্বংস হইয়া যায়। প্রতিটি বস্তু প্রতিমুহূর্তে

পরিবর্তিত হইতেছে। অদ্যকার পর্বতগুলি অতীতে মহাসাগর ছিল; আগামী কাল তাহারা মহাসাগরে পরিণত হইবে। প্রত্যেক বস্তুই প্রবাহাকারে চলিতেছে। সমগ্র বিশ্বই পরিবর্তনের একটি পিণ্ড। কিন্তু এক অপরিণামী বস্তু আছেন, তিনিই ঈশ্বর। আমরা যতই ঈশ্বরের নিকটবর্তী হই, পরিবর্তন আমাদের তত কম হইবে, প্রকৃতি তত কম আমাদের উপর ক্রিয়া করিবে। আমরা যখন তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিব, তাঁহার সঙ্গে একত্ব অনুভব করিব, তখনই আমরা প্রকৃতিকে জয় করিব, জগৎপ্রপঞ্চের উপর প্রভুত্ব করিব; আর আমাদের উপর তাহাদের কোন প্রভাব থাকিবে না।

দেখিতে পাইতেছ, যদি সত্য সত্যই আমরা উপরি-উক্ত শমদমাদি সাধনে প্রতিষ্ঠিত হই, তাহা হইলে আমাদের অন্য কিছুর প্রয়োজনই হয় না। সমস্ত জ্ঞান আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে। আত্মার মধ্যে সমস্ত পূর্ণতা পূর্ব হইতেই রহিয়াছে; কিন্তু এই পূর্ণতা প্রকৃতি দ্বারা আবৃত। প্রকৃতি আপন এক একটি স্তরে আত্মার এই শুদ্ধ রূপকে আবৃত করিতেছে। এই অবস্থায় আমাদের কি করিতে হইবে? প্রকৃতপক্ষে আমরা মোটেই আত্মার উৎকর্ষ সাধন করি না। কোন অপূর্ণ বস্তু কি পূর্ণ বস্তুর উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে? আমরা শুধু আবরণটিকে সরাইয়া লই। তখন আত্মা নিত্য-শুদ্ধ বুদ্ধ-মুক্ত স্বরূপে প্রকাশিত হন।

এখন প্রশ্ন : এইসব সাধনের এত প্রয়োজন কি? কারণ আধ্যাত্মিকতা কর্ন বা চক্ষু বা মস্তিষ্ক দ্বারা লাভ করা যায় না। শাস্ত্রপাঠেও আধ্যাত্মিকতা লাভ করা যায় না। জগতে যত গ্রন্থ আছে, সবই আমরা পড়িয়া ফেলিতে পারি, তবু ধর্ম বা ঈশ্বর-বিষয়ে কিছুই জানিতে না পারি। সমগ্র জীবন আমরা ধর্মের কথা বলিতে পারি; তাহাতেও আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি নাও হইতে পারে। আমরা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মণীষা হইতে পারি, তথাপি একেবারেই ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিতে না পারি। পক্ষান্তরে অত্যধিক বুদ্ধি-বৃত্তির অনুশীলনের ফলে কিরূপ অধ্যাত্মবিমুখ অধার্মিক সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা কি তোমারা দেখিতে পাও না? ইহা তোমাদের পাশ্চাত্য সভ্যতার একটি দোষ যে, তোমরা কেবল বুদ্ধির উন্মেষকারী শিক্ষার পশ্চাতে ধাবিত; হৃদয়বৃত্তির দিকে তোমরা দৃষ্টি দাও না। বুদ্ধিবৃত্তি শুধু মানুষকে দশগুণ অধিক স্বার্থপর করিয়া তোলে; ইহাই তোমাদের

ধ্বংসের কারণ হইবে। হৃদয় ও মস্তিষ্কের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে হৃদয়কেই মানিবে, কেন না মস্তিষ্কের একটি মাত্র বৃত্তি—বিতর্ক; ইহার মধ্যেই মস্তিষ্ক কাজ করে, ইহার বাহিরে যাইতে পারে না। হৃদয় মানুষকে উচ্চতম স্তরে লইয়া যায়; মস্তিষ্ক কখনও সেই স্তরে পৌঁছিতে পারে না। ইহা বুদ্ধিবৃত্তিকে অতিক্রম করিয়া বোধির স্তরে উপনীত হয়। বুদ্ধি কখনও প্রেরণাবোধ সৃষ্টি করিতে পারে না। কেবল হৃদয় যখন প্রজ্ঞালোকে আলোকিত হয়, তখনই উহা প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়। হৃদয়হীন বুদ্ধিসর্বস্ব মানুষ কখনও প্রেরণা লাভ করিতে পারে না। প্রেমিক পুরুষের মধ্যেই হৃদয়ের বাণী শোনা যায়। বুদ্ধি অপেক্ষা হৃদয় উন্নত যন্ত্র আবিষ্কার করে—সেই যন্ত্র হইল অনুপ্রেরণার যন্ত্র। বুদ্ধি যেমন জ্ঞানের যন্ত্র, হৃদয় তেমনি প্রেরণার যন্ত্র। অপেক্ষাকৃত অনুন্নত স্তরে ইহা বুদ্ধি অপেক্ষা অনেকটা দুর্বল। জ্ঞানহীন ব্যক্তি কিছুই জানে না, কিন্তু তাহার প্রকৃতি কিছুটা আবেগপ্রবণ। তাহাকে একজন বিশিষ্ট অধ্যাপকের সহিত তুলনা কর—অধ্যাপকটির কি অদ্ভুত ক্ষমতা! কিন্তু তিনি তাঁহার বুদ্ধি দ্বারা সীমাবদ্ধ; এবং একই সময়ে তিনি একটি শয়তান ও প্রখরবুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন লোক হইতে পারেন, কিন্তু হৃদয়বান্ ব্যক্তি কখনও শয়তান হইতে পারে না। আবেগে পূর্ণ কোন ব্যক্তি কখনও শয়তান হয় না। ঠিক ঠিক অনুশীলন করিলে হৃদয়বৃত্তির পরিবর্তন হয় এবং ইহা বুদ্ধিবৃত্তিকে অতিক্রম করিয়া অনুপ্রেরণায় রূপান্তরিত হইবে। সর্বশেষে মানুষকে বুদ্ধিবৃত্তি অতিক্রম করিতে হইব। মানুষের জ্ঞান, যুক্তি, অনুভব, বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তির শক্তি—এ সবই জগদ্রূপ দুগ্ধমন্থনে ব্যস্ত। দীর্ঘকালব্যাপী মন্থনের পর আসে মাখন; এবং ঈশ্বরই সেই মাখন। যাঁহারা হৃদয়বান্ তাঁহারা ঐ মাখনই লাভ করেন এবং বুদ্ধিজীবীর জন্য পড়িয়া থাকে শুধু ঘোলা বা মাখন-তোলা দুধ।

এগুলিই হৃদয়ের প্রস্তুতি—সেই প্রেম, হৃদয়ের সেই গভীর সহানুভূতির প্রস্তুতি। ভগবানের নিকট পৌঁছিবার জন্য শিক্ষিত অথবা পণ্ডিত হইবার একেবারেই প্রয়োজন নাই। জনৈক মহাপুরুষ একবার আমাকে বলিয়াছিলেন, 'অপরকে বধ করিবার জন্য ঢাল-তরবারির প্রয়োজন, কিন্তু নিজেকে বধ করিবার জন্য একটি সূচই যথেষ্ট। সুতরাং অপরকে শিক্ষা দিবার জন্য প্রচুর বুদ্ধি ও জ্ঞানের যতটুকু প্রয়োজন, তোমার আত্মবিকাশের জন্য ততটা নয়।' তুমি কি পবিত্র? তুমি যদি পবিত্র হও, তাহা হইলে তুমি ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিবে।

‘যাহাদের হৃদয় পবিত্র, তাহারা ধন্য; কেন না তাহারা ঈশ্বরকে দর্শন করিবে।’ তুমি যদি পবিত্র না হও, অথচ সকল বিজ্ঞান তোমার অধিগত হয়, তাহা হইলে তাহা মোটেই তোমার সহায়ক হইবে না। যে-সকল গ্রন্থ তুমি পড়, তাহাতে ডুবিয়া থাকিতে পারো; কিন্তু তাহা তোমার বিশেষ কাজে লাগিবে না। হৃদয়ই লক্ষে পৌঁছিতে পারে। হৃদয়ের পথ অনুসরণ কর। পবিত্র হৃদয়ের দৃষ্টি বুদ্ধির বাহিরে প্রসারিত। ইহা একটি বিশেষ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়; যে-সকল বিষয় কখনও বুদ্ধিবৃত্তির গম্য নয়, তাহা এই হৃদয় উপলব্ধি করে। যখনই নির্মল হৃদয় ও বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন সর্বাবস্থাতেই নির্মল হৃদয়ের পক্ষ অবলম্বন করিবে, যদিও তুমি মনে কর, হৃদয় যাহা করিতেছে তাহা অযৌক্তিক। যখন তোমার হৃদয় অপরের উপকার করিতে ইচ্ছুক, তখন তোমার বুদ্ধিবৃত্তি হয়তো তোমাকে বলিবে, এইরূপ করা সুবিবেচনার পরিচায়ক নয়; এই অবস্থায় কিন্তু হৃদয়কেই মানিয়া চলিবে। তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, বুদ্ধিকে অনুসরণ করিয়া তোমার যতটুকু ভ্রান্তি হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা ভ্রান্তির পরিমাণ তোমার অল্পই হইতেছে। শ্রেষ্ঠ দর্পণরূপ পবিত্র হৃদয়ে সত্য প্রতিফলিত হয়, সুতরাং এই-সকল যমনিয়মাদির অভ্যাস হৃদয়ের পবিত্রতা সম্পাদনের জন্যই। যখনই চিত্ত শুদ্ধ হয়, মুহূর্তের মধ্যেই সকল তত্ত্ব, সকল সত্য আপন ভাস্বর মহিমায় প্রকাশিত হয়। তুমি যদি যথেষ্ট পরিমাণে পবিত্রহৃদয় হও, তাহা হইলে বিশ্বের সর্ববিধ সত্য তোমার অন্তরে প্রকাশিত হইবে। যাঁহারা কখনও দূরবীক্ষণযন্ত্র, অণুবীক্ষণযন্ত্র অথবা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার দেখেন নাই, তাঁহারাই যুগ-যুগান্ত পূর্বে পরমাণু সম্বন্ধে, অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব সম্বন্ধে এবং মানুষের অতি সূক্ষ্ম অনুভূতি সম্বন্ধে মহাসত্যসমূহ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই-সকল বিষয় কিরূপে জানিয়াছিলেন? হৃদয়বৃত্তির সাহায্যেই জানিয়াছিলেন। তাঁহারা হৃদয়কে নির্মল করিয়াছিলেন। বর্তমানেও আমরা ইহা করিতে পারি—পথ আমাদের জন্য প্রশস্তই রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন নয়, হৃদয়বৃত্তির অনুশীলনই বিশ্বের দুঃখ-দৈন্য হ্রাস করিতে পারে।

———

১ Sermon on the Mount, St. Matt. V. S.

বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনের দ্বারা শত শত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে; ফল দাঁড়াইয়াছে যে, মুষ্টিমেয় লোক বহু লোককে ক্রীতদাসে পরিণত করিয়াছে। এই টুকুই উপকার হইয়াছে! অগণিত কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি হইয়াছে; আর অর্থ থাকুক বা না থাকুক, প্রত্যেক দরিদ্র ব্যক্তি সেই-সকল অভাব পরিতৃপ্ত করিতে চায়। না পারিলেও সে সংগ্রাম করিতে থাকে; পরিশেষে সংগ্রামের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হয়। এই তো পরিণতি! সুতরাং জীবনের দুঃখদৈন্যের সমস্যা-সমাধান বুদ্ধির পথে সম্ভব নয়; হৃদয়ের মধ্য দিয়াই তাহা সম্ভব যদি এই-সব প্রভূত চেষ্টা মানুষকে আরও পবিত্র শান্ত সহনশীল করিতে প্রযুক্ত হইত, তাহা হইলে এই বিশ্বের সুখ বর্তমানের সুখ অপেক্ষা সহস্রগুন বেশী হইত। তাই বলি, সর্বদা হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন কর। হৃদয়ের মধ্য দিয়াই ঈশ্বর কথা বলেন; বুদ্ধিবৃত্তির মধ্য দিয়া তুমি কথা বলিয়া থাকো।

তোমাদের মনে আছে, ওল্ড টেষ্টামেন্টে (Old Testament) মুশাকে বলা হইয়াছিল, 'তোমার পা হইতে জুতা খুলিয়া ফেলো, কারণ যেখানে তুমি দাঁড়াইয়া আছ, তাহা পবিত্র ভূমি।' ঐরূপ সশ্রদ্ধ মনোভাব লইয়া আমাদিগকে সর্বদা ধর্মানুশীলনে অগ্রসর হইতে হইবে। যে-ব্যক্তি পবিত্র হৃদয় ও শ্রদ্ধালু মনোভাব লইযা আসেন, তাঁহার হৃদয় খুলিয়া যাইবে; অনুভূতির দ্বার তাঁহার জন্য উদ্‌ঘাটিত হইবে এবং তিনি সত্যদর্শন করিবেন।

যদি শুধু বুদ্ধিবৃত্তি লইয়া উপস্থিত হও, তোমার কিছুটা বুদ্ধিবৃত্তিরই অনুশীলন হইবে, কিছুটা তাত্ত্বিক বিচার হইবে, কিন্তু সত্যে উপনীত হইবে না। সত্যের এমন একটি রূপ আছে যে, যে তাহা দেখিতে পায়, সে দৃঢ়প্রত্যয় হইয়া যায়। সূর্যকে দেখাইবার জন্য কোন আলোক-বর্তিকার প্রয়োজন হয় না; সূর্য স্বয়ম্প্রকাশ। সত্যের যদি প্রমাণের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সেই প্রমাণকে কে প্রমাণিত করিবে? সত্যের সাক্ষিরূপে যদি কোন কিছুর প্রয়োজন হয়, তবে সেই সাক্ষীর আবার সাক্ষী কোথায়? আমাদিগকে শ্রদ্ধা ও প্রেমের সহিত ধর্মের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে; তাহা হইলেই আমাদের হৃদয় জগরিত হইয়া বলিবে, 'ইহা সত্য, এবং ইহা অসত্য।'

ধর্মের ক্ষেত্র আমাদের ইন্দ্রিযের অতীত, এমন কি আমাদর চেতনারও ঊর্ধ্বে। আমরা ঈশ্বরকে ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিতে পারি না। কেহই চক্ষুর দ্বারা ঈশ্বর দর্শন করেন নাই, কখনও দর্শন করিবেন না। কাহারও চেতনার মধ্যে ঈশ্বর নাই। আমি ঈশ্বর-সচেতন নই, তুমিও নও, কেহই নয়। ঈশ্বর কোথায়? ধর্মের ক্ষেত্র কোথায়? ইহা ইন্দ্রিয়ের অতীত, ইহা চেতনার উর্ধ্বে। আমরা যে-সকল অগণিত স্তরে কাজ করিয়া থাকি, চেতনা শুধু তাহাদের অন্যতম। তোমাকে চেতনার ক্ষেত্র অতিক্রম করিতে হইবে, ইন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্বে যাইতে হইবে; তোমাকে নিজ কেন্দ্রের—স্বরূপের নিকট হইতে নিকটতর ভূমিতে উপনীত হইতে হইবে। আর যতই তুমি এইরূপ করিতে থাকিবে, ততই ঈশ্বরের নিকটবর্তী হইবে। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ কি?—প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার। এই প্রাচীরের অস্তিত্ব-বিষয়ে প্রমাণ—ইহা আমি প্রত্যক্ষ করি। সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই ভাবে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন এবং যাঁহারাই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদেরই নিকট তিনি প্রত্যক্ষ হইবে। কিন্তু এই অনুভূতি মোটেই ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি নয়। ইহা অতীন্দ্রিয়—অতিচেতন। সুতরাং নিজেদের অতীন্দ্রিয়-লোকে উন্নীত করিবার জন্য এইসব যমনিয়মাদির অনুশীলন অত্যাবশ্যক। সর্বপ্রকার অতীত কর্ম এবং বন্ধন আমাদিগকে নিম্নে টানিয়া লইতেছে। এই-সকল প্রস্তুতি আমাদিগকে পবিত্র ও বন্ধনমুক্ত করিবে। বন্ধনগুলি আপনা হইতেই ছিন্ন হইয়া যাইবে এবং যে ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষের স্তরে আমরা বদ্ধ হইয়া আছি, তাহার ঊর্ধ্বে উন্নীত হইব। তখনই আমরা এমন সব বস্তু দেখিব শুনিব এবং অনুভব করিব, যাহা মানুষ জগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ তিনটি সাধারণ স্তরে দেখে না, শোনে না বা অনুভব করে না। তখন আমরা যেন একটা অদ্ভুত ভাষায় কথা বলিব। লোকে আমাদের ভাষা বুঝিতে পারিবে না; কারণ তাহারা তো ইন্দ্রিয়ের বিষয় ছাড়া অন্য কিছু জানে না। যথার্থ ধর্ম সম্পূর্ণভাবে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের। জগতের প্রত্যেক প্রাণীর ইন্দ্রিয়গুলিকে অতিক্রম করিবার সহজাত শক্তি রহিয়াছে। ক্ষুদ্র কীট পর্যন্ত একদিন ইন্দ্রিয়গুলি অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের নিকট উপনীত হইবে। কোন জীবনই ব্যর্থ হইবে না; জগতে ব্যর্থতা বলিয়া কিছু নাই। শতবার মানুষ নিজেকে আঘাত করিবে; সহস্রবার হোঁচট খাইবে, কিন্তু পরিণামে নিজে অনুভব করিবে, সে ঈশ্বর। আমরা জানি, সোজাসুজি কোন অগ্রগতি হয় না। প্রত্যেক

জীবাত্মা যেন বৃত্তাকারে চলিতেছে; তাহাকে এই বৃত্ত পূর্ণ করিতে হইবে। কোন জীবাত্মাই চিরতরে নিম্নগামী হইতে পারে না।

এমন এক সময় আসিবে, যখন তাহাকে ঊর্ধ্বগামী হইতেই হইবে। কাহারও বিনাশ নাই। আমরা সকলেই একটি সাধারণ কেন্দ্র হইতে অভিক্ষিপ্ত; এই কেন্দ্রই ঈশ্বর। ঈশ্বর যে-সকল জীব সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহারা উচ্চতমই হউক বা নীচতমই হউক—সকলেই সর্ব জীবনের জনক ঈশ্বরের নিকট ফিরিয়া আসিবে। 'যাঁহা হইতে সকল প্রাণী জাত, যাঁহাতে সকলে অবস্থিত এবং যাঁহার নিকট সকলেই প্রত্যাবৃত্ত হয়, তিনিই ঈশ্বর।

১১. জ্ঞানযোগ-প্রবেশিকা

জ্ঞানযোগ-প্রবেশিকা

ইহাই (জ্ঞানযোগই) যোগশাস্ত্রের দার্শনিক ও যুক্তিসম্মত দিক। যোগ-শাস্ত্রের এই অংশটি খুবই কঠিন; আমি ধীরে ধীরে তোমাদিগকে ইহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিব।

যোগের অর্থ মানুষ ও ঈশ্বরকে যুক্ত করা পদ্ধতি। এই বিষয়টি বুঝিলে মানুষ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমরা তোমাদের নিজ নিজ সংজ্ঞা অনুযায়ী চিন্তা করিত পারিবে এবং তোমরা দেখিতে পাইবে যে, তোমাদের প্রতিটি সংজ্ঞার সঙ্গে যোগ কথাটি খাপ খায়। সর্বদা মনে রাখিও বিভিন্ন প্ মানসিক গঠন অনুযায়ী যোগও বিভিন্ন প্রকারের, ইহাদের একটি না হইলে অন্যটি হয়তো তোমার উপযোগী হইতে পারে। সব ধর্মের দুইট ভাগ—তত্ত্ব ও সাধন। পাশ্চাত্যেরা তত্ত্বের দিকটিই অনুসরণ করে, এবং সাধন অর্থে শুধু সৎ কার্য করাই বুঝিয়া থাকে। ধর্মের ব্যাবহারিক দিক বা সাধন-অঙ্গই যোগ। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, কেবল সৎকাজ করা বাদ দিলেও ধর্ম একটি কার্যকরী শক্তি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মানুষ যুক্তির মধ্য দিয়া ঈশ্বর লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার ফলে 'ঈশ্বরবাদ' (Deism)-এর উৎপত্তি। এই মতবাদ অনুসার ঈশ্বর যুক্তিসিদ্ধ, কিন্তু অনুভবসিদ্ধ নয় বলিয়া মনে করা হয়। এই মতবাদ প্রবর্তনের ফলে ধর্মের যে-টুকু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও ডারুইন ও মিলের মতবাদ দ্বারা ধ্বংস হইল। ঐতিহাসিক এবং তুলনামূলক ধর্ম তখন মানুষের প্রধান উপজীব্য হইয়া উঠিল। তাহার মনে করিল, প্রাকৃতিক শক্তির পূজা হইতেই ধর্মের উদ্ভব। সূর্য-উপাখ্যান প্রভৃতি সম্পর্কে ম্যাক্সমূলারের মন্তব্য দ্রষ্টব্য। অন্যদলের সিদ্ধান্ত হইল, পিতৃপুরুষের পূজা হইতেই ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে; এ বিষয়ে হার্বার্ট স্পেন্সার দ্রষ্টব্য। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে এই-সকল মতবাদ ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, কোন বহিরঙ্গ পন্থা অবলম্বন করিয়া মানুষ সত্য লাভ করিতে পারে না।

‘একটুকরা মাটি সম্বন্ধে জ্ঞান হইলে সমস্ত মাটি সম্বন্ধেই জ্ঞান হয়।’ সমগ্র বিশ্ব-জগৎও ঠিক একই পরিকল্পনা অনুসারে রচিত। মানুষ মৃত্তিকা-খণ্ডের মতো। আমরা যদি অণুস্বরূপ একটি মানবাত্মাকে জানিতে পারি, যদি তাহার সূচনা ও সাধারণ ইতিহাস জানিতে পারি, তাহা হইলে সমগ্র প্রকৃতিকেই জানা হইল। জন্ম, বৃদ্ধি, বিকাশ, ক্ষয় ও মৃত্যু—সমগ্র প্রকৃতিতে এই একই অনুক্রম; উদ্ভিদ্-জগৎ এবং মানুষের বেলায়ও সেই একই কথা। প্রভেদ শুধু কালে। একটি ক্ষেত্রে সমস্ত কল্পটি একদিনে সম্পূর্ণ হইতে পারি , আবার অন্য ক্ষেত্রে সত্তর বৎসর লাগিতে পারে; পদ্ধতিগুলি এক। বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে একটি সঠিক বিশ্লেষণে উপনীত হইবার একমাত্র উপায়—আমাদের নিজ মনের বিশ্লেষণ। ধর্ম বুঝিবার জন্য মানব-মনের যথার্থ বিশ্লেষণ প্রয়োজন, শুধু যুক্তির সাহায্যে সত্যে উপনীত হওয়া অসম্ভব, কারন অসম্পূর্ণ যুক্তি নিজস্ব মূল ভিত্তিই অনুধাবন করিতে পারে না। অতএব মনকে জানিবার একমাত্র উপায় হইল প্রকৃত তথ্যে পৌঁছানো, তবেই বুদ্ধি সেগুলিকে সুসংবদ্ধ করিয়া মূলনীতিসমূহের সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিবে। বুদ্ধির কাজ নির্মাণ করা, কিন্তু ইট ছাড়া তো গৃহনির্মান সম্ভব নয়, আর বুদ্ধি নিজে ‘ইট’ তৈরী করিতে পারে না। প্রকৃত সত্যে উপনীত হইবার নিশ্চিত উপায় জ্ঞানযোগ।

প্রথমতঃ আমাদের মনের একটি গঠন-বিজ্ঞান আছে। আমাদের ইন্দ্রিয়-সমূহ আছে; ইহারা কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়—এই দুই ভাগে বিভক্ত; ইন্দ্রিয় অর্থে বাহ্য ইন্দ্রিয়-যন্ত্রকে বুঝাইতেছি না। মস্তিষ্কের দৃষ্টিশক্তির কেন্দ্রটিই দর্শনেন্দ্রিয়, চক্ষুটি নয়। এইরূপ প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের কাজ আভ্যন্তরীণ।

একমাত্র মনের প্রতিক্রিয়া ঘটিলেই বস্তু-সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জন্য সংঙ্গাবহ এবং ক্রিয়াবাহী উভয়প্রকার স্নায়ুই প্রয়োজন।

তারপর আছে মন স্বয়ং। ইহা একটি নিস্তরঙ্গ হ্রদের মতো; কোন কিছু, যেমন একটি প্রস্তরখণ্ডে পড়িলেই উহাতে কম্পন শুরু হয়। সেই কম্পনগুলি একত্র হইয়া ঐ প্রস্রখণ্ড প্রতিহত হয় এবং সমস্ত হ্রদব্যাপী বিস্তৃত হইয়া অনুভূত হইতে থাকে। মন এই হ্রদের মতো ইহাতে সর্বক্ষণ কম্পন চলিতে থাকে, এবং সেই কম্পন মনের উপর নানা রেখাপাত

করে। আমাদের অহং-বোধ বা ব্যক্তিসত্তা বা আমি এইসব রেখাপাতেরই ফল। অতএব এই 'আমি' শক্তির একটি দ্রুত সঞ্চারণ মাত্র, ইহার নিজস্ব কোন বাস্তব সত্তা নাই।

মনের মূল উপাদান অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটি জড়যন্ত্র মাত্র, প্রাণকে ধারণ করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তখন তাহার দেহেরই মৃত্যু ঘটে, কিন্তু সব কিছুই যখন চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়, তখন মনের একটি ক্ষুদ্র অংশ বীজাকারে অবশিষ্ট থাকে। ইহাই নূতন দেহের বীজ-স্বরূপ, সেন্ট পল ইহাকেই 'আত্মিক শরীর' (spiritual body) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মনের জড়ত্ব-সংক্রান্ত মতবাদটি আধুনিক সর্বপ্রকার মতবাদের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। নির্বোধের কোন বুদ্ধি নাই , কারণ তাহার মানস উপাদান নষ্ঠ হইয়া গিয়াছে। জড় বস্তুর মধ্যে বুদ্ধি থাকিতে পারে না অথবা জড়বস্তুর কোন সমবায়ের দ্বারা বুদ্ধি সৃষ্টি করা যাইতে পারে না। তাহা হইলে বুদ্ধি থাকে কোথায়? ইহা থাকে জড়ের অন্তরালে—ইহাই তো জীব, প্রকৃত সত্তা; জড়ের মাধ্যমে সেই তো কাজ করে। জড় ব্যতিরেকে শক্তির সঞ্চরণ সম্ভব নয়, যখন মৃত্যুর পর সমগ্র মনের কিয়দংশ ছাড়া সব কিছুই ধ্বংস হইয়া যায়, জীব একাকী ভ্রমন করিতে পারে না বলিয়া মনের ঐ কিয়দংশ তাহার সচ্চঞ্চরণের মাধ্যমরূপে অবশিষ্ট থাকে।

প্রত্যক্ষ্য জ্ঞান কিরূপে সম্ভব হয়? আমার বিপরীত দিকের দেওয়ালটি আমার উপর একটি ছাপ ফেলিতেছে, কিন্তু আমার মন সাড়া না দেওয়া পর্যন্ত আমি ঐ দেওয়ালটি দেখিতে পাইতেছি না। অর্থাৎ শুধু দৃষ্টিশক্তি দ্বারাই মন দেওয়ালটিকে দেখিতে পাইতেছি না। অর্থাৎ শুধু দৃষ্টিশক্তি দ্বারাই মন দেওয়ালটিকে জানিতে পারে না। যে প্রক্রিয়ার ফলে মন ঐ দেওয়ালের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করে, তাহা একটি বুদ্ধিগত প্রক্রিয়া এই ভাবে সমগ্র বিশ্বজগৎকেই এবং আমাদের মনকেও আমরা আমাদের চক্ষু ও মন (বা মনন-শক্তি) দ্বারা দেখি, অবশ্য ইহাতে আমাদের নিজ নিজ প্রবণতার রঙ নিশ্চয় লাগে। প্রকৃত দেওয়ালটি অথবা প্রকৃত বিশ্ব মনের বাহিরেই অবস্থিত, ইহা অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়। আমরা যদি বিশ্বজগৎকে 'ক' বলি, তবে আমাদের বক্তব্যটি দাঁড়াইবে এইরূপ : দৃশ্যমান জগৎ=ক+মন।

বহির্জগৎ সম্বন্ধে যাহা সত্য, অন্তর্জগৎ সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য। মনও নিজেকে জানিতে চায়, কিন্তু এই সত্তাকে জানিতে হইলে মনের মাধ্যমে জানিতে হইবে এবং ইহাও সেই দেওয়ালের মতো অজ্ঞাত। এই সত্তাকে যদি আমরা 'খ' বলিয়া ধরি, তবে আমাদের বক্তব্যটি দাঁড়াইবে : খ+মন=অন্তর্জগৎ। ক্যান্টই প্রথম মনের এই প্রকার বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বেদে বহু পূর্বে ইহা বলা হইয়াছে। অতএব এখন এই দাঁড়াইয়াছে যে, মন 'ক' এবং 'খ'-এর অন্তর্বর্তী হইয়া উভয়ের উপর প্রতিক্রিয়া করিতেছে।

' ক' যদি অজ্ঞাত হয়, তবে আমরা ইহার প্রতি যে-কোন গুণই আরোপ করি না কেন, সেগুলির সবই আমাদের মন হইতে উদ্ভূত। দেশ, কাল এবং কার্য-কারণ-শৃঙ্খলার মাধ্যমে মনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইয়া থাকে। কাল ব্যতীত চিন্তার সঞ্চরন এবং স্থান ব্যতীত স্থূলতর বিষয়ের কম্পন সম্ভব নয়। কার্য-কারণ-শৃঙ্খলা হইতেছে একটি ক্রম, যাহার মধ্যে কম্পনগুলি আসিয়া একত্র হয়। এইগুলির মাধ্যমেই মন বিষয়ানুভূতি লাভ করে। অতএব যাহা কিছুই মনের অতীত, তাহাই দেশকাল ও কার্য-কারণ-শৃঙ্খলার অতীত।

অন্ধ ব্যক্তি স্পর্শ এবং শব্দের দ্বারা এই জগৎ অনুভব করিয়া থাকে। পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের অধিকারী আমাদের কাছে এই জগৎ অন্ধের জগৎ হইতে ভিন্ন। আমাদের মধ্যে যদি কেহ বৈদ্যুতিক তরঙ্গ লক্ষ্য করিবার মতো শক্তি অর্জন করে, তড়িৎ-ইন্দ্রিয়ের অধিকারী হয়, তবে তাহার নিকট জগৎ ভিন্ন রূপে প্রতীত হইবে। তথাপি এই পৃথিবী, যাহাকে 'ক' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, উহা ইহাদের সকলের নিকটেই সমভাবে প্রতিভাত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রত্যেকেই নিজ নিজ মন লইয়া জগৎকে দেখিতেছে, জগৎ ও প্রত্যকের নিকট ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হইতেছে। মনুষ্য-জগতে দেখা যায়, কোথাও বা ক+১টি ইন্দ্রিয় , কোথাও ক+২টি ইন্দ্রিয় এবং এইভাবে ক + ৫টি ইন্দ্রিয় পর্যন্ত রহিয়াছে। ইন্দ্রিয়ের সংখ্যার তারতম্যের জন্য অনুভূতিও সর্বক্ষণই ভিন্ন হইতেছি, কিন্তু 'ক' সব সময়েই অপরিবর্তিত। 'খ' ও আমাদের মন এবং দেশ, কাল ও কার্যকারণ-শৃঙ্খলার বাহিরে অবস্থিত।

কিন্তু তোমরা প্রশ্ন করিতে পারো : কিরূপে আমরা বুঝিব যে 'ক' ও 'খ'—এই দুইটি দেশ, কাল ও কার্য-কারণ-শৃঙ্খলার বাহিরে বর্তমান? সত্য কথা, কালই প্রভেদ সৃষ্টি করিয়া থাকে, কালের অতীত হইলে কোন প্রভেদ থাকে না—উভয়েই কালাতীত বলিয়া উহারা প্রকৃতই এক। মন যখন এই এককে বহির্জগৎরূপে প্রত্যক্ষ্য করে, তখন মন ইহাকে নানা ভাবে বলে 'ক', এবং অন্তর্জগৎরূপে যখন দেখে, তখন বলে 'খ'। এই একত্ব বর্তমান রহিয়াছে এবং মনরূপ কাঁচের মাধ্যমেই ইহা বিভিন্ন রূপে প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে।

পূর্ণ প্রকৃতির যে-রূপ আমাদের নিকট সর্বদা প্রতিভাত হইতেছে, তাহাই ঈশ্বর এবং তাহাই চরম সত্য।

ভেদ-রহিত সত্তাই যথার্থ পূর্ণ সত্তা—অন্য সবকিছুই নিম্নতর পর্যায়ের এবং অনিত্য।

যাহা ভেদ-রহিত, তাহা ভেদযুক্ত হইয়া কেমন করিয়া মনের গোচরীভূত হয়? ইহা এমন একটি প্রশ্ন, যাহা 'পাপ এবং স্বাধীন ইচ্ছার আরম্ভ কোথায়?'—এই প্রশ্নেরই অনুরূপ। প্রশ্নটি স্ববিরোধী এবং অসম্ভব, কারণ ইহাতে কার্য-কারণ-সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। ভেদ-রহিত অবস্থায় কোন কার্য-কারণ-সম্বন্ধ নাই। এই প্রশ্নটিতে কল্পনা করা হইয়াছে যে, ভেদ-রহিত ও ভেদযুক্ত সত্তা একই প্রকার অবস্থার অধীন। 'কেন' এবং 'কি হেতু'—এই-সকল প্রশ্ন শুধু মনে বর্তমান। সেই আত্মা সমস্ত কার্যকারণের ঊর্ধ্বে এবং তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—স্বাধীন। আত্মা। আত্মারই আলোক, প্রত্যেক প্রকার মনের মধ্য দিয়াই এই আলোক বিচ্ছুরিত হইতেছে, প্রতিটি কার্যে ঘোষণা করিতেছে আমি মুক্ত, তথাপি প্রতি কার্যেই প্রমাণিত হইতেছে, আমি বদ্ধ। আত্মার যথার্থ স্বরূপ স্বাধীন, কিন্তু দেহ-মনের সংস্পর্শে অসিয়া তিনি বদ্ধ হইয়া পড়েন। ইচ্ছাশক্তিতেই যথার্থ স্বরূপের প্রথম প্রকাশ, সুতরাং এই যথার্থ স্বরূপের প্রথম বন্ধনই হইল ইচ্ছাশক্তি। যথার্থ স্বরূপ ও মনের যৌগিক সমবায়ই ইচ্ছাশক্তি—কোন যৌগিক সমবায়ই স্থায়ী হইতে পারে না। সুতরাং বাঁচিবার ইচ্ছা করিলেও আমাদের মরিতে হইবে। অমর জীবন একটি স্ববিরোধী উক্তি, কেন না জীবন, যাহা একটি যৌগিক সমবায়ের ফলে উদ্ভূত, তাহা কখনই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। সেই সত্যস্বরূপ ভেদবিরহিত এবং চিরন্তন—সর্বদা বর্তমান। এই পূর্ণস্বরূপ—

মন, চিন্তা, ইচ্ছা প্রভৃতি ত্রুটিপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে কেমন করিয়া মিশ্রিত হইল? ইহা কখনই মিশ্রিত হয় নাই। তুমিই তোমার প্রকৃত সত্তা—আমাদের পূর্ববর্তী বক্তব্যের 'খ'। তোমার কখনও ইচ্ছাশক্তি ছিল না, কখনও তোমার মধ্যে পরিবর্তন হয় নাই, জীব হিসাবে তোমার কখনও অস্তিত্ব ছিল না—এইগুলি ভ্রম মাত্র। তবে তোমরা বলিবে এই ভ্রমাত্মক জগৎ কাহার উপর প্রতিষ্ঠিত? ইহাও একটি ভ্রমাত্মক প্রশ্ন। ভ্রম শুধু ভ্রমের উপর ছাড়া সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এই-সকল ভ্রমের পারে ফিরিয়া যাইবার জন্য, প্রকৃতপক্ষে মুক্ত হইবার জন্য সকলেই সংগ্রাম করিতেছে। তাহা হইলে জীবনের মূল্য কি?—অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়। এই মতবাদ কি বিবর্তনবাদের বিরোধী? না—বরং বিবর্তনবাদকে ইহা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করিতেছে। জড়ের সংস্কার সাধনের জন্য ইহা একটি প্রক্রিয়া। ইহা যথার্থ স্বরূপের বিকাশে নিজেরই সাহায্য করিতেছে। ইহা আমাদের ও অন্য একটি বস্তুর মধ্যে পর্দা বা আবরণের মতো। পর্দাটি যেমন ধীরে ধীরে অপসারিত হইতেছে, বস্তুটিও তেমনি ধীরে ধীরে দৃষ্টিপথে আসিতেছে। এই প্রশ্নটি পরমাত্মার বিকাশের প্রশ্ন মাত্র।

১২. জ্ঞানযোগ-কথা(১-৯)

জ্ঞানযোগ–কথা

স্বামীজীর এই আলোচনাগুলি আমেরিকার মিস এস.ই.ওয়াল্ডো নাম্নী
তাঁহার শিষ্যা কর্তৃকলিপিবদ্ধ হয়। স্বামী সারদানন্দ যখন আমেরিকায় ছিলেন (১৮৯৮) ,
তখন উক্ত শিষ্যার নোটবুক হইতে তিনি এগুলি সংগ্রহ করেন।
তাঁহার কাগজপত্রের মধ্যেই এগুলি পাওয়া গিয়াছে।

১

ওঁ তৎ সৎ। ওঁকার তত্ত্ব জানাই জগৎ-রহস্য জানা। ভক্তিযোগ ও রাজ-যোগের মতো জ্ঞানযোগের লক্ষ্য একই, তবে সাধনপ্রণালী ভিন্ন। এই যোগ শক্তিমান্ সাধকদের জন্য, অষ্টাঙ্গিক যোগী বা ভক্তের জন্য নয়, যুক্তিনিষ্ঠের জন্য। শুদ্ধ প্রেম ও পরাভক্তি আশ্রয় করিয়া ভক্তিযোগী যেরূপ ভগবানের সহিত একত্ব লাভের পথে অগ্রসর হন , জ্ঞানযোগীও সেইরূপ শুদ্ধ বিচার সহায়ে পরমাত্মা লাভের পথ করিয়া লন। প্রাচীন যুগের যাবতীয় মূর্তির কল্পনা, সব পুরাতন ধর্মবিশ্বাস এবং কুসংস্কার মন হইতে দূর করিবা জন্য তাঁহাকে দৃঢ়চিত্ত হইতে হইবে। ইহামুত্রফলভোগ-কামনা ত্যাগ করিয়া মুক্তির জন্য দৃঢ়সংকল্প হইতে হইবে। জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি আমাদের করতলগত হইবে না। স্বরূপ-উপলব্ধিই, আমরা যে জন্ম মৃত্যু ও ভীতির অতীত–এই উপলব্ধিই জ্ঞান। আত্মানুভূতিই পরম কল্যাণ–ইহা ইন্দ্রিয় ও চিন্তার অতীত অবস্থা। প্রকৃত ‘আমি’ ধারণাতীত। ইনি নিত্য জ্ঞাতা (eternal subject), কখনও জ্ঞানের বিষয় (object) হইতে পারেন না, কারণ জ্ঞান আপেক্ষিক বিষয় সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, নিরপেক্ষ পুরুষ সম্বন্ধে নয়। সমুদয় ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান সীমাবদ্ধ, সীমাহীন কার্যকারণ-শৃঙ্খলার পরম্পরা মাত্র। আমাদের এই জগৎ ব্যাবহারিক সত্তা–বাস্তবের ছায়া; তবুও সুখ দুঃখ এই স্তরে প্রায় ভারসাম্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে বলিয়া এই পৃথিবীই একমাত্র স্থান, যেখানে মানব আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

এই জগৎ প্রকৃতির বিবর্তন, ঈশ্বরের ব্যক্ত অবস্থা, মায়া বা আপাত-প্রতীয়মান জগৎপ্রপঞ্চের আবরণে দৃষ্ট ব্রহ্ম বা নিরুপাধিক পুরুষের মানবীয় জ্ঞানগম্য ব্যাখ্যা মাত্র। এ জগৎ শূন্য নয়, ইহার কিছুটা সত্তা আছে; ব্রহ্ম আছেন বলিয়াই জগৎ প্রতীয়মান হয়।

জ্ঞাতার জ্ঞান কি প্রকারে হইবে? বেদান্ত বলেন—আমরাই সেই জ্ঞাতা; ইনি জ্ঞানের বিষয়ভূত নন, তাই আমরা কখনও ইঁহাকে জানিতে পারি না। আধুনিক বিজ্ঞানও এই কথা বলিতেছে। ইঁহাকে জানা যায় না। তবুও কখন কখন আমরা ইঁহার অস্তিত্বের আভাস পাইয়া থাকি। যখনই একবার এই জগৎস্বপ্ন ভাঙিয়া যায়, তখনই সেই অনুভূতি আমরা ফিরিয়া পাই। তখন আর জগৎ আমাদের চোখে সত্য নয়, আমরা জানিতে পারিব—ইহা মরীচিকা মাত্র। এই মায়া- মরীচিকার ওপারে যাওয়াই সকল ধর্মের লক্ষ্য। এই জীব ও ব্রহ্ম যে এক, সকল বেদ অহরহ এই কথা ঘোষণা করিতেছেন; কিন্তু অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই মায়ার আবরণ ভেদ করিয়া এই চরম সত্য উপলব্ধি করিবার অবস্থায় উপনীত হইতেছেন।

জ্ঞানলাভেচ্ছু ব্যক্তিকে সর্বপ্রথমে ভয় হইতে মুক্ত হইতে হইবে। ভয়ই আমাদের অন্যতম প্রবল শত্রু। তারপর কোন বিষয় সম্যক্ অবগত না হইয়া বিশ্বাস করিও না। সর্বদা বলো—'আমি শরীর নই, মন নই, চিন্তা নই, চেতনাও নই; আমি আত্মা।' সব কিছু ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলে শেষে শুধু আত্মাই অবশিষ্ট থাকিবেন। জ্ঞানীর ধ্যান দুই প্রকার : (১) আমরা যাহা নই, সেই ভাব অস্বীকার করা, সেই ভাব মন হইতে দূর করিয়া দেওয়া। (২) আমাদের প্রকৃত স্বরূপ 'আত্মা এক পরমাত্মা, সচ্চিদানন্দ—দৃঢ়তাসহ এই কথা বলা। যথার্থ বিচরমার্গী নির্ভয়ে অগ্রসর হইয়া বিচারের চরম সীমায় উপনীত হইবেন। পথে কোথাও থামিলে চলিবে না, 'নেতি'-বিচারপ্রণালী অবলম্বন করিলে সব কিছুই দূর হইবে; অবশেষে যাহা অপরিহার্য, যাহা আর অস্বীকার করা যায় না, সেই প্রকৃত 'আমি' বা আত্মায় আমরা উপনীত হইব। এই 'আমি' জগতের সাক্ষী—অব্যয়, সনাতন, অসীম। অজ্ঞানের মেঘাবরণ স্তরে স্তরে এই আত্মাকে ঢাকিয়া রাখে, আমরা দেখিতে পাই না, আত্মা কিন্তু সর্বদা সমভাবে বিরাজমান।

দুইটি পাখি একই গাছের বিভিন্ন শাখায় উপবিষ্ট। উপরের শাখার পাখিটি ধীর স্থির মহিমময় সুশোভন ও পূর্ণস্বভাব। নিচের শাখার পাখিটি মিষ্টফল খাইয়া কখন হৃষ্ট, আবার তিক্তফল আস্বাদন করিয়া কখন বা বিষন্ন; এইরূপে সে শাখা হইতে শাখান্তরে বিচরণ করিতেছে। একদিন নিয়মিত আস্বদিত ফল অপেক্ষা অতি তিক্ত একটি ফল ভক্ষণ করিয়া সে উপরের শান্ত শোভাময় পাখিটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চিন্তা করিল, 'হায়! আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ঐ পাখির মতো হই।' তারপর কয়েক ধাপ উপরে তাহার দিকে অগ্রসর হইল। শীঘ্রই আবার ঐ পাখিটির মতো হইবার বাসনা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া পুনরায় মিষ্ট ও তিক্ত ফলের আস্বাদনে তুষ্ট ও রুষ্ট মনোভাব লইয়া পূর্বের মতো বিচরণ করিতে লাগিল। আবার ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করিল, আবার শান্ত স্নিগ্ধ মহিমামণ্ডিত উপরের পাখিটির দিকে কয়েকধাপ অগ্রসর হইল। এইরূপ ব্যাপার বহুবার সংঘটিত হইলে অবশেষে উপরের পাখিটির সান্নিধ্য লাভ করিয়া সে দেখিল, উহার পক্ষজ্যোতি তাহার চোখ ধাঁধাইয়া তাহাকে আত্মভূত করিয়া ফেলিয়াছে। পরিশেষে দেখিতে পাইল, কি আশ্চর্য! কেবল একটি পাখিই সেখানে রহিয়াছে– সে নিজেও তো চিরকালই ঐ উপরের পাখি; তবে এই মাত্র এ সত্য সে বুঝিতে পারিল।

মানুষও ঐ নিম্নশাখাবিহারী পক্ষিতুল্য, কিন্তু সর্বোচ্চ আদর্শে উপনীত হইবার জন্য সচেষ্ট হইলে সেও বুঝিতে পারিবে, সেও সর্বদাই সেই আত্মা-রূপেই ছিল, আত্মা ছাড়া যাহা কিছু, সবই স্বপ্ন মাত্র। এই জড় ও জড়ের সত্যতায় বিশ্বাস হইতে নিজেদের একেবারে পৃথক্ করিয়া ফেলাই প্রকৃত জ্ঞান। ওঁ তৎ সৎ–'ওঁ'ই একমাত্র প্রকৃত সত্তা, জ্ঞানী সর্বদা ইহা মনে জাগরূক রাখিবেন। নিরপেক্ষ একত্বই জ্ঞানযোগের ভিত্তি। ইহা দ্বৈতভাব-শূন্য অদ্বৈতবাদ। ইহাই বেদান্তদর্শন-সৌধের ভিত্তিপ্রস্তার, বেদান্তের আদি ও অন্ত। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু, আর সব মিথ্যা। 'অহং ব্রহ্মাস্মি'–অহরহ এই বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে উহাকে আমাদের স্বভাবের অঙ্গীভূত করিয়া ফেলিতে হইবে। কেবল এই উপায়েই সকল দ্বৈতভাব , ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-নিরানন্দ অতিক্রম করিয়া এক অদ্বিতীয় সনাতন অব্যয় অসীম ও 'একমেবাদ্বিতীয়ম্-'রূপে নিজেকে উপলব্ধি করিতে আমরা সমর্থ হইব।

জ্ঞানযোগীকে সঙ্কীর্ণতম সাম্প্রদায়িকের মতো একাগ্র, আবার আকাশের মতো উদার হইতে হইবে; সম্পূর্ণভাবে চিত্ত সংযত করিয়া বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টান হইবার সামর্থ্য অর্জন করিতে হইবে; আর স্বেচ্ছায় এইসব বিভিন্ন ধর্মাভাবের মধ্যে নিজেকে ছড়াইয়া দিয়াও চিরন্তন সমন্বয়ের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা রাখিতে হইবে। নিয়ত অভ্যাস দ্বারাই এই সংযম অর্জিত হইতে পারে। এক হইতেই সকল বৈচিত্র্য উদ্ভূত, কিন্তু কর্মের সহিত আমরা যাহাতে নিজেদের এক করিয়া না ফেলি, আমাদের সেই শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। আর সম্মুখে উপস্থিত বস্তু ছাড়া অন্য বস্তু দেখিবার, শুনিবার বা আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি যেন আমাদের না থাকে। সমস্ত মনপ্রাণ অর্পণ করিয়া আমাদিগকে একাগ্র হইতে হইবে। দিনরাত্রি নিজেকে বলো—'সোঽহং, সোঽহং' ।

২

বেদান্তদর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা শঙ্করাচার্য। তিনি অকাট্য যুক্তিসহায়ে বেদের সারসত্যগুলি সংগ্রহ করিয়া অপূর্ব জ্ঞানশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, যাহা তাঁহার ভাষ্যের মাধ্যমে শিক্ষণীয়। ব্রহ্মনির্দেশক পরস্পবিরুদ্ধ বাক্যাবলী গ্রথিত করিয়া দেখাইয়াছেন, একমাত্র সেই নির্বিশেষ সত্তাই আছেন।আরও দেখাইয়াছেন , যেমন খাড়াই পথে অগ্রগতি ধীরে-ধীরেই সম্ভব, তেমনি মানসিক ধারণাশক্তির তারতম্য অনুসারে ব্রহ্মনির্দেশক বৈচিত্র্যও অতি আবশ্যক। খ্রীষ্ট তাঁহার শ্রোতাদের যোগ্যতা অনুসারে যে-উপদেশ দিয়াছেন, তাহা কতকটা ইহারই অনুরূপ। প্রথমতঃ তিনি স্বর্গে আসীন ঈশ্বরকে প্রার্থনা জানাইবার উপদেশ দেন। তারপর একধাপ ঊর্ধ্বে উঠিয়া বলেন, 'আমি দ্রাক্ষালতা; তোমরা শাখা প্রশাখা!' পরিশেষে চরম সত্য প্রচার করিয়া বলেন, 'আমিও আমার পিতা এক', 'স্বর্গরাজ্য তোমাদের অন্তরেই অবস্থিত।' শঙ্করাচার্য শিক্ষা দেন : দেবতার শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ তিনটি—(১) মনুষ্যদেহ, (২) ঈশ্বরলাভের ইচ্ছা এবং (৩) জ্ঞানের আলোক দিতে সমর্থ আচার্য। এই তিন বস্তু লাভ করিতে পারিলে মুক্তি আমাদের করতলগত। একমাত্র

জ্ঞানই আমাদের মুক্তি দিতে পারে, কিন্তু জ্ঞনোদয়ের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ধর্মগুলি তিরোহিত হইবে।

এক অদ্বিতীয় সত্তাই জগতে বিদ্যমান, প্রত্যেক জীবই সেই পূর্ণ সত্তা, শুধু অংশ নয়—ইহাই বেদান্তের সারমর্ম। প্রতিটি শিশির-কণাতে সূর্য পূর্ণরূপে প্রতিবিম্বিত। 'দেশ-কাল নিমিত্ত'-আশ্রয়ে সেই সত্তাই মনুষ্যরূপে প্রকাশিত, কিন্তু দৃশ্যজগতের অন্তরালে এক চরম তত্ত্ব বিরাজমান। নিঃস্বার্থতার ভাব দৃঢ় হইলেই কাঁচা 'আমি' মন হইতে চলিয়া যায়। আমরা দেহ—এই দুঃখকর স্বপ্ন হইতে মুক্ত হইতে হইবে। 'আমি ব্রহ্ম'—এই সত্য জানিতে হইবে। আমরা প্রত্যেকেই পূর্ণ অনন্ত মহাসমুদ্র; জলবিন্দু নই যে সাগরে মিশিয়া অস্তিত্ব হারাইব। মায়া বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেই এই পূর্ণত্ব ও অসীমত্বের জ্ঞান লাভ করিব। অসীমকে ভাগ করা যায় না, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-এর দ্বিতীয় কিছুই নাই, সবই সেই এক ব্রহ্ম। এই জ্ঞান সকলেই লাভ করিবে, কিন্তু এই জীবনেই ঐ জ্ঞানলাভের জন্য আমাদিগকে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে কারণ ঐ জ্ঞান লাভ না করিলে আমরা মনুষ্যজাতির শ্রেষ্ঠ হিতসাধনে সমর্থ হইব না। জীবন্মুক্তই কেবল যথার্থ প্রেম ও প্রকৃত সত্য বিতরণ করিতে—যথার্থ দান করিতে সমর্থ; এবং সত্যই মুক্তি দিতে পারে। বাসনা আমাদিগকে ক্রীতদাসে পরিনত করে। এই বাসনা এক অতৃপ্ত দানব; ইহার কবলে যাহারা পড়ে, তাহাদের শান্তি নাই; কিন্তু জীবন্মুক্ত অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করিয়া সব বাসনা জয় করিয়াছেন, তাঁহার কাম্য আর কিছুই নাই।

দেহ, স্ত্রী-পুরুষ-জ্ঞান, জাতি, বর্ণ বন্ধন—এই সব মোহ মনই আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করে, সুতরাং সত্যের অনুভূতি না হওয়া পর্যন্ত মনকে অহরহ এই সত্য বলিতে হইবে : আমরা আনন্দস্বরূপ; যাহা কিছু সুখ অনুভব করিয়া থাকি, তাহা এই আনন্দেরই আভাস; প্রকৃত স্বরূপের সংস্পর্শেই এই কণামাত্র সুখ আমরা লাভ করিয়া থাকি। সেই ব্রহ্ম সুখদুঃখের অতীত, তিনি জগতের সাক্ষিস্বরূপ, জীবনগ্রন্থের অপরিবর্তনীয় পাঠক; তাঁহার তাঁহার জীবনগ্রন্থের পৃষ্ঠাগুলি একে একে খুলিয়া যাইতেছে।

অভ্যাস হইতে যোগ, যোগ হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে প্রেম, প্রেম হইতে আনন্দের উৎপত্তি।

'আমি ও আমার' একটি কুসংস্কার; ইহার বেষ্টনে আমরা এত দীর্ঘকাল রহিয়াছি যে, ইহাকে ত্যাগ করা একরূপ অসম্ভব। তবুও অতি উচ্চ অবস্থা লাভ করিতে হইলে এই কুসংস্কার ত্যাগ করিতেই হইবে। আমাদিগকে আনন্দময় ও প্রফুল্ল হইতে হইবে। অপ্রসন্ন মুখভাব লইয়া ধর্মলাভ হয় না। সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া যাবতীয় পার্থিব বস্তু অপেক্ষা ধর্ম অনেক বেশী আনন্দপ্রদ। কঠোর তপশ্চর্যা আমাদিগকে পবিত্র করিতে পারে না। ঈশ্বরপ্রেমিক ও পবিত্রত্মা কেন বিষণ্ণ হইবেন? তিনি হইবেন আনন্দময় শিশুর মতো প্রকৃত ঈশ্বর-সন্তান। অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করাই ধর্মের সার; স্বর্গরাজ্য আমাদের অন্তরে, কিন্তু বিশুদ্ধত্মাই সে রাজাধিরাজ-দর্শনের অধিকারী। জগতের চিন্তা করিলে জগৎই থাকিয়া যায়; তিনিই জগৎরূপে প্রকাশিত—এইভাবে চিন্তা করিলে আমরা ঈশ্বরকে লাভ করিব। পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, স্বামী-স্ত্রী, শত্রু-মিত্র, ব্যক্তি বা বস্তু—সকলের উপরেই এই ঈশ্বরভাব আরোপ করিতে হইবে। যদি আমরা জ্ঞানতঃ এই জগৎকে ঈশ্বরময় দেখি—তাঁহাকে ছাড়া আর কিছু অনুভব না করি, ভাবিয়া দেখ, তাহা হইলে এই জগৎ আমাদের চক্ষে কত পৃথকরূপে প্রতিভাত হইবে—তখনই আমাদের সকল দুঃখ, সকল সংগ্রাম সকল যন্ত্রণার চিরতরে অবসান হইবে।

জ্ঞান সাম্প্রদায়িক ধর্মবিশ্বসের ঊর্ধ্বে, তাই বলিয়া জ্ঞান ধর্মবিশ্বাসের প্রতি অশ্রদ্ধা নয়। জ্ঞানলাভ বলিতে বুঝায়, ধর্মমতের ঊর্ধ্বে এক উন্নত অবস্থা লাভ। জ্ঞানী ধ্বংস চান না, পরন্তু সকলকে সাহায্য করিতে চান। নদীর জল যেমন সাগরে মিশিয়া এক হইয়া যায়, যাবতীয় ধর্মও তেমনি জ্ঞানে মিশিয়া একাকার হইয়া যায়।

সকল বস্তুর সত্তাই ব্রহ্মসাপেক্ষ। বাস্তবিকপক্ষে এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেই বুঝিতে পারিব, যথার্থ সত্য আমরা কিছু পরিমাণে উপলব্ধি করিয়াছি। বৈষম্য-দৃষ্টি যখন সম্পূর্ণরূপে চলিয়া যাবে, তখনই বোধ হইবে—'আমি ও জগৎ-পিতা অভিন্ন' ।

ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ অতি সুন্দর জ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন। এই মহৎ কাব্যগ্রন্থ ভারতীয় সাহিত্যরত্নরাজির চূড়ামণিরূপে পরিগণিত। ইহা বেদের ভাষ্যস্বরূপ। গীতা স্পষ্ট বুঝাইয়া

দিতেছেন, এই জীবনেই আধ্যাত্মিক সংগ্রামে আমাদিগকে জয়ী হইতে হইবে। সংগ্রামে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করিয়া সবটুকু আধ্যাত্মিকতাই গ্রহণ করিতে হইবে। গীতা উচ্চতর জীবন-সংগ্রামের রূপক বলিয়া যুদ্ধক্ষেত্রই গীতা-বর্ণনার স্থূলরূপে নির্দিষ্ট। ইহাতে অতি উচ্চাঙ্গের কবিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। বিরুদ্ধ যুযুৎ সুদলের অন্যতম নায়ক অর্জুনের সারথি-বেশে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিষণ্ণ না হইতে এবং মৃত্যুভয় ত্যাগ করিতে উদ্বদ্ধ করিতেছেন; কারণ তিনি তো জানিতেন—তিনি অবিনাশী, আর পরিবর্তনশীল যাহা কিছু, সবই মনুষ্যের প্রকৃত স্বরূপের বিরোধী। অধ্যায়ের পর অধ্যায় ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে অতি উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব শিক্ষা দিতেছেন। এই-সকল উপদেশই গীতাকে পরমাশ্চর্য কাব্যগ্রন্থে পরিণত করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বেদান্তদর্শনই গীতায় নিবদ্ধ। বেদের শিক্ষা এই যে, আত্মা অবিনাশী, দেহের মৃত্যুতে আত্মা কোনরূপেই বিকৃত হন না। বৃত্তরূপ আত্মার পরিধি কোথাও নাই, কেন্দ্র জীবদেহে। তথাকথিত মৃত্যু এই কেন্দ্রের পরিবর্তন মাত্র। ঈশ্বর একটি বৃত্ত, এই বৃত্তের পরিধি কোথাও নাই, কিন্তু কেন্দ্র সর্বত্র। যখনই আমরা এই সঙ্কীর্ণ দেহরূপ কেন্দ্র হইতে বাহিরে যাইতে পারি, তখনই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ—এই ঈশ্বর উপলব্ধ হন।

বর্তমানকাল অতীত ও ভবিষ্যতের সীমারেখা ভেদ-পরিচায়ক রেখামাত্র, সুতরাং অতীত ও ভবিষ্যত হইতে বর্তমানের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই বলিয়া কেবল বর্তমানই গ্রাহ্য—এ-কথা নির্বিচারে বলিতে পারি না। এই তিন কালই একত্র মিলিয়া এক অখণ্ড সমষ্টি। সময় সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এই যে, উহা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির পরিণতির তারতম্য অনুসারে আরোপিত একটি অবস্থা মাত্র।

৩

জ্ঞানের শিক্ষা এই যে, সংসার ছাড়িবে; কিন্তু তাই বলিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিবে না। সন্ন্যাসী সংসারে থাকিবেন বটে, কিন্তু সংসারের হইবেন না—তাঁহার সম্বন্ধে এটিই চরম পরীক্ষা। এইরূপ ত্যাগের ধারণা যে-কোন আকারেই হউক, সকল

ধর্মেই স্থান পাইয়াছে। আমাদের নিকট জ্ঞানের দাবি এই যে, আমরা শুধু 'সমত্ব' দেখিব, সমদর্শী হইব। নিন্দা-স্তুতি, ভাল-মন্দ, এমনকি শীত-উষ্ণও তুল্যরূপে আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতে এমন অনেক সাধু আছেন, যাঁহাদের দ্বন্দ্বাতীত এই সাম্যভাব বর্ণে বর্ণে সত্য। সম্পূর্ণ অনাবৃতদেহ ও আপাততঃ একেবারে শীত-উষ্ণ বৈষম্য-বোধহীন অবস্থায় তুষারমণ্ডিত তুঙ্গ হিমালয়-শৃঙ্গে অথবা উত্তপ্ত মরুভূমিতে তাঁহারা ভ্রমন করিয়া থাকেন।

আমরা 'দেহ নই'—দেহ সম্বন্ধে ভ্রান্ত সংস্কার সর্বগ্রে ত্যাগ করিতে হইবে। তারপর 'মন নই'—মনের সংস্কারও ছাড়িতে হইবে। আমরা মন নই; এই মন 'রেশমের মতো সূক্ষ্ম' শরীর মাত্র, আত্মার কোন অংশ নয়। প্রায় সকল পর্দার্থ সম্বন্ধে প্রযোজ্য এই 'body' শব্দটি দ্বারা সব কিছুরই একটি সাধারণ নাম বুঝায়। ইহাই অস্তিত্ব। এই দেহ উহার অন্তরালে অবস্থিত চিন্তারই প্রতীক; আবার চিন্তাগুলি স্বয়ং পর্যায়ক্রমে দেহের পশ্চাতে অবস্থিত কোন কিছুরই প্রতীক। সেই কোন কিছুই পারমার্থিক সত্তা, আমাদের আত্মার আত্মা, বিশ্বাত্মা, প্রাণের প্রাণ, আমাদের যথার্থ স্বরূপ। যতদিন পর্যন্ত ঈশ্বর হইতে আমাদের অণুমাত্র পৃথক্ অস্তিত্ব-জ্ঞান থাকিবে, ততদিন ভয় থাকিবে। আবার ঈশ্বরের সহিত একত্ববোধ হইলেই ভয় দূর হইবে। কিসের ভয়? কেবল ইচ্ছাশক্তি-সহায়ে জ্ঞানী দেহমনের অতীত অবস্থা লাভ করিয়া এই বিশ্বকে শূন্যমাত্রে পরিণত করেন। এইরূপে অবিদ্যা নাশ করিয়া তিনি তাঁহার যথার্থ স্বরূপ আত্মাকে জানেন। সুখদুঃখ শুধু ইন্দ্রিয়জনিত, এগুলি আমাদের প্রকৃত স্বরূপকে স্পর্শ করিতে পারে না। আত্মা দেশ-কাল-নিমিত্বের অতীত, সেই হেতু অপরিচ্ছন্ন ও সর্বত্র বিরাজমান।

জ্ঞানী সমস্ত বিধি-নিষেধের গণ্ডির বাহিরে গিয়া, স্মৃতির অনুশাসন ও ধর্মশাস্ত্রের অতীত হইয়া নিজেই নিজের শাস্ত্র হইবেন। বিধি-নিষেধের মধ্যে আমরা জড়ীভূত হইয়া মৃত্যু বরণ করি। তবুও যাহারা শাস্ত্রবিধি অতিক্রম করিতে অসমর্থ, জ্ঞানী তাহাদের দোষ দর্শণ করিবেন না; এমন কি 'আমি তোমা অপেক্ষা পবিত্র' অন্যের সম্বন্ধে জ্ঞানী কখন এরূপ মনে করিবেন না।

এইগুলি প্রকৃত জ্ঞানযোগীর লক্ষণ : (১) জ্ঞানী জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না। (২) তাঁহার সকল ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ বশীভূত। উন্মুক্ত আকাশতলে অনাবৃত ধরাই তাহার শয্যা হউক বা রাজপ্রাসাদেই তিনি অবস্থান করুন, উভয় অবস্থাতেই তুল্য সুখী হইয়া, অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া সব কিছুই তিনি সমভাবে ভোগ করিয়া থাকেন। যেহেতু আত্ম-ব্যতিরিক্ত সব কিছু হইতেই তিনি মন উঠাইয়া লইয়াছেন, সেইজন্য দুঃখকষ্টের হাত এড়াইবার চেষ্টা না করিয়া সেগুলির সম্মুখীন হইয়াই দুঃখকষ্ট সহ্য করেন। (৩) জ্ঞানী বুঝিয়াছেন—এক ব্রহ্ম ছাড়া সবই অনিত্য। (৪) মুক্তিলাভের জন্য তাঁহার তীব্র আকাঙ্ক্ষা বর্তমান। প্রবল ইচ্ছাশক্তি-সহায়ে মনকে উচ্চ বিষয়ে নিবিষ্ট করিয়া তিনি শান্তির অধিকারী হন। শান্তি লাভ করিতে না পারিলে আমরা পশু অপেক্ষা বেশী উন্নত নই। সর্বকর্মফল বিসর্জনপূর্বক ইহকাল বা পরকালের ফলকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া জ্ঞানী পরার্থে ও ঈশ্বরার্থে কর্ম সম্পাদন করেন। আত্মজ্ঞান ব্যতীত জগৎ আমাদিগকে আর কি দিতে পারে? আত্মজ্ঞান-লাভ হইলেই সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হইল। বেদের শিক্ষা এই যে, আত্মা এক অখন্ড সত্তা। আমরা জানি , এই আত্মা—মন, স্মৃতি, চিন্তা, এমন কি চেতনারও অতীত। সকলই আত্মপ্রসূত। আত্মারই মধ্য দিয়া অথবা আত্মা আছেন বলিয়াই আমরা দেখি, শুনি, অনুভব করি এবং চিন্তা করি। এই ওঁ—এই অদ্বিতীয় সত্তার সহিত একত্ব-উপলব্ধিই জীবজগতের লক্ষ্য। জ্ঞানীকে সকল ধর্মীয় মতবাদ হইতে মুক্ত থাকিতে হইবে; তিনি হিন্দু বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টান কিছুই নন, কিন্তু তিনি একাধারে এই তিন। জ্ঞানী সর্বকর্ম পরিত্যাগ করেন, তিনি ঈশ্বরে শরণাগত; জ্ঞানীকে কর্ম আর বদ্ধ করিতে পারে না। জ্ঞানী কঠোর বিচারবাদী, 'নেতি'বিচার-সহায়ে তিনি সবই অস্বীকার করেন। তিনি দিবারাত্রি মনে মনে বলেন, 'ধর্মবিশ্বাস নাই, মন্ত্রতন্ত্র নাই, স্বর্গ-নরক নাই , ধর্মমত নাই , মন্দির নাই-কেবল আত্মাই বর্তমান ' সর্ব বস্তু পরিহার করিয়া যে অপরিহার্য পরমতত্ত্ব লাভ হয়, তাহাই আত্মা। সমস্ত ব্যাবহারিক ও সম্বন্ধমূলক ভাবের বিলোপ-অবস্থা,—সেই নির্বাণ-অবস্থা লাভ না হওয়া পর্যন্ত জ্ঞানী কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া শুদ্ধ বিচার ও ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সমস্ত বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন। এই অবস্থার বর্ণনা বা ধারণাও অসম্ভব। কোন পার্থিব ফলের দ্বারাই জ্ঞানের বিচার হয় না। শকুনি যেমন শূন্যে বহু ঊর্ধ্বে উঠিয়া অদৃশ্য হইলেও

সামান্য গলিত দেহ দেখিয়া সবেগে নামিয়া আসিতে সর্বদা উন্মুখ , তেমন হইও না। স্বাস্থ্য বা পরমায়ু বা সম্পদ—কিছুই চাহিও না, কেবল মুক্তিকামী হও। আমরা সচ্চিদানন্দ। সৎ বা অস্তিভাব জগতের শেষ বস্তুনির্দেশক ব্যাপার। তাহাই আমাদের অস্তিত্ব, তাহাই আমাদের জ্ঞান। আর আনন্দ অস্তিত্বের অবিমিশ্র স্বাভাবিক ফল। কখন কখন মুহূর্তের জন্য আমরা সেই পরমানন্দ অনুভব করি; সেই সময় আনন্দ ছাড়া আমরা কিছুই চাহি না, কিছুই দিই না, এবং কিছুই জানি না। তারপর এ আনন্দ অন্তর্হিত হয়, আবার জগতের সমগ্র দৃশ্য চক্ষের সম্মুখে চলিতে থাকে এবং আমরা জানি , এই বিশ্বছবি সর্বাশ্রয় ঈশ্বরেরই উপর বিন্যস্ত শিল্পরচনা মাত্র।' সংসারে ফিরিয়া আসিলেই দেখিতে পাই—সেই পারমার্থিক সত্তাই ব্যাবহারিক সত্তারূপে প্রতিভাত হইয়াছেন, দেখি—সচ্চিদানন্দকে 'পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা' এই ত্রিমূর্তিরূপে। সৎ অর্থাৎ সৃজনীশক্তি, চিৎ—পরিচালিকাশক্তি, আনন্দ—আত্মানুভবশক্তি; এই শক্তিই আবার আমাদিগকে সেই এক ব্রহ্মের সহিত যুক্ত করে। জ্ঞান বা চিৎ ব্যতীত 'সৎ'কে কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না। এজন্যই খ্রীষ্টের কথার শক্তি : 'পুত্রের ভিতর দিয়া ব্যতীত কেহ পরমপিতাকে দর্শন করিতে পারে না।' বেদান্তের শিক্ষা এই যে, ইহলোকেই এবং এই দেহেই নির্বাণ লাভ করা যায়, নির্বাণ লাভ করিবার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত প্রতীক্ষার প্রয়োজন নাই। নির্বাণ অর্থ আত্মানুভূতি। এক মুহূর্তের জন্যও আত্মানুভূতি লাভ হইলে ব্যক্তিত্ব-ভাবের মরীচিকা দ্বারা আর মুগ্ধ হইতে হইবে না। জগৎ প্রপঞ্চ—চক্ষুযুক্ত আমাদের দৃষ্টিতে পড়িবে, কিন্তু এই জগৎ-রচনার কারণ অবগত হইলেই ইহার যথার্থ প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায়। এই জগৎ-রূপ আবরণই অবিকারী আত্মাকে আবৃত রাখিয়াছে। এই আবরণ অপসারিত হইলেই আত্মদর্শণ হয়। পরিবর্তন যাহা কিছু তাহা এই আবরণেই সংঘটিত হয়, আত্মায় নয়। সাধুর নিকট এই আবরণ অতি সূক্ষ্ম, ইহার ভিতর দিয়া বাস্তব সত্তা প্রায় প্রকশিত হইতে পারে, কিন্তু পাপীর নিকট এই আবরণ অতি স্থূল, সুতরাং পাপীর মধ্যে যে আত্মা রহিয়াছেন, তাহা দেখি না এবং সাধুর মধ্যে যে আত্মা আছেন—এই সত্যও সহসা অনুধাবন করিতে পারা যায় না।

একত্বে উপনীত হইলেই সব বিচার সমাপ্ত হয়, সুতরাং আমরা প্রথমতঃ বিশ্লেষণ, তারপর সমন্বয় অবলম্বন করিয়া থাকি। বিজ্ঞানের রাজ্যে দেখা যায় একটি অন্তর্নিহিত প্রাকৃতিক শক্তির অনুসন্ধানে বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলি ক্রমশঃ সীমাবদ্ধ হয়। চরম একত্বকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলেই জড়বিজ্ঞান লক্ষে উপনীত হয়। একত্বে পৌঁছিলেই আমাদের বিশ্রাম। জ্ঞানই চরম অবস্থা।

সকল বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবিজ্ঞান বহুপূর্বেই সেই একত্ব আবিষ্কার করিয়াছে, সেই অদ্বৈত-তত্ত্বে উপনীত হওয়াই জ্ঞানযোগের লক্ষ্য। বিশ্বময় একই পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন, ক্ষুদ্র জীবত্মাগুলি তাঁহারই অভিব্যক্তি মাত্র। অতএব পরমাত্মা তাঁহার অভিব্যক্তিগুলি অপেক্ষা অনন্তগুণে বৃহৎ। সবই পরমাত্মা বা ব্রহ্ম। সাধু, পাপী, মেষ, ব্যঘ্র—এমন কি হত্যাকারী পর্যন্ত পরমার্থের দিক দিয়া ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নয়, যেহেতু ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—এক সৎ বস্তুই বিদ্যমান, ঋষিগণ তাঁহাকে বিভিন্নভাবে অভিহিত করিয়াছেন। এই জ্ঞান ব্যতীত উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই, এবং যোগদ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিতেই এই জ্ঞানের আলোক উদ্ভাসিত হয়। যিনি যত বেশী এই যোগ ও ধ্যানের দ্বারা বিশুদ্ধ ও যোগ্য হইয়াছেন, আত্মানুভূতির আলোক তাঁহার নিকট তত বেশী পরিস্ফুট। এই উৎকৃষ্ট জ্ঞান চারি সহস্র বর্ষ পূর্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু অতি অল্প কয়েকজনেরই অধিকারে আসিয়াছে; এখনও ইহা জাতীয় সম্পত্তিরূপে পরিণত হইতে পারে নাই।

৪

তথাকথিত মনুষ্যনামধারী সকল ব্যক্তিই প্রকৃত 'মানুষ' আখ্যার যোগ্য নয়। প্রত্যেকেই নিজের মন দ্বারা এই জগৎকে বিচার করিয়া থাকে। জগৎ সম্বন্ধে উচ্চতর ধারণা অত্যন্ত কঠিন। অধিকাংশ ব্যক্তির নিকটই তত্ত্ব অপেক্ষা জাগতিক বস্তু বেশী গ্রাহ্য। দৃষ্টান্তরূপে বোম্বাই-এর দুইব্যাক্তি সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। তাঁহাদের মধ্যে একজন হিন্দু,

অপরজন জৈন। ঐ নগরের এক ধনীর গৃহে বসিয়া উভয়েই শতরঞ্চ খেলিতেছিলেন। বাড়িটি সমুদ্রের ধারে। খেলাও বহুক্ষণ ধরিয়া চলিতেছে। যেখানে বসিয়া তাঁহারা খেলিতেছিলেন, তাহার নিচে সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটা তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষন করিলে তাঁহাদের মধ্যে একজন জোয়ার-ভাঁটাকে পৌরাণিকভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, 'দেবতারা এই জল একটা গর্তের মধ্যে ফেলিয়া সেখান হইতে আবার ঢালিয়া ফেলিতেছেন। বারবার এইরূপ ঢালাঢালি করিয়া তাঁহারা খেলা করিতেছেন।' অন্য ব্যক্তি বলিলেন, 'না, তাহা নয়, এই জল ব্যবহারের উপযোগী করিবার জন্য একটা পর্বতের উপর শোষণ করিয়া তুলিয়া লইয়া আবার ঢালিয়া ফেলিতেছেন।' সেখানে একটি যুবক ছাত্র ছিল, সে বিদ্রুপ করিয়া বলিল, 'আপনারা কি জানেন না চন্দ্রের আকর্ষণে এই জোয়ার-ভাঁটা হয়? ইহা শুনিয়া ভদ্রলোক দুইজন ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার দিকে ফিরিয়া জানিতে চাহিলেন-সে কি মনে করে যে , তাঁহারা দুইজনেই নির্বোধ, সে কি মনে করে যে, তাঁহারা দুইজনেই নির্বোধ, সে কি মনে করে যে, তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন চন্দ্র রজ্জু দ্বারা জোয়ার আকর্ষণ করিয়া থাকেন, আর উহা এত দূরবর্তী চন্দ্রের নিকটে যায়। এরূপ বাজে ব্যাখ্যা মানিয়া লইতে তাঁহারা মোটেই রাজি হইলেন না। এমন সময় গৃহস্বামী উপস্থিত হইলে উভয় পক্ষই মীমাংসার জন্য তাঁহাকে মধ্যস্থ মানিলেন। তিনি শিক্ষিত বলিয়া এ রহস্য অবগত ছিলেন, কিন্তু শতরঞ্চ খেলায় রত দুইজনের এ-বিষয়ে বোধ জন্মানো নিতান্ত কঠিন বুঝিয়া যুবকটিকে নিরস্ত হইতে ইঙ্গিত করিলেন এবং জোয়ার-ভাঁটার কারণ সম্বন্ধে এমন ব্যাখ্যা দিলেন যে, মূর্খ শ্রোতা-দুইজনের তাহা ভাল লাগিল : আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন যে, বহুদূরে মহাসাগরের ঠিক মধ্যস্থলে একটি স্পঞ্জের (sponge) পাহাড় আছে। আপনারা দুইজনেই অবশ্য স্পঞ্জ দেখিয়াছেন এবং আমি যে-বিষয় বুঝাইতে যাইতেছি, তাহা নিশ্চয় বুঝিবেন। এই স্পঞ্জ-পাহাড় সাগরের অধিকাংশ জল শোষণ করিয়া লইলেই ভাঁটার উৎপত্তি হয়; ক্রমে দেবগণ নামিয়া আসিয়া ঐ পর্বতের উপর নৃত্য আরম্ভ করিলে তাঁহাদের দেহের ভারে নিষ্পেষিত হইয়া জল বাহির হইয়া যাইলেই জোয়ারের উৎপত্তি হয়। মহাশয়গণ, এই তো জোয়ার-ভাঁটার কারণ; এই কারণ কেমন সরল ও যুক্তিসঙ্গত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার-ভাটা হয়

শুনিয়া যাঁহারা ঠাট্টা করিয়াছিলেন, স্পঞ্জ-পাহাড় ও তাহার উপরে দেবতাদের নৃত্যের বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের আর কোন অবিশ্বাস রহিল না। দেবতা তো তাঁহাদের নিত্য-বিশ্বাস সত্য বস্তু, আর স্পঞ্জ তাঁহারা স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন। উভয়ের মিলিত ক্রিয়াফলেই যে জোয়ার-ভাঁটা হইয়া থাকে, ইহা খুবই সম্ভব।

'আরাম'—সত্যলাভের পরীক্ষা নয়; বস্তুতঃ সত্যলাভ ইহার ঠিক বিপরীত অবস্থা। যদি কেহ প্রকৃতপক্ষে সত্যকে জানিতে চান, তিনি যেন আরামে আসক্ত না হন। সমস্ত সুখভোগের কামনা পরিত্যাগ করা কঠিন, কিন্তু জ্ঞানীকে ইহা বর্জন করিতে হইবে। জ্ঞানী বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া সব বাসনা ত্যাগ করিবেন, তাঁহার দেহাত্মবুদ্ধি থাকিবে না—কেবল তখনই উচ্চতর সত্য তাঁহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইবে। ত্যাগের প্রয়োজন। যজ্ঞ যে ধর্মের অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইয়াছে, তাহা এই ক্ষুদ্র স্বার্থগুলির বিসর্জনের অন্তর্নিহিত শক্তি হইতেই হইয়াছে। মিথ্যা অহংভাবের বিসর্জন দ্বারা আমরা উচ্চতর 'অহং'-জ্ঞান অর্থাৎ আত্মানুভূতি লাভ করিতে পারি। দেবতাদের ক্রোধের উপশমের বা প্রসন্নতার জন্য যে যথার্থ ফলপ্রদ বলি প্রদত্ত হইত, তাহা আত্মজ্ঞান-লাভের উপায় কাঁচা 'আমি'র বিসর্জনেরই রূপক মাত্র। জ্ঞানী দেহরক্ষার জন্য যত্ন করিবেন না, মনেও ঐ ইচ্ছা পোষণ করিবেন না। বিশ্বের ধ্বংস হইলেও জ্ঞানী সাহসের সহিত সত্য অনুসরণ করিবেন। যাহারা অলীক উত্তেজনার পশ্চাতে ধাবিত হয়, তাহারা সত্য অনুসরণ করিতে পারে না। শুধু এই জীবনে নয়, শত শত জীবন ধরিয়া এই সাধনা করিতে হইবে। অতি অল্পসংখ্যক মানুষই অন্তরে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে সাহস করে—স্বর্গসুখ, সাকার ঈশ্বর-উপাসনা ও ফলাকাঙ্ক্ষা বিসর্জন করিতে সাহসী হয়। এই জ্ঞানের সাধনের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প আবশ্যক; সন্দেহে দোদুল্যমান হওয়াও অত্যন্ত দুর্বলতার লক্ষণ। মানুষ নিত্য-পূর্ণই আছে, তাহা না হইলে কিরূপে পূর্ণত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইত? কিন্তু তাহাকে এই পূর্ণত্ব প্রত্যক্ষ করিতে হইয়াছিল। মানুষ যদি শুধু বাহ্য কারণগুলির অধীন থাকিত, তাহা হইলে সে কেবল মরণশীলই থাকিয়া যাইত। যাহারা কোন অবস্থার উপর নির্ভর-শীল নয়, তাহাদের সম্বন্ধেই অমৃতত্ব প্রযোজ্য। আত্মাকে কোন কিছু প্রভাবিত করিতে পারে না—এই ভাব সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক; কিন্তু মানুষকে আত্মার সহিত এক হইতে হইবে , দেহ বা মনের সহিত নয়। মানুষ এই জগতের

দ্রষ্টামাত্র—এই সত্য সে জানিতে পারিলেই নিয়ত গতিশীল এই জগচ্চিত্র উপভোগ করিতে পারিবে। জ্ঞানী নিজেকে বলিতে থাকুন, 'আমি বিশ্ব, আমি ব্রহ্ম।' মানুষ যখন সত্য-সত্যই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মার সহিত এক হইয়া যায়। তখন সকল ব্যাপারই তাহার পক্ষে সম্ভব হয় , এবং সকল জড়বস্তু তাহার দাস হইয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলিয়াছেন, 'মাখন তুলিয়া দুধে রাখো বা জলে রাখো, কিছুরই সহিতই তাহা মিশিবে না। সেইরূপ মানুষ একবার আত্মজ্ঞান লাভ করিলে বিষয়াসক্তি তাহাকে আর স্পর্শ করিতে পারে না।' 'বেলুন হইতে যেমন পৃথিবীর ছোটখাট বৈষম্যগুলি চোখে পড়ে না, মানুষেরও উচ্চ অবস্থা লাভ হইলে ভালমন্দ পার্থক্য আর তাহার চোখে পড়িবে না।' 'পোড়া ঘটকে আর কোন আকার দেওয়া যায় না; তেমনি যে মন একবার ঈশ্বরকে স্পর্শ করিয়াছে এবং অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে, তাহা অবিকারী হইয়া থাকিবে।' সংস্কৃতে 'ফিলজফি' শব্দের অর্থ 'শুদ্ধ দর্শন', এবং ধর্ম হইতেছে ফলিত দর্শনশাস্ত্র। শুধু তত্ত্বমূলক 'কল্পনাত্মক' দর্শন ভারতে বিশেষ সমাদৃত হয় না; সেখানে ভজনালয়, ধর্মমত বা গোঁড়ামি নাই; দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী—এই দুইটি প্রধান বিভাগ আছে। দ্বৈতবাদী বলেন, 'মুক্তির উপায় কেবল ভগবৎ-কৃপা। কার্য-কারণ-বিধি একবার গতিপ্রাপ্ত হইলে আর তাহার বিশ্রাম নাই। এই বিধানের অতীত একমাত্র ঈশ্বর কৃপা করিয়া আমাদিগকে এ বিধান ভঙ্গ করিতে সহায়তা করেন।' অদ্বৈতবাদী বলেন, ' এই জড়প্রকৃতির অন্তরালে এমন একজন আছেন, যিনি মুক্ত; সকল বিধানের অতীত সেই পুরুষকে লাভ করিয়া আমরা মুক্ত হই। এই বন্ধন-হীনতাই মুক্তি।' দ্বৈতবাদ মুক্তির একটি দিক মাত্র, অদ্বৈতবাদ জ্ঞনের চরমে পৌঁছাইয়া দিয়। পবিত্র হওয়াই মুক্তিলাভের অতি সহজপথ। আমরা যাহা অর্জন করি, তাহাই আমাদের নিজস্ব। কোন শাস্ত্র-প্রমাণ বা ধর্মবিশ্বাস আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না। যদি একজন ঈশ্বর থাকেন, সকলেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে। অগ্নির উত্তাপ সমন্ধে কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না , সকলেই অনুভব করিতে পারে। ঈশ্বর সম্বন্ধেও সেইরূপ। ঈশ্বর সকল মানুষেরই প্রত্যক্ষগম্য। প্রতীচ্যবাসীদের 'পাপ' সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা, হিন্দুগণ সেইভাবে পাপের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কুকার্য 'পাপ' নয়; কুকার্য দ্বারা আমরা কোন শাসক ঈশ্বরের বিরাগভাজন না হইয়া শুধু নিজদেরই অনিষ্ট করিয়া থাকি, এবং সেজন্য আমাদিগকে

নিশ্চয়ই শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। আগুনে হাত দেওয়া পাপ নয়, কিন্তু যে ঐ রূপ করে, সে নিশ্চয়ই পাপীর মতো যন্ত্রনা ভোগ করিবে। সকল কর্মেরই কিছু ফল আছে, এবং 'প্রত্যেক কর্মের ফলই কর্তার নিকট ফিরিয়া আসে'। 'ত্রিত্ববাদ'১ 'একত্ববাদ'২ অপেক্ষা উন্নত, একত্ববাদ দ্বৈতবাদ—এই মতে ঈশ্বর ও জীব নিত্য পৃথক। ' আমরা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান'—এই জ্ঞান হইলে বুঝিতে হইবে, ধর্মের উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে; একত্বে উপনীত হইলে অর্থাৎ যখন আমরা ব্রহ্মের সহিত অভিন্নতা উপলব্ধি করি, তখনই চরমোন্নতি বুঝিতে হইবে।

৫

শরীর কেন চিরস্থায়ী হইতে পারে না?—এই প্রশ্ন তর্কশাস্ত্রের অনুমোদিত নয়, কারণ পরণামী ও অস্থায়ী কতকগুলি মূলপদার্থের সমবায়কে 'শরীর' আখ্যা দেওযা হইয়া থাকে। যখন আমরা আর পরিবর্তনের মধ্য দিয়া যাইব না, তখনই এই তথাকথিত শরীর-ধারণের প্রয়োজন থাকিবে না। দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত পদার্থ আদৌ জড় হইবে না। দেশ ও কাল শুধু আমাদের মধ্যেই বিদ্যমান, আমরা সেই অবিনাশী সত্তা। সব সাকারবস্তুই ক্ষণভঙ্গুর, এই জন্য সব ধর্ম বলে, 'ঈশ্বর নিরাকার'। গ্রীকো-ব্যাক্ট্রিয়ান রাজা

———————

১ Trinitarianism,
২ Unitarianism

মিনেন্দার ১৫০ খৃ: পূ: এক বৌদ্ধ পরিব্রাজক সন্ন্যাসী কর্তৃক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন এবং তাঁহার নাম হয় 'মিলিন্দ'। তিনি তাঁহার উপদেষ্টা যুবক-সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করেন, 'বুদ্ধের মতো সিদ্ধপুরুষগণ কি ভ্রান্ত হইতে পারেন অথবা ভুল করিতে পারেন?' যুবক-সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, 'সিদ্ধ ব্যক্তি তাঁহার অভিজ্ঞতার গণ্ডির বাহিরে সামান্য বিষয়গুলি

সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিতে পারেন, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিবলে তিনি যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে, তাঁহার ভ্রান্তি কখনও সম্ভব নয়। তিনি ইহকালেও এই দেহে অভ্রান্ত। তিনি বিশ্বের সারতত্ত্ব ও গূঢ়রহস্য পরিজ্ঞাত আছেন, কিন্তু দেশ ও কালের আশ্রয়ে শুধু বাহ্য বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া যে সার সত্তা প্রকাশ পাইতেছে, তাহা না জানিতে পারেন। তাঁহার মৃত্তিকাজ্ঞান জন্মিয়াছে, কিন্তু ঐ মৃত্তিকা যে যে আকার ধারণ করিতে পারে, সেগুলির কোন অভিজ্ঞতা তাঁহার নাই। সিদ্ধ-পরুষ আত্মাকে জানিয়াছেন, কিন্তু আত্মার প্রতিরূপ ও অভিব্যক্তির জ্ঞান তাঁহার হয় নাই'। তিনি ইচ্ছামাত্রেই আমাদের মতো ব্যাবহারিক জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেন, যদিও অসীম ক্ষমতাবলে এই জ্ঞান আরও অধিক শীঘ্রই লাভ করিতে পারেন। সম্পূর্ণ বশীভূত মনের প্রচণ্ড 'অনুসন্ধান-রশ্মি' কোন পদার্থে নিক্ষিপ্ত হইলেই উহা শীঘ্র আয়ত্ত হইবে। ইহা বুঝা অতি আবশ্যক, কারণ ইহা দ্বারা একজন বুদ্ধ বা একজন খ্রীষ্ট কিরূপে সাধারণ জাগতিক ব্যাবহারিক জ্ঞানে অনভিজ্ঞ ছিলেন, সে সম্বন্ধে যে নিরর্থক ব্যাখ্যা করা হয়, তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। শিষ্যগণ ভুল করিয়া তাঁহাদের যে উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছে, এজন্য তাঁহাদের দোষ দেওযা যায় না। শিষ্যগণ-বর্ণিত বাণীর একটি সত্য, অপরটি অসত্য—এরূপ বলা প্রতারণা। সমগ্র বিবরণ হয় মানিয়া লও, নতুবা পরিত্যাগ কর। অসত্য হইতে সত্য কিরূপে বাছিয়া লইব?

একবার যাহা ঘটিয়াছে, পুনরায় তাহা ঘটিতে পারে,। যদি কেহ কখন পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকেন, আমরাও তাহা লাভ করিতে পারি। এই পৃথিবীতে ও এই শরীরে পূর্ণ হইতে না পারিলে স্বর্গ বা যে-কোন উন্নত অবস্থাই কল্পনা করি না কেন, কোন অবস্থাতেই আমরা ঐ পূর্ণতা লাভ করিতে পারিব না। যীশু যদি সিদ্ধপুরুষ না হন, তাহা হইলে তাঁহার নামে প্রচারিত ধর্ম ভূমিসাৎ হইত। আর তিনি সিদ্ধ হইয়া থাকিলে আমরাও সিদ্ধ হইতে পারি। আমরা যে-অর্থে 'জানা' বুঝি, সেই অর্থে সিদ্ধপুরুষ বিচার করেন না বা 'জানেন না', যেহেতু আমাদের জ্ঞান তুলনামুলক, এবং পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন তুলনা বা শ্রেণীবিভাগ করা সম্ভব নয়। বিচার-মূলক জ্ঞান অপেক্ষা সহজজ্ঞান১ অল্পভ্রমাত্মক, কিন্তু বিচার২ অপেক্ষাকৃত উন্নত, এবং উহা স্বজ্ঞায়৩ পৌঁছাইয়া দেয়, স্বজ্ঞা আরও উন্নত। জ্ঞান স্বজ্ঞার জনক। এই স্বজ্ঞা সহজজ্ঞানের মতোই অভ্রান্ত, কিন্তু উচ্চস্তরে।

প্রাণিজগতে অভিব্যক্তির তিনটি স্তর বিদ্যমান : (১) অবচেতন–যন্ত্রবৎ, অভ্রান্ত; (২) সচেতন–বিচারময়, ভ্রান্ত; (৩) অতিচেতন বা তুরীয়–স্বজ্ঞা, অভ্রান্ত। এই অবস্থাগুলি যথাক্রমে জন্তুম মানুষ ও ঈশ্বরের প্রকাশিত। কারণ যে মানুষ পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন, বোধশক্তির প্রয়োগ ব্যতীত তাঁহার অন্য কিছু থাকে না। তিনি নিজের জন্য কিছু কামনা না করিয়া জীবের মঙ্গলার্থেই জীবনধারণ করেন। যাহা কিছু ভেদ সৃষ্টি করে, তাহাই নাস্তিবাচক বা অভাবাত্মক; যাহা অস্তিবাচক, তাহাই চির-উদার। যাহা আমাদের সাধারণ সম্পত্তি, তাহাই সর্বাপেক্ষা উদার–সেটিই 'সত্তা' ।

'প্রাকৃতিক নিয়ম' হইতেছে জগৎব্যাপারের পারম্পর্য ব্যাখ্যা করিবার একটি মানসিক সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া, কিন্তু বাস্তবিক সত্তারূপে ইহার কোন অস্তিত্ব নাই। এই জগৎপ্রপঞ্চে সংঘটিত কতকগুলি ঘটনাপরম্পরা প্রকাশ করিবার জন্য আমরা 'নিয়ম' শব্দ ব্যবহার করি। যাহার নিকট মাথা নত করিতে হইবে, এমন কোন অপরিহার্য বস্তু বা কুসংস্কাররূপে যেন আমরা এই নিয়মকে গণ্য না করি। ভ্রান্তি বিচারবুদ্ধির নিত্যসঙ্গী, তবুও প্রাণপন সংগ্রামের দ্বারা ভ্রান্তিজয়ের প্রচেষ্টাই আমাদিগকে দেবত্বে পৌঁছাইয়া দিবে। আমাদের দেহ হইতে অনিষ্টকর পদার্থ বাহির করিয়া দিবার জন্য প্রকৃতির যে প্রয়াস, তাহাই ব্যাধি। পাপও তেমনি আমাদের অন্তর্নিহিত দেবভাব হইতে পশুভাব দূর করিবার প্রাণপণ চেষ্টা। দেবত্বে উন্নীত হইবার জন্য আমাদিগকে 'পাপ' অর্থাৎ ভুল করিতে হইবে।

কাহাকেও কৃপার চোখে দেখিও না। সকলকে তোমার সমান বলিয়া দেখিবে, অসাম্য–মুখ্য পাপ অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলো। আমরা সকলেই সমান। 'আমি ভাল' তুমি মন্দ; আমি তোমাকে সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতেছি'–এই সব ভাব যেন আমাদের মনে উদিত না হয়। সমত্বই মুক্ত মানুষের লক্ষণ। যীশু ঘৃণ্য পাপীদের কাছে গিয়া তাহাদের সহিত বাস করিতেন। তিনি কখনও উচ্চ বেদীতে বসিয়া থাকিতেন না। পাপীরাই কেবল পাপ দেখিতে পায়। মানুষকে মানুষরূপে দেখিও না, তাহার মধ্যে শুধু ঈশ্বরকেই দর্শণ কর। আমরহি নিজেদের স্বর্গ সৃষ্টি করি, এবং নরককেও স্বর্গে পরিণত করিতে পারি। নরকেই পাপীদের দেখিতে পাওয়া যায়। যতদিন আমরা আমাদের আশেপাশে পাপীদের

দেখি, ততদিন আমরা নিজেরই নরকে আছি। আত্মা দেশকালের অতীত। 'আমি সচ্চিদানন্দ, সোহহং'—ইহা উপলব্ধি কর। জন্ম-মৃত্যু উভয় অবস্থাতেই আনন্দে থাকো, ঈশ্বরপ্রেমে সদা মাতোয়ারা হও। দেহের বন্ধন হইতে মুক্ত হও। আমরা দেহের দাস হইয়াছি, শৃঙ্খলকে বুকে জড়াইয়া ধরিতে শিখিয়াছি, এবং দাসত্বকে বরণ করিয়া লইয়াছি। আমরা এতদূর দাস হইয়া পড়িয়াছি যে, এই দেহবন্ধনকে চিরস্থায়ী করিতে ইচ্ছা করি, এবং চিরদিন দেহবুদ্ধি লইয়াই থাকিতে চাই। দেহাত্মবুদ্ধিকে আঁকড়াইয়া থাকিও না। কিছুতেই বর্তমান জীবনের মতো আর একটি ভাবী জীবনের আকাঙ্ক্ষা করিও না। এমন কি অতি প্রিয়জনের দেহও ভালবাসিও না, বা তাহাদের দেহ কামনা করিও না। এই জীবনই আমাদের শিক্ষাদাতা; মৃত্যু সেই শিক্ষা নূতন করিযা আরম্ভ করিবার সুবিধা দেয় মাত্র। এই দেহ বিদ্যালয়ের শিক্ষকের মতো, কিন্তু আত্মহত্যা কেবল নির্বুদ্ধিতা, ইহা শুধু শিক্ষককে হত্যা করার মতো কাজ। আবার অন্য দেহ ধারণ করিতে হইবে, সুতরাং দেহাত্মবুদ্ধির অতীত অবস্থায় উন্নীত না হইলে বারংবার দেহধারণ করিতেই হইবে; তাই একটি দেহ নষ্ট করিলে অন্যটির আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর নাই। তবুও আমরা যেন কিছুতেই দেহাত্মবুদ্ধি না রাখি, দেহটিকে যেন শুধু পূর্ণতা লাভ করিবার যন্ত্রস্বরূপ মনে করি। রামের ভক্ত হনুমান্ তাঁহার নিজ অনুভূতি এই কয়েকটি কথায় সংক্ষেপে বলিয়াছেন, 'হে প্রভু, যখন দেহবুদ্ধি থাকে, তখন আমি তোমা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, আমি তোমার দাস। যখন আমার জীব-বুদ্ধি হয়, তখন আমি জ্যোতির্ময় তোমার অংশ, একটি স্ফুলিঙ্গ মাত্র। কিন্তু যখন আত্মবুদ্ধি হয়, তখন আমি ও তুমি এক।' তাই জ্ঞানী অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া শুধু আত্মাকে উপলব্ধি করিবার জন্য সচেষ্ট।

———————

১ Instinct
২ Reason
৩ Intuition
৬

চিন্তা অতি গুরুত্বপূর্ণ, কেন না 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' –যাহার যেমন চিন্তা, তাহার তেমনি সিদ্ধি। জনৈক সাধু বৃক্ষতলে বসিয়া লোককে ধর্মোপদেশ দিতেন। তিনি শুধু দুধ ও ফলমূল আহার করিয়া এবং প্রাণায়ামাদি অভ্যাস করিয়া নিজেকে খুব পবিত্র মনে করিতেন। সেই গ্রামে এক চরিত্রহীনা নারী বাস করিত। স্ত্রীলোকটি দুষ্কার্যের জন্য নরকে যাইবে–এই বলিয়া সাধু প্রত্যহই তাহার নিকট গিয়া তাহাকে সাবধান করিয়া দিতেন। হতভাগিনী তাহার জীবিকা উপার্জনের একমাত্র পথ পরিবর্তন করিতে অক্ষম হইয়া সাধু-কথিত ভয়াবহ পরিণামের চিন্তায় শঙ্কিত থাকিত। নিরুপায় স্ত্রীলোকটি কাঁদিয়া, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিত। এই সাধু ও ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকটির মৃত্যু হইলে দেবদূতেরা আসিয়া সেই স্ত্রীলোকটিকে স্বর্গে লইয়া গেল, আর যমদূতেরা আসিয়া সাধুর আত্মা দাবি করিল। সাধু উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'একি? আমি কি কঠোর সাধুজীবন যাপন করিয়া সকলের মধ্যে ধর্ম প্রচার করি নাই? আমি কেন নরকে যাইব, আর এই ভ্রষ্টা স্ত্রীলোক স্বর্গে যাইবে?' যমদূতগণ বলিল, 'স্ত্রীলোটি দেহ দ্বারা পাপ কাজ করিতে বাধ্য হইলেও তাহার মন সর্বদা ভগবানে নিবিষ্ট ছিল এবং সে মুক্তি কামনা করিয়াছিল। সেই মুক্তি এখন সে লাভ করিয়াছে। আর তুমি বাহিরে ধর্ম-কার্য করিয়াছ, তোমার মন কিন্তু অপরের পাপের দিকেই সর্বদা নিবিষ্ট থাকিত। তুমি পাপই দেখিয়াছ, পাপই চিন্তা করিয়াছ; সুতরাং যেখানে কেবলই পাপ, তোমাকে সেই স্থানেই যাইতে হইবে।' এই গল্পের শিক্ষনীয় বিষয়টি অতি স্পষ্ট : বাহ্য জীবন যাপনের দ্বারা কোন ফলই হয় না। হৃদয় পবিত্র হওয়া চাই; পবিত্রহৃদয় পাপ না দেখিয়া কেব পুন্যই দেখে। মানবজাতির অভিভাবক অথবা পাপীতাপীর উদ্ধারকর্তা সাধুরূপে দাঁড়াইবার চেষ্টা করা আমাদের পক্ষে উচিত নয়। তাহার পরিবর্তে নিজদিগকে পবিত্র করিতে চেষ্টা করিব। ইহার ফলে আমরা অপরের ধর্মলাভের সহায় হইতে পারিব।

পদার্থবিজ্ঞান উভয় দিকেই অতীন্দ্রিয়বিদ্যা দ্বার সীমাবদ্ধ। যুক্তি সম্বন্ধেও ঠিক তাই–ইহার আরম্ভ অ-যুক্তিতে, সমাপ্তিও অ-যুক্তিতে। অনুভূতি-রাজ্যের গভীরে সন্ধান করিলে অনুভূতির অতীত এক স্তরে আমরা উপনীত হইব। যুক্তি বাস্তবিক সঞ্চিত ও শ্রেণীবদ্ধ অনুভূতি–স্মৃতি দ্বারা সুরক্ষিত। ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাহিরে আমরা আর কিছুই কল্পনা বা

বিচার করিতে পারি না। যুক্তি বা বিচারের অতীত কোন কিছুই ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। বিচারশক্তি যে সীমাবদ্ধ, তাহা আমরা বুঝিতে পারি; তবুও ইহা আমাদিগকে এমন স্তরে লইয়া যায়, যেখানে আমরা এক ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থার আভাস পাইয়া থাকি। তারপর প্রশ্ন আসে : মানুষের এমন কোন যন্ত্র কি আছে, যাহার সাহায্যে সে বিচার বা যুক্তির অতীত অবস্থা লাভ করিতে সমর্থ? ইহা সম্ভব যে, যুক্তির অতীত অবস্থা লাভ করিবার একটি শক্তি মানুষের আছে। সত্য-সত্যই ঋষিরা সর্বকালেই এই শক্তি দেখাইয়াছেন। কিন্তু অধ্যাত্মভাব এবং অনুভূতিকে স্বভাবতই যুক্তির ভাষায় রূপায়িত করা অসম্ভব। আর এই ঋষিরাই তাঁহাদের প্রত্যক্ষানুভূত আধ্যাত্মিক ভাবগুলি অন্যকে জ্ঞাপন করিবার অক্ষমতা স্বীকার করিয়াছেন। নিশ্চয়ই তাঁহারা ভাষায় কিছু প্রকাশ করিতে পারেন না; অতএব ইহা শুধু বলা যাইতে পারে, এগুলি তাঁহাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি এবং সকলেরই অধিগম্য। শুধু ঐভাবেই অনুভূতিগুলি জানা যায়, কিন্তু কখনও প্রকাশ করা যায় না। যে বিজ্ঞান মানুষের অতীন্দ্রিয় সত্তার মধ্য দিয়া প্রকৃতির অতীত সত্তাকে বুঝিতে চায়, তাহাকেই ধর্ম বলে। মানুষের বিষয় আমরা এ পর্যন্ত অল্পই জানি, সেইজন্য বিশ্বজগৎ সম্বন্ধেও অল্পই জানি। মানুষের বিষয় আরও বেশী জানিতে পারিলে বিশ্ব সম্বন্ধেও সম্ভবতঃ অধিকতর জ্ঞান লাভ করিব। মানুষ সর্ববস্তুর সংক্ষিপ্ত আধার, সমগ্র জ্ঞান মানুষের মধ্যেই আছে। এই বিশ্বজগতের যেটুকু আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সেইটুকুরই আমরা কারণ নির্ধারণ করিতে পারি, মূলতত্ত্বের কোন কারণ নির্ধারণ করিতে আমরা অসমর্থ। কোন বিষয়ের কারণ নির্ধারণ করার অর্থ—উহাকে শুধু শ্রেণীবদ্ধ করা এবং মনের ক্ষুদ্র কক্ষে পুরিয়া রাখা। একটি নূতন বিষয় পাওয়া মাত্র আমরা উহাকে তখনই পূর্ব হইতে বিদ্যমান একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিতে চেষ্টা করি, এই চেষ্টাকেই বিচারবুদ্ধি বলে। এই বিষয়টি কোন এক শ্রেণীর মধ্যে ফেলিতে পারিলেই কিছু পরিমাণ মানসিক তৃপ্তি বোধ হয়; কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগ দ্বারা আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থাও অতিক্রম করিতে পারি না। প্রাচীনকাল এ বিষয়ে সগৌরবে সাক্ষ্য দিতেছে যে, মানুষ ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থা লাভ করিতে পারে। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে উপনিষদ্ ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়দ্বারা ঈশ্বরকে কখনও উপলব্ধি করা যায় না। আধুনিক অজ্ঞেয়বাদ এ পর্যন্ত একমত, কিন্তু বেদ

নেতিবাচক দিকও অতিক্রম করিয়া স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিতেছেন যে, মানুষ ইন্দ্রিয়াবদ্ধ জমাট বরফের মতো এই জড়জগৎকে অতিক্রম করিতে পারে এবং অতিক্রম করে। সে যেন এই বরফরাশীর কোনস্থানে একটি ছিদ্র আবিষ্কার করিতে পারে এবং তাহার মধ্য দিয়া অখণ্ড জীবনসমুদ্রে পৌঁছিতে পারে। এইরূপে সে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ অতিক্রম করিয়াই তাহার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে।

ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানকে কখনও জ্ঞান বলা যায় না। আমরা ব্রহ্মকে জানিতে পারি না; আমরাই ব্রহ্ম—অংশ নই, পূর্ণব্রহ্ম। যাহার বিস্তার নাই, তাহা কখনও বিভাজ্য নয়। আমরা দেখিতে পাই সূর্য এক, বহু নয়; তবুও সূর্যরশ্মি যেমন লক্ষ লক্ষ শিশিরবিন্দুর মধ্যে প্রতিফলিত দেখা যায়, তেমনি এই প্রতীয়মান বৈচিত্র্য শুধু দেশকালের মধ্যেই প্রতিবিম্বিত। জ্ঞানে উপনীত হইলে বৈচিত্র্য ঘুচিয়া শুধু একত্বই অনুভূত হয়। এ অবস্থায় কর্তা-কর্ম, জ্ঞান-জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, আমি-তুমি-তিনি—কিছুই থাকে না, এক অদ্বিতীয় নির্বিশেষ সত্তামাত্র বিদ্যমান থাকে। সর্বদাই আমরা এই অবস্থায় আছি, একবার মুক্ত হইলেই সদামুক্ত। মানুষ কার্য-কারণ-নিয়ম দ্বারা বদ্ধ নয়। সুখ-দুঃখ মানুষের ভিতরে নাই। সুখ-দুঃখ সঞ্চরণশীল মেঘের মতো, মেঘ সূর্যকে আবৃত করিলে ছায়া পড়ে। সূর্য স্থির, মেঘই সঞ্চরণশীল; মানুষের সুখ-দুঃখও সেইরূপ। মানুষের জন্ম নাই , মৃত্যু নাই ; মানুষ দেশকালের অতীত। এই ভাবগুলি মনের চিন্তা মাত্র, কিন্তু এগুলিকে আমরা বাস্তব সত্ত্বা বলিয়া ভ্রম করি এবং আবৃত সেই মহিমান্বিত সত্যকে দেখিতে পাই না। আমাদের চিন্তার পদ্ধতিকেই ‘কাল’ বলি, কিন্তু আমরা শাশ্বত ‘বর্তমান কাল’। ভাল-মন্দ আমাদের সম্বন্ধে আরোপিত অবস্থামাত্র। একটিকে ছাড়া অন্যটিকে পাওয়া যায় না, কারণ একটি ব্যতীত অন্যটির অর্থ বা অস্তিত্ব নাই। যতদিন আমরা দ্বৈতভাব গ্রহণ করিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে পৃথক্ ভাবি, ততদিন আমরা অবশ্যই ভাল-মন্দ দেখিব।

কেন্দ্রস্থলে উপনীত হইয়াই, পরমাত্মার সহিত এক হইয়াই আমরা ইন্দ্রিয়ের মোহ হইতে অব্যাহতি পাইব। এই বাসনাজ্বর—এই অস্বস্তিকর অশ্রান্ত উৎকট পিপাসা যখন চিরতরে নিবৃত হইবে, কেবল তখনই ভাল-মন্দ হইতে অব্যাহতি পাইব, কারণ দুই-ই আমরা

অতিক্রম করিয়াছি। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে অগ্নি যেমন আরও প্রজ্বলিত হয়, উপভোগের দ্বারা কামও সেইরূপ বৃদ্ধি পায়।১ কেন্দ্র হইতে যত দূরে, চক্র ততই দ্রুত চলিতে থাকে, বিশ্রামও তত কম। কেন্দ্রাভিমুখী হও। কামনা দমন কর, উহাকে নির্মূল কর। মিথ্যা 'অহং'ভাব দূর কর, তাহা হইলে আমাদের দৃষ্টি পরিষ্কার হইবে এবং আমরা ঈশ্বর দর্শন করিব। যে-অবস্থায় উপনীত হইয়া আমরা প্রকৃত স্বরূপে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি, তাহা কেবল ইহ-পরলোকের ভোগ বাসনা ত্যাগ করিয়াই লাভ করা যায়। কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা থাকিলেই বুঝিতে হইবে– আমরা এখনও বাসনার দাস। এক মুহূর্তের জন্যও সম্পূর্ণভাবে আশা ত্যাগ কর, দেখিবে কুয়াসা কাটিয়া যাইবে। মানুষ যখন নিজেই সব, তখন তাহার কিসের আকাঙ্ক্ষা? সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া আত্মতুষ্ট ও আত্মরতি হওয়াই জ্ঞানযোগের রহস্য। 'নাস্তি' বলিলে 'নাস্তি'-ভাব লাভ করিবে; 'অস্তি' বলিলে 'অস্তি'-ভাব পাইবে। অন্তরাত্মার অর্চনা কর, আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই; যাহা-কিছু আমাদিগকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা মায়া–ভ্রান্তি।

৭

বিশ্বের সবই আত্ম-সাপেক্ষ, কিন্তু সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। 'আমরা আত্মা'–ইহা জানিলেই আমাদের মুক্তি। মরণশীল জীবরূপে আমরা মুক্ত নই, কখনও হইতে পারি না। মুক্ত মরণশীলতা–স্ববিরোধী শব্দ, কারণ মরণশীলতা পরিণামী এবং শুধু অপরিণামীই মুক্তি লাভ করিতে পারে। শুধু আত্মাই মুক্ত এবং আত্মাই আমাদের প্রকৃত সত্তা। মুক্তির জন্য অন্তরে এই আকাঙ্ক্ষা আমরা অনুভব করি। সকল মতবাদ ও সকল বিশ্বাস সত্ত্বেও আমরা ইহা জানি, এবং আমাদের প্রতি কার্য দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে, আমরা ইহা জানি। ইচ্ছশক্তি স্বধীন নহে; ইহার আপাতপ্রতীয়মান স্বধীনতা প্রকৃত সত্তার ছায়ামাত্র। এই জগৎ যদি অসীম কার্য-কারণ-শৃঙ্খল হইত, মানুষ কোথায় দাঁড়াইয়া সাহায্য করিত? উদ্ধার-কর্তার দাঁড়াইবার একটি স্থান আবশ্যক, নতুবা খর জলস্রোতে মজ্জমান ব্যক্তিকে রক্ষা করা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? যে ধর্মোন্মাদ নিজেকে সামান্য কীট বলিয়া চীৎকার

করিতেছে, সেও ভাব সে সাধু হওয়ার পথে চলিতেছে। কীটের মধ্যেও সে সাধু (হওয়ার সম্ভাবনা) দর্শন করিতেছে।

---

১ ন জাতু কামঃ কামানাপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে।।—বিষ্ণুপুরাণ

মানব-জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য দুইটি—যথার্থ জ্ঞান (বিজ্ঞান) ও আনন্দ। মুক্তি ব্যতীত এই দুইটি লাভ করা অসম্ভব। এই দুইটি সকল জীবনেরই স্পর্শমণি। নিত্য একত্বকে এরূপ গভীরভাবে অনুভব করা উচিত যে, আমরা সকল পাপীর জন্য কাঁদিব, আমার বোধ করিব—আমরাই পাপ করিতেছি। আত্মোৎসর্গ চিরন্তন নীতি, আত্মপ্রতিষ্ঠা নয়, সবই যখন এম, তখন কাহাকে প্রতিষ্ঠা করিবে? সবই প্রেমময়, 'অধিকার' বলিয়া কিছু নাই। যীশু-প্রচারিত মহান্ উপদেশ অনুসারে জীবন যাপন করা হয় নাই; তাঁহার নীতি অনুসরণ করিয়া দেখ, জগতের উদ্ধার হয় কি না। বিপরীত নীতিই জগতের অনিষ্ট করিয়াছে। স্বার্থপরতা নয়, নিঃস্বার্থতাই এই প্রশ্নের সমাধান করিতে পারে। অধিকারের ভাব একটি সীমাবদ্ধ ভাব; 'আমার' 'তোমার' বলিয়া বাস্তবিক কিছু নাই, কারণ 'আমিই তুমি', 'তুমিই আমি'। আমাদের 'দায়িত্ব' আছে, 'অধিকার' নাই। 'আমি জন্' বা আমি মেরী' না বলিয়া 'আমিই বিশ্ব' বলা উচিত। এই সীমাবদ্ধ ভাবগুলিই ভ্রান্তি এবং আমাদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। 'আমি জন্'—এই চিন্তা মনে উদিত হইবামাত্রই যেন আমি কতকগুলি বাস্তব অধিকার চাই এবং বলিতে থাকি 'আমি ও আমার' এবং ক্রমাগত নূতন পার্থক্য সৃষ্টি করি। এরূপে নূতন সর্বগত পার্থক্যের সঙ্গে আমাদের দাসত্ব বা বন্ধন বাড়িতে থাকে এবং আমরা সেই অখণ্ড অনন্ত অভেদ সত্তা হইতে ক্রমশঃ দূরে সরিয়া পড়ি। একমাত্র অদ্বিতীয় পুরুষই আছেন, আমরা প্রত্যকেই সেই। অভেদ-জ্ঞানই প্রেম ও ভয়শূন্যতা; ভেদজ্ঞান ঘৃণা ও ভীতির দিকে লইয়া যায়। অভেদ-ভাব—একত্বই সকল প্রয়োজন মিটাইয়া দেয়। এই পৃথিবীতে বহিরাগত লোকদের বাদ দিয়া আমরা ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চাই। কিন্তু ঊর্ধ্বে—আকাশে আমরা সেরূপ করিতে পারি না। সাম্প্রদায়িক ধর্মও ঠিক ঐরূপ আচরণ করিয়া বলিয়া থাকে—একমাত্র এই পথেই মুক্তি মিলিবে, অন্যান্য পথগুলি ভুল।

আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য—এইক্ষুদ্র গণ্ডিগুলির লোপ করিয়া উহার সীমারেখা বাড়ানো, যে পর্যন্ত না উপলব্ধি হয়—সকল ধর্মই ঈশ্বরের নিকট পৌঁছাইযা দেয়। এই অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র স্বার্থ বলি দিতে হইবে। নব জীবন দীক্ষালাভ , 'পুরাতন মানুষে'র , মৃত্যু ,নূতন মানুষের জন্ম-মিত্যা অহমিকার নাশ, বিশ্বের একমাত্র সত্তা সেই আত্মার অনুভূতি এই স্বার্থ-বলিদানরূপ সত্যের দ্যোতক।

বেদের দুইটি প্রধান বিভাগ—কর্মকাণ্ড অর্থাৎ যে অংশে কর্মের বিষয় আলোচিত, এবং জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ যে অংশে শুদ্ধ জ্ঞানের বিষয় আলোচিত। বেদে ধর্মভাবের ক্রমোন্নতির ধারা আমরা লক্ষ্য করি। ইহার কারণ এই—যখন উচ্চতর সত্যের উপলব্ধি হইল, তখনও উচ্চতর সত্যে পৌঁছিবার সোপান-স্বরূপ নিম্নতর সত্যের অনুভূতি রক্ষিত হইয়াছে। নিম্নতর সত্যের অনুভূতি রক্ষা করার কারণ এই : ঋষিগণ বুঝিয়াছিলেন যে, সৃষ্টি নিত্য বলিয়া জ্ঞানের প্রথম সোপানের উপযোগী একদল লোক সর্বদা থাকিবে, এবং সর্ব্বোচ্চ দার্শনিক জ্ঞানের দ্বার সকলের নিকট উন্মুক্ত থাকিলেও তাহা কখনও সকলের বোধগম্য হইবার নয়। অন্যান্য সব ধর্মে কেবল সত্যের চরম অনুভূতির উপায়টিই শুধু রক্ষিত হইয়াছে। স্বভাবতঃ তাহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, পূর্বভাবগুলি নষ্ট হইয়া যাওয়ায় নূতন ভাবগুলি অল্পসংখ্যক ব্যক্তির বোধগম্য হইয়াছে এবং এইভাবে ধর্ম ক্রমশঃ বহু লোকের নিকট অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, এই কুফল প্রাচীন রীতি-নীতি ও ঐতিহ্যগুলির বিরুদ্ধে উত্তরোত্তর বিদ্রোহ-ঘোষণাতেই আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। আধুনিক মানুষ এই প্রাচীন মতবাদগুলি গ্রহণ করা দূরে থাকুক, কেন তাহারা এগুলি গ্রহণ করিবে, তাহার কারণ দর্শন করিবার জন্য স্পর্ধার সহিত দাবি করিতেছি। আধুনিক খ্রীষ্টধর্মের অধিকাংশ মতবাদই প্রাচীন পৌত্তলিকতা ও রীতিনীতিগুলির উপর নূতন নাম ও অর্থের প্রয়োগমাত্র। যদি প্রাচীন মূল সূত্রগুলি রক্ষিত হইত এবং পরিবর্তনের কারণগুলি স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইত, তাহা হইলে অনেক বিষয়ই সুবোধ্য হইত। বেদে ধর্মের প্রাচীন ভাবগুলি রক্ষিত আছে; এই কারণে ভাবগুলি ব্যাখ্যা করিবার জন্য বিপুল ভাষ্য-প্রণয়ন আবশ্যক হইয়াছে, এবং ভাবগুলি কেন রাখা হইয়াছে, এবং ভাবগুলি কেন রাখা হইয়াছে, তাহাও বলা হইয়াছে। অর্থ না বুঝিয়া প্রাচীন মতগুলি দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইযা থাকিবার দরুন অনেক

কুসংস্কারের সৃষ্টি হইয়াছে। অনেক আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপে অধুনা-বিস্মৃত ভাষায় মন্ত্রগুলি উচ্চারিত হইয়া আসিতেছে; এখণ আর ঐ মন্ত্রগুলির কোন প্রকৃত অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। খ্রীষ্টজন্মের বহু পূর্বেই ক্রমবিকাশবাদ বেদে স্থান পাইয়াছে, কিন্তু ডারুইন এই মতবাদটি সত্য বলিয়া স্বীকার না করা পর্যন্ত, ইহা হিন্দুদিগের একটি কুসংস্কাররূপে পরিগণিত হইত।

প্রার্থনা ও উপাসনার বাহ্য রীতি-নীতিগুলি কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত। নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইলে এবং শুধু বাহ্য আচারমাত্রে পর্যবসিত হইতে না দিলে এগুলি কল্যানপ্রদ। এগুলি চিত্তকে শুদ্ধ করে। কর্মযোগী চায় প্রত্যেকেই তাহার পূর্বে মুক্তি লাভ করুক। অন্যকে মুক্ত হইতে সাহায্য করাই তাহার একমাত্র মুক্তি। 'কৃষ্ ভক্তদের সেবাই তাহার শ্রেষ্ঠ উপাসনা'।কোন মহাপুরুষ বলিয়াছেন , 'সমগ্র জগতের পাপ গ্রহণ করিয়া আমাকে নরকে যাইতে দাও, কিন্তু জগতের পরিত্রাণ হউক।' এই ভাবের প্রকৃত উপাসনা আত্মোৎসর্গে পরিণত হয়। কথিত আছে, একজন মুনি তাঁহার বহুদিনের বিশ্বস্ত কুকুরটি যাহাতে স্বর্গে যাইতে পারে, সেজন্য স্বেচ্ছায় নিজের পুণ্য কুকুরকে দান করিয়া সানন্দে নরকে যাইতে উদ্যত হন।

বেদের জ্ঞানকাণ্ড শিক্ষা দেয় যে, জ্ঞানই একমাত্র পরিত্রাতা; ইহার অর্থ এই—মুক্তিলাভ না করা পর্যন্ত জ্ঞান আশ্রয় করিয়া থাকিতে হইবে। জ্ঞানই প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য, অর্থাৎ জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, জ্ঞাতা নিজেকেই জানেন। একমাত্র কর্তা আত্মাই নিজেকে প্রকাশ করিবার এবং জানিবার চেষ্টা করে। দর্পণ যতই স্বচ্ছ হইবে, প্রতিবিম্ব ততই স্পষ্ট হইবে। ঐরূপ মানুষও শ্রেষ্ঠ দর্পণ; তাহার অন্তকরণ যত বেশী শুদ্ধ হইবে, তাহার মধ্যে ঈশ্বর তত বেশী প্রতিবিম্বিত হইবেন। মানুষ নিজেকে ঈশ্বর হইতে পৃথক্ মনে করিয়া এবং দেহাত্মবুদ্ধি আনিয়া ভ্রমে পতিত হয়। মায়া হইতে এই ভ্রমের উৎপত্তি। মায়া ঠিক ভ্রান্তি নহে; যে বস্তু প্রকৃতই যাহা , তাহাকে সেইরূপ না দেখিয়া অন্যরূপে দেখাকেই 'মায়া' বলে। এই দেহাত্মবুদ্ধি হইতেই ভেদ; ভেদ হইতে দ্বন্দ্ব ও দ্বেষ। এই ভেদবুদ্ধি যতদিন থাকিবে, ততদিন আমরা কখনও সুখী হইতে পারি না। জ্ঞানী বলেন—অজ্ঞানও ভেদদৃষ্টিই সকল

দুঃখের দুইটি কারণ। সংসারে আঘাতের পর আঘাত পাইয়া মানুষ মুক্তির জন্য সজাগ হয় এবং জন্মমৃত্যুর ভীষণ আবর্তন হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় খুঁজিয়া জ্ঞানের পথ আশ্রয় করে এবং স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া মুক্ত হয়। মুক্তিলাভের পর মানুষ সংসারকে একটি প্রকাণ্ড যন্ত্ররূপে দেখে এবং যাহাতে নিজের হাতটি যন্ত্রের চক্রের মধ্যে না পড়ে, সে বিষয়ে সাবধান হয়। এইরূপে মুক্ত পুরুষের কর্মনিবৃত্তি হয়। কোন্ শক্তি মুক্ত পুরুষকে কর্মে আবদ্ধ করিতে পারে? তিনি লোকের হিত করেন, কারণ ইহা তাঁহার প্রকৃতি; কোন কল্পিত কর্তব্যের প্রেরণায় তিনি পৃথিবীর হিত করেন না। যাহারা এখনও ইন্দ্রিয়ের দাস, তাহাদের সম্বন্ধে এ-কথা প্রযোজ্য নয়। নিকৃষ্ট অহমিকা যিনি অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহার জন্যই এই মুক্তি; তিনি আত্মায় প্রতিষ্ঠিত—কোন নিয়মের অধীন নহেন, তিনি মুক্ত এবং পূর্ণ। তিনি প্রাচীন কুসংস্কারগুলি অতিক্রম করিয়া সংসারচক্রের বাহিরে গিয়াছেন। প্রকৃতি আমাদের নিজেদেরই দর্পণস্বরূপ। মানুষের কর্মশক্তির সীমা আছে, কিন্তু বাসনা অসীম, সেজন্যই আমরা কর্মবিমুখ হইয়া অপরের কর্মশক্তি কাজে লাগাইযা তাহাদের শ্রমের ফল ভোগ করিতে সচেষ্ট হই। কাজের জন্য যন্ত্র আবিষ্কার দ্বারা কখনই মানুষের শ্রীবৃদ্ধি হয় না, কারণ আমরা বাসনার পরিতৃপ্তি করিতে গিয়া বাসনার সৃষ্টি করি; নিঃশেষিত না হইয়া আমাদের আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। অতৃপ্ত বাসনা লইয়া মরিলে বাসনা-পরিতৃপ্তির বৃথা অন্বষণে বারংবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। হিন্দুরা বলেন, 'মনুষ্য-শরীর ধারণ করিবার পূর্বে আমাদের আশী-লক্ষ্ যোনি পরিভ্রমন করিতে হইয়াছে।' বাসনা নাশ করিয়া উহার হাত হইতে পরিত্রাণ পাও—ইহাই জ্ঞানের কথা। ইহাই একমাত্র পন্থা। সব কার্য-কারণ সম্বন্ধ দূর করিয়া আত্মাকে উপলব্ধি কর। শুধু মুক্তিই যথার্থ নীতিজ্ঞান দিতে পারে। শুধু কার্য-কারণ-শৃঙ্খলা অনন্তকাল থাকিলে নির্বাণ লাভ অসম্ভব হইত। এই কার্য-কারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ মিথ্যা 'অহং'-এর নাশই নির্বাণ। কারণের অতীত হওয়াই মুক্তি। আমাদের যথার্থ স্বরূপ সৎ ও মুক্ত। আমরা শুদ্ধসত্ত্ব, অ-সৎ হওয়া বা অন্যায় কর্ম করা আমাদের স্বভাববিরুদ্ধ। যখন আমরা চক্ষু বা মন দ্বারা ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করি, তখন 'ইহা' বা 'উহা' সংজ্ঞা দ্বারা তাঁহাকে অভিহিত করি, কিন্তু বাস্তবিক এক সৎ-বস্তুই আছেন, সব বৈচিত্র্য সেই একেরই ব্যাখ্যা। আমরা কোন-কিছু হই না, আমাদের যথার্থ স্বরূপকেই

পুনঃপ্রাপ্ত হই। অজ্ঞান ও অসাম্য সকল দুঃখের কারণ—বুদ্ধের এই সংক্ষিপ্ত সার কথা বৈদান্তিকেরা গ্রহণ করিয়াছেন, কারণ ইহাই শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার ও এই মানব-শ্রেষ্ঠর বিস্ময়কর প্রজ্ঞার নিদর্শন। আসুন, আমরা সাহসী ও অকপট হই; তবেই আন্তরিক শ্রদ্ধা লইয়া যে-কোন পথই অবলম্বন করি না কেন, তাহাতেই মুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছিব। শৃঙ্খলের পরস্পর-সংযোজক খণ্ডগুলির একটি হাতে আসিলেই ক্রমশঃ একের পর এক করিয়া সমগ্র শৃঙ্খলটি হস্তগত হইবে। মূলে জলসেচন করিলেই সমগ্র বৃক্ষ সিঞ্চিত হইবে। প্রতি পত্রে জলসিঞ্চন দ্বারা সময় নষ্ট হইবে মাত্র, উপকার কিছুই হইবে না। অন্যভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় ঈশ্বরকে লাভ করিবার চেষ্টা কর; তাঁহাকে লাভ করিলেই আমাদের সব পাওয়া হইল। গির্জা, ধর্মমত, পূজাপদ্ধতি—এগুলি ধর্মের অপরিণত চারাগাছকে রক্ষা করিবার বেড়া মাত্র; কিন্তু পরে যাহাতে চারাগাছটি মহীরুহ হইয়া উঠিতে পারে, সেজন্য এই বেড়াগুলি তুলিয়া ফেলিবে। সুতরাং বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়, বাইবেল, বেদ, শাস্ত্র এই ধর্মের চারাগাছের টবের মতো; কিন্তু চারাগাছেকে টবের বাহিরে গিয়া বিস্তার লাভ করিতে হইবে।

আমরা এই পৃথিবী, সূর্যলোক, নক্ষত্রলোক—সব লোকেরই অন্তর্গত, ইহা আমরা সমভাবে অনুভব করিতে শিখিব। আত্মা দেশ ও কালের অতীত; দৃষ্টিসম্পন্ন সব চোখই আমার চোখ; ঈশ্বরের গুণগানে রত সব মুখই আমার মুখ; প্রত্যেক পাপীও আমিই। আমরা কিছুতেই বদ্ধ নই, আমরা বিদেহ। এই বিশ্বই আমাদের দেহ। আমরা স্বচ্ছ ফটিকের মতো সব বস্তুকেই প্রতিবিম্বিত করিতেছি, কিন্তু পূর্বাপর আমরা সেই একই আছি। আমরা যাদুকর, ইচ্ছামত লাঠি ঘুরাইয়া চোখের সামনে নানা দৃশ্য সৃষ্টি করিতেছি, কিন্তু আমাদিগকে এই-সকল দৃশ্যপ্রপঞ্চের অন্তরালে যাইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। এই বিশ্ব কেটলির মধ্যে ফুটন্ত জলের মতো; প্রথমে একটি, তারপর আর একটি, তারপর বহুবুদ্বুদের সৃষ্টি হইযা অবশেষে সব জল এককালে ফুটিয়া উঠিবে এবং বাষ্পাকারে উড়িয়া যাইবে। প্রথমতঃ মহান্ আচার্যগণ বুদ্বুদের মতো এখানে একজন, ওখানে একজন আবির্ভূত হইয়াছেন; অবশেষে কিন্তু সকল প্রাণীই বুদ্বুদে পরিণত হইয়া পরিত্রাণ লাভ করিবা। চিরনবীন সৃষ্টি নূতন জল আনিয়া বার বার এই নিয়মের মধ্য দিয়া চলিতে

থাকিবে। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যতগুলি বুদ্বুদের আবির্বাব হইযাছে, বুদ্ধ ও যীশু ইহাদের মধ্যে দুইটি মহত্তম বুদ্বুদ। তাঁহারা ছিলেন শ্রেষ্ঠ পুরুষ, স্বয়ং মুক্ত হইয়া অপরকে মুক্ত হইতে সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহাদের কেহই পূর্ণ ছিলেন না, কিন্তু তাঁহাদের গুণের দ্বারাই তাঁহাদিগকে বিচার করিতে হইবে, দোষের দ্বারা নয়। খ্রীষ্ট পূর্ণতার আদর্শে পৌঁছিতে পারেন নাই, কারণ তিনি সর্বদা নিজের প্রচারিত অতি উচ্চ আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করেন নাই, এবং সর্বোপরি স্ত্রীজাতিকে পুরুষের সমান অধিকার দেন নাই। স্ত্রীজাতি তাঁহার জন্য যথাসাধ্য করিলেও তিনি তাহাদের একজনকেও ধর্মপ্রচারক করেন নাই; সেমিটিক-বংশে তাঁহার জন্মই ইহার নিঃসন্দেহ কারণ। মহানুভব আর্যগণ ও তাঁহাদের মধ্যে বুদ্ধ স্ত্রীলোককে পুরুষের সমান অধিকার দিয়াছেন। আর্যদের নিকট ধর্মে স্ত্রী-পুরুষ জাতিবিচার ছিল না। বেদ ও উপনিষদে নারীরাও চরম সত্যের প্রবক্তা ছিলেন, এবং পুরুষের সহিত সমভাবে পূজা পাইতেন।

৮

সুখ ও দুঃখ দুই-ই শৃঙ্খল, একটি সোনার, অপরটি লোহার; আমাদের বন্ধন ঘটাইতে এবং স্বরূপের উপলব্ধি হইতে নিবৃত্ত করিতে দুই-এরই শক্তি কিন্তু সমান। আত্মা সুখ-দুঃখ দুই-এরই অতীত। এই সুখ-দুঃখ অবস্থা মাত্র, এবং অবশ্যই পরিবর্তনশীল। আত্মার প্রকৃতি নিত্য আনন্দ ও শান্তি। এই আনন্দ ও শান্তির অবস্থা আমাদিগকে নূতন করিয়া লাভ করিতে হইবে না। ইহা আমাদের অধিগতই আছে। দৃষ্টির মলিনতা ধুইয়া ফেলিলেই উহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিব। আমরা সততই আত্মায় অধিষ্ঠিত থাকিব এবং সম্পূর্ণ প্রশান্তির সহিত এই চঞ্চল বিশ্বপট দর্শন করিব। এ বিশ্বব্যাপার শুধু শিশুর খেলা—ইহা যেন আমাদের চিত্তের প্রশান্তি নষ্ট করিতে না পারে। মন যদি স্তুতিতে হৃষ্ট হয়, নিন্দায় ব্যাথিত হইবে। ইন্দ্রিযের সুখ, এমন কি মনের সুখও ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু বাহ্যজগৎ-নিরপেক্ষ যথার্থ বিমল সুখ আমাদের অন্তরেই আছে। এই আত্মার আনন্দই পৃথিবীতে ‘ধর্ম’ নামে

অভিহিত। আমাদের অন্তরে যত বেশী আনন্দ, আমরা তত বেশী ধার্মিক। সুখের জন্য যেন আমরা জগতের দিকে চাহিয়া না থাকি।

কয়েকটি গরীব জেলেনী প্রবল ঝড়ের মুখে পড়িয়া এক ধনীর উদ্যান-বাটিতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ধনী তাহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া আহার করাইলেন এবং মনোহর পুষ্পের সৌরভে আমোদিত এক গ্রীষ্মাবাসে বিশ্রামের স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন। জেলীনীরা এই সুবাসিত উদ্যান-বাটিতে শয়ন করিল বটে, কিন্তু ঘুমাইতে পারিল না। তাহারা যেন আকাঙ্ক্ষিত কোন-কিছু হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, সেটি ফিরিয়া না পাওয়া পর্যন্ত সুস্থ বোধ করিতেছিল না। অবশেষে তাহাদের একজন উঠিয়া গিয়া যেখানে মাছের ঝুড়িগুলি রাখা ছিল, সেখান হইতে সেগুলি ঘরে লইয়া আসিল, তখন সেই চিরাভ্যস্ত গন্ধ পাইবামাত্র সকলে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল।

আমাদের নিকট এই জগৎটি যেন সেই মাছের ঝুড়ির মতো না হয়; আমরা যেন সুখের জন্য ইহার উপর নির্ভর না করি। এটি তামসিক অর্থাৎ তিন গুণের মধ্যে যেটি নিকৃষ্ট, তাহার দ্বারা বদ্ধ হওয়া। ইহার ঠিক উপরের স্তরটি 'অহং'ভাবপূর্ণ; সেখানে অহরহ 'আমি'র প্রকাশ দেখা যায়। এই প্রকৃতির লোকেরা সময় সময় সৎকার্য করে এবং ধার্মিক হয়; ইহারা রাজসিক বা কর্মপর প্রকৃতির। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বা সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকেরা শ্রেষ্ঠ; তাঁহারা শুধু আত্মাতেই বাস করেন। এই তিন প্রকার গুণ অল্পবিস্তর সকল মানুষেই আছে এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গুণ প্রবল হয় মাত্র। রজোগুণের দ্বারা তমোগুণকে অভিভূত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, এবং পরে দুইটিকেই সত্ত্বগুণে নিমজ্জিত করিতে হইবে।

'সৃষ্টি' অর্থে নূতন কিছু গড়া নয়, সাম্যভাব ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা। খণ্ড খণ্ড সোলা একপাত্র জলের তলদেশে নিক্ষেপ করিলে তাহারা স্বতন্ত্রভাবে ও একযোগের সবেগে উপরের দিকে উত্থিত হয়; সকল সোলা উপরে উঠিয়া সাম্যভাব লাভ করিলে গতি বা জীবনসংগ্রাম থামিয়া যায়। সৃষ্টিব্যাপারেও এইরূপ। সমত্বে পৌঁছিলে অস্থির ভাবগুলি নিবৃত্ত হয় এবং তথাকথিত জীবনযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। জীবনের সঙ্গে মন্দ জড়িত থাকিবেই, কারণ

সাম্যভাব ফিরিয়া পাইলে জগৎ লোপ পাইবে; যেহেতু সাম্য ও ধ্বংস একই বস্তু। দুঃখশূণ্য সুখ বা অশুভশুণ্য শুভ কোনকালেই সম্ভব নয়, কেন না সাম্যভাবের অভাবই জীবন। আমরা চাই মুক্তি; জীবন বা সুখ বা মঙ্গল আমাদের কাম্য নয়। সৃষ্টি নিত্য, ইহার আদি বা অন্ত নাই; ইহা যেন অনন্ত হ্রদের বক্ষে চিরচঞ্চল তরঙ্গপ্রবাহ। এই হ্রদের অনেক স্থল অতলস্পর্শ, অনেক স্থল শান্ত, কিন্তু সদাই তরঙ্গভঙ্গ চলিতেছে, সাম্য অবস্থা লাভের জন্য সংগ্রাম অনন্ত। জীবন ও মৃত্যু একই সত্যের নামান্তর মাত্র, একই মুদ্রার দুই পিঠ। দুই-ই মায়া—এই মুহূর্তে প্রাণধারণের, পরমুহূর্তেই প্রাণত্যাগের দুর্বোধ্য চেষ্টা। এ-সকলের ঊর্ধ্বে আত্মাই প্রকৃত স্বরূপ। আমরা সৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করি এবং পরে আমাদের জন্য উহা জীবন্তভাব ধারণ করে। বিষয়গুলি স্বয়ং প্রাণশূন্য, আমরাই তাহাদের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করি, এবং পরে আমরাই কখন বা বিষয় উপভোগ করি, আবার কখন মূঢ়ের ন্যায় বিষয় হইতে ত্রস্তভাবে পলায়ন করি! এই জগৎ সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়—সত্যের ছায়া মাত্র।

কবি বলিয়াছেন, 'কল্পনা সত্যের সোনালী আভাস' ; অন্তর্জগৎ—প্রকৃত সত্তা—বহির্জগৎ হইতে অনন্তগুণ বড়। বহির্জগৎ প্রকৃত সত্তার ছায়াময় অভিক্ষেপ। রজ্জুদর্শনকালে সর্পদর্শন হয় না, আবার সর্প দৃষ্ট হইলে রজ্জুদৃষ্টি তিরোহিত হয়। একই সময়ে রজ্জু ও সর্পজ্ঞান অসম্ভব। ঠিক তেমনি যখন আমরা জগৎ দেখি, তখন আত্মাকে উপলব্ধি করি না, ইহা কেবল বুদ্ধির ধারণা। ব্রহ্মানুভূতিতে 'অহং'-জ্ঞান ও জগৎ-বোধ লোপ পায়। আলো কখনও অন্ধকার জানে না, আলোতে অন্ধকার নাই; (ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নাই) ব্রহ্মই সব। যখন একজন ঈশ্বর স্বীকার করি, তখন বুঝিতে ইহবে—প্রকৃতপক্ষে আত্মাকেই নিজেদের হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়া আমাদের বাহিরে অর্চনা করিতেছি; কিন্তু সর্ববস্থাতেই তিনি আর অন্য কেহ নন—আমাদেরই যথার্থ স্বরূপ, এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর।

যেখানে আছে, সেখানেই থাকা পশুর প্রকৃতি; ভালোকে গ্রহন এবং মন্দকে বর্জন করাই মানুষের প্রকৃতি; গ্রহণ বা বর্জন না করিয়া নিত্যানন্দে থাকাই দৈবী প্রকৃতি। আসুন, আমরা দৈবী প্রকৃতি লাভ করি; আমাদের হৃদয়কে সমুদ্রের মতো উদার করিয়া, অকিঞ্চিৎকর

পার্থিব বস্তুগুলির অতীত হইয়া জগৎকে শুধু চিত্রের মতো দেখি। কেবল তখনই আমরা সম্পূর্ণ অনাসক্ত-ভাবে জগৎকে উপভোগ করিতে পারি।

জগতে ভালোর সন্ধান কর কেন, এখানে কি তাহা পাইতে পারি? সংসার যত উৎকৃষ্ট বস্তুই দিক না কেন, ইহা ঘোলা জলে খেলিতে খেলিতে শিশুদের কয়েকটি কাচের মালা পাওয়ার মতো; মালাগুলি বার বার তাহাদের হাত হইতে পড়িয়া যায়—আবার অনুসন্ধান চলে। ধর্ম ও ঈশ্বর অসীম শক্তিপ্রদ। মুক্ত অবস্থায় আমরা শুধু আত্মা; মুক্ত হইলেই অমৃতত্বে স্থিতি; ঈশ্বরও মুক্ত হইলেই ঈশ্বরপদবাচ্য।

'অহং'-সৃষ্ট সংসার-বাসনা ত্যাগ করিতে না পারিলে আমরা কখনও স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিব না; অতীতে কেহ কখনও পারে নাই, ভবিষ্যতেও কখনও পারিবে না। সংসার-ত্যাগের অর্থ সম্পূর্ণভাবে অহংকে ভুলিয়া যাওয়া, 'অহং'-কে একেবারে না বোধ করা, দেহে বাস করিয়াও দেহের অধীন না হওয়া। এই ধূর্ত অহমিকা সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। মানব-জাতির হিত করিবার শক্তি কেবল সেই নীরব কর্মীদেরই আছে, যাঁহারা নিজেদের ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিয়া পরকে ভালবাসিবার জন্য জীবন ধারণ করেন। তাঁহারা কখনও 'আমি, আমার' বলেন না, অন্যের হিতসাধন করিবার যন্ত্রস্বরূপ হইয়াই তাঁহারা ধন্য। তাঁহারা ঈশ্বরের সহিত সম্পূর্ণ এক হইয়াছেন, কোন কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না বা জ্ঞাতসারে কোন কর্মও করেন না। তাঁহারাই প্রকৃত জীবন্মুক্ত—সম্পূর্ণ নিষ্কাম, ক্ষুদ্র ব্যাক্তিত্বের অতীত, উচ্চাকাঙ্ক্ষা-বর্জিত তাঁহারা ব্যক্তিত্বহীন তত্ত্ব মাত্র। ক্ষুদ্র 'আমি' যতই বিসর্জন করিব, ততই আমরা ঈশ্বরভাবাপন্ন হইব। চলুন, আমরা ক্ষুদ্র 'আমি'কে পরিত্যাগ করি, তবেই আমাদের অন্তরে বৃহৎ 'আমি' আসিবে। যখন আমাদের মন হইতে 'অহং'-ভাব সম্পূর্ণ দূর হয়, তখনই আমরা উৎকৃষ্ট কর্মী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হই। বাসনাশূন্য ব্যক্তিদের কর্মই মহৎ ফল প্রসব করে। যাহারা তোমার নিন্দা করে, তাহাদিগকে আশীর্বাদ কর; চিন্তা করিয়া দেখ , তোমার মিথ্যা 'অহং' দূর করিতে সাহায্য করিয়া নিন্দুকেরা তোমার কি মহৎ উপকার করিতেছে! যথার্থ 'আমি'কে

আঁকড়াইয়া থাকো, শুধু সৎ চিন্তা কর, দেখিবে ধর্মপ্রচারকদের অপেক্ষা অনেক বেশী কাজ করিতেছ। পবিত্রতা ও নীরবতা হইতেই মহা শক্তিময়ী বাণী আসে।

৯

ব্যক্ত ভাব কার্যতঃ অবস্থা বা অধঃপতন, যেহেতু ভাব কেবল অক্ষরের সাহায্যেই ব্যক্ত হয়। তাই সেন্ট পল বলিয়াছেন, 'অক্ষর ভাবকে নষ্ট করে।'১ অক্ষরের মধ্যে জীবন থাকিতে পারে না—অক্ষর ভাবের প্রতিবিম্ব মাত্র। তথাপি ভাব প্রকাশের জন্য ভাবকে জড়ের দ্বারা আবৃত করিতে হইবে। আবরণের মধ্যে আমরা প্রকৃত সত্য দেখিতে পাই না, আবরণকেই প্রতীক না ভাবিয়া যথার্থ সত্য বলিয়া গ্রহণ করি। এই ভ্রম প্রায় সকলেরই হয়। প্রত্যেক মহান্ আচার্য ইহা জানেন এবং সাবধান হন, কিন্তু জনসাধারণ অপ্রত্যক্ষ অপেক্ষা প্রত্যক্ষের পূজা করিতেই বেশী উন্মুখ। ব্যক্তিত্বের পিছনে তত্ত্বের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার এবং সময়োপযোগী নূতন ভাব দিবার জন্যই মহাপুরুষদের আবির্ভাব। সত্য চিরদিন অপরিবর্তনীয়, কিন্তু ইহাকে শুধু নূতন আকারে উপস্থিত করা যাইতে পারে, অথবা মানবজাতি তাহাদের উন্নতি অনুসারে যেভাবে গ্রহণ করিতে পারে, সেভাবেই সত্যের প্রকাশ হয়। নাম-রূপ হইতে মুক্ত হওয়াই, বিশেষতঃ যখন সুস্থ-অসুস্থ, সুন্দর-কুৎসিত কোনপ্রকার শরীরধারণেরই প্রয়োজন বোধ করি না, তখনই আমাদের এই সংসার-বন্ধন ঘুচিয়া যাইবে। 'অনন্ত উন্নতি' হইলেই অনন্ত বন্ধনও হইবে। সমস্ত ভেদভাব অতিক্রম করিয়া অনন্ত অভেদভাব, একত্ব বা ব্রহ্মভাব আমাদিগকে লাভ করিতে হইবে। আত্মা সমস্ত ব্যক্তিত্বের মিলনভাব , এবং নির্বিকার ও 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। আত্মা জীবন নন, কিন্তু জীবনধারণ করিয়া থাকেন। আত্মা জীবন-মৃত্যু এবং শুভাশুভের অতীত—নির্বিশেষ একত্ব। নরকের মধ্য দিয়াও সত্যানুসন্ধান করিতে সাহসী হও। নাম-রূপ বা সবিশেষ বস্তু সম্বন্ধে মুক্তি প্রযোজ্য নহে। 'আমি দেহধারী-রূপে মুক্ত'—এ-কথা কোন দেহবান্ ব্যক্তিই বলিতে পারে না। দেহভাব মন হইতে অপগত না হইলে মুক্তি হইবে না।

আমাদের মুক্তি অন্যের ক্লেশকর হইলে আমরা সেখানে মুক্ত নই। আমরা যেন কাহারও ক্লেশের কারণ না হই।

---

১ Letter killeth.—St. Paul

প্রকৃত অনুভূতি এক হইলেও আপেক্ষিক অনুভূতি বহু। সমগ্র জ্ঞানের উৎস আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে, পিপীলিকার মধ্যেও যেরূপ, শ্রেষ্ঠ দেবতার মধ্যেও সেইরূপ। প্রকৃত ধর্ম এক; সকল দ্বন্দ্ব কেবল রূপ প্রতীক ও 'উদাহরণ' লইয়া। চক্ষুষ্মানের পক্ষে স্বর্গরাজ্য বা স্বর্ণযুগ চিরকাল বর্তমান। ফলকথা, আমাদের আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে বলিয়াই আমরা জগৎকে হারাইয়াছি মনে করি। মূঢ়! শুনিতে পাও না কি, তোমার হৃদয়মধ্যেই সেই অনাদি সঙ্গীত—'সচ্চিদানন্দ, সোহহং সোহহং' অহরহ ধ্বনিত হইতেছে?

ছায়ামূর্তির (phantasm) সাহায্য ছাড়া চিন্তা করিবার চেষ্টা আর অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টা একই প্রকার। প্রত্যেক ভাবেরই দুইটি অংশ—মানস ও শাব্দ। এই দুই-ই আমাদের প্রয়োজন। বিজ্ঞানবাদী (idealist) বা জড়বাদী—কেহই জগৎ-ব্যাপারনিরূপণে সমর্থ নয়। এ-বিষয়ে ভাবও অভিব্যক্তি দুয়েরই সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। দর্পণে নিজের মুখ দেখার মতো জগৎরূপে প্রকাশিত ব্রহ্মের প্রতিবিম্বই আমাদের জ্ঞানের বিষয়। অতএব কেহই স্বীয় আত্মা বা ব্রহ্মকে জানিতে পারে না, কিন্তু প্রত্যেকেই সেই আত্মা; এবং এই আত্মাকে জ্ঞানের বিষয় করিবার জন্য ঐ প্রতিবিম্বরূপেই তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে। দর্শনাতীত তত্ত্বের উদাহরণগুলি দর্শন করাই তথাকথিত প্রতীকোপাসনা—সচরাচর যতটা অনুমান করা যায়, দেববিগ্রহের প্রসার তাহা অপেক্ষা অধিক ব্যাপক।

দারু ও শিলা হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্ট বা বুদ্ধ প্রভৃতি মহাপুরুষ পর্যন্ত ইহা ব্যাপৃত। সাকারোপাসনা সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের সতত বিরুদ্ধভাব হইতেই ভারতে মুর্তিপূজার সূত্রপাত হইয়াছে। বেদে মূর্তিপূজার উল্লেখ নাই; স্রষ্টা এবং সখারূপে ঈশ্বরের অভাববোধের প্রতিক্রিয়া হইতেই শ্রেষ্ঠ আচার্যগণকে মূর্ত মূর্ত ঈশ্বর কল্পনা করিয়া লওয়া হইয়াছে। বুদ্ধদেব ঠিক এইভাবে মূর্ত ঈশ্বররূপে লক্ষ লক্ষ মানুষের দ্বারা অর্চিত হইতেছেন।

হিংসামূলক সংস্কার-চেষ্টার দ্বারা প্রকৃত সংস্কার সর্বদাই বাধাপ্রাপ্ত হয়। অর্চনার প্রবৃত্তি প্রত্যেক মানুষেরই প্রকৃতিগত; উচ্চতম দার্শনিকতার সাহায্যেই শুধু শুদ্ধ ভাবময় অবস্থায় আরোহণ করা যায়। কাজেই পূজা করিবার জন্যই মানুষ তাহার ঈশ্বরকে ব্যক্তিভাবাপন্ন করিয়া লইবে। প্রতীক যেরূপই হউক না

কেন, ইহার অন্তরালে স্বয়ং ঈশ্বর আছেন—এইভাবে মূর্তিপূজা অতি উত্তম, প্রতীকের ভাবে নয়।

'শাস্ত্রে আছে'—শুধু এই বিশ্বাসের কুসংস্কার হইতে সর্বোপরি নিজেদের মুক্ত করিতে হইবে। বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতিকে কোন শাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া লইতে বাধ্য করা অতি ভীষণ অত্যাচার। শাস্ত্রপূজা নিকৃষ্ট পুতুলপূজা। কোন গর্বিত ও স্বাধীনচিত্ত হরিণ তাহার শাবকটিকে কর্তৃত্বের ভাবে বলিতেছিল, 'আমার দিকে চাহিয়া আমার এই সুদৃঢ় শৃঙ্গ-দুইটি দেখ! ইহাদের এক আঘাতেই আমি মানুষ মারিতে পারি। হরিণ হওয়া কি সুখের বিষয়!' ঠিক সেই মুহূর্তে দূরে শিকারীর ভেরীর শব্দ শুনিবামাত্র কোনদিকে না চাহিয়া হরিণ বেগে পলাইতে লাগিল, বিস্ময়াবিষ্ট শাবকটিও তাহার পিছন পিছন ছুটিতে লাগিল। নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়া শাবক জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি এত বলশালী ও সাহসী, তবু মানুষের শব্দ শুনিয়া পলায়ন করেন কেন?' হরিণ বলিল, 'বৎস, নিজের বল-বিক্রমের উপর আস্থা থাকিলেও কেন যে ঐ শব্দ শুনিলেই ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায়ই হউক, কি-একটা ভাবের বশে পলাইতে বাধ্য হই, তাহা জানি না।' আমাদের দশাও ঐরূপ। শাস্ত্রনিবদ্ধ বিধির 'ভেরী-রব' শ্রবণমাত্রই প্রাচীন অভ্যাস ও সংস্কারগুলি যেন আমাদিগকে পাইয়া বসে এবং ইহা জানিবার পূর্বেই আমরা যেন দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আমাদের যথার্থ স্বরূপ—মুক্ত অবস্থা বিস্মৃত হই।

জ্ঞান চিরন্তন। আধ্যাত্মিক সত্যের আবিষ্কারককে আমরা 'প্রত্যাদিষ্ট' বলি এবং তিনি জগৎকে যাহা দান করেন, তাহা ঐশ্বরিক বাণী। কিন্তু ঐশ্বরিক বাণী বা প্রত্যাদেশও চিরন্তন, সুতরাং ইহাকে শেষ জ্ঞান বলিয়া অন্ধভাবে অনুসরণ করা উচিত নয়। যিনি নিজেকে উপযুক্ত আধাররূপে প্রস্তুত করিয়াছেন, তাঁহার ভিতরেই ঐ ঐশ্বরিক ভাব প্রকাশ

হইতে পারে। পরিপূর্ণ পবিত্রতা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন, কেন না 'যাঁহাদের হৃদয় পবিত্র, তাঁহারাই ঈশ্বর দর্শন করিবেন।' সকল প্রাণীর মধ্যে মনুষ্যই শ্রেষ্ঠ জীব, আর এই পৃথিবীই শ্রেষ্ঠ স্থান, কারণ এখানেই মানুষ মুক্তিলাভে সমর্থ। মানুষই ঈশ্বর সম্বন্ধে সর্বোচ্চ কল্পনা। যত কিছু গুণ ঈশ্বরে অর্পণ করি, সব অল্পমাত্রায় মানুষেই বিদ্যমান। যখন উচ্চস্তরে আরোহণ করি এবং এইরূপ ঈশ্বর-ধারণার

অতীত হই, তখন দেহ, মন ও কল্পনার বাহিরে গিয়া এ জগৎকে দেখি না। সেই পরম নিত্য ভাবে আরূঢ় হইলে আমাদের পার্থিব সম্বন্ধ থাকে না; তখন সবই বিষয়শূন্য বিষয়ীতে পর্যবসিত হয়। মুক্তিক্ষেদ্র এই জগতে মানুষই শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী। যাঁহারা সমত্ব বা পূর্ণত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ' ঈশ্বরে বাস করেন' বলিয়া কথিত। 'আত্মা দ্বারা আত্মাকে হনন'ই ঘৃণা। অতএব প্রেমই জীবনের নীতি। এই অবস্থায় উন্নীত হওয়াই পূর্ণত্ব লাভ করা; কিন্তু আমরা যত বেশী পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইব, ততই নৈষ্কর্ম্য লাভ করিব। সাত্ত্বিক ব্যক্তি এ-জগৎকে শিশুর খেলা বলিয়া দেখেন ও জানেন এবং ইহা লইয়া মাথা ঘামান না। দুইটি কুকুরছানাকে পরস্পর মারামারি ও কামড়াকামড়ি করিতে দেখিলে আমরা বিশেষ বিস্মিত হই না। আমরা জানি ইহা গুরুতর ব্যাপার নয়। পূর্ণ-মানুষ জানেন এই সংসার মায়ার খেলা। জীবনকে সংসার বলে। বিরুদ্ধ শক্তিগুলির যে ক্রিয়া আমাদের উপর হইতেছে, তাহারই ফল এই জীবন। জড়বাদী বলে—মুক্তির কথা ভ্রমমাত্র। আদর্শবাদী বলে—বন্ধনের কথা স্বপ্নমাত্র। বেদান্ত প্রচার করে—একই কালে আমরা মুক্তও বটে, বদ্ধও বটে। ইহার অর্থ এই যে, জাগতিক স্তরে আমরা কখনও মুক্ত নই, কিন্তু অধ্যাত্ম-স্তরে চিরমুক্ত। আত্মা মুক্তি ও বন্ধন দুইয়ের অতীত। আমরা ব্রহ্মস্বরূপ, আমরা ইন্দ্রিয়াতীত অবিনশ্বর জ্ঞান-স্বরূপ—আমরা পরমানন্দ স্বরূপ।